মাসুদ রানা

দুরাত্মা

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগীঃ

ইসমাইল আরমান

সেবা প্রকাশনী





মাসুদ রানা

দুরাত্মা

কাজী আনোয়ার হোসেন
সহযোগীঃ ইসমাইল আরমান

এক নামে সবাই চেনে তাকে।
লিম ওয়ান-জু, ওরফে অ্যাণ্ডি লিম–
মহাপরাক্রমশালী এক কোরিয়ান ধনকুবের।
সেধে তার সঙ্গে টক্কর দিতে গেছে রানা,
তার ফলও পেতে চলেছে হাতে-নাতে।
ওর সামনে এখন মেলে ধরা হয়েছে তাসের ডেক,
একেকটা তাসে একেক ধরনের মৃত্যুর পন্থা লেখা।
সেখান থেকে বেছে নিতে হবে একটা।
অস্ত্রের মুখে তাস টানতে বাধ্য হলো রানা।
ফলাফল? জ্যান্ত কবর দেয়া হবে ওকে।

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা ৪৫৫

দুরাত্মা

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী

ইসমাইল আরমান



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ISBN 984-16-7455-6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০১৮

রচনা: বিদেশি কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ইসমাইল আরমান

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৪৮৩১৪১৮৪, ০১৭৮৪-৮৪০২২৮
mail: alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/shebaofficial

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-455
DURATMA
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

একশ' চার টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।



BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই *Boighar.com*

ধ্বংস-পাহাড় ◆ ভারতনাট্যম ◆ স্বর্ণমৃগ ◆ দুঃসাহসিক ◆ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ◆ দুর্গম দুর্গ ◆ শত্রু ভয়ঙ্কর ◆ সাগরসঙ্গম-১, ২ ◆ রানা! সাবধান!! ◆ বিস্মরণ ◆ রত্নদ্বীপ ◆ নীল আতঙ্ক-১, ২ ◆ কায়রো ◆ মৃত্যুপ্রহর ◆ গুপ্তচক্র ◆ মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র ◆ রাত্রি অন্ধকার ◆ জাল ◆ অটল সিংহাসন ◆ মৃত্যুর ঠিকানা ◆ ক্ষ্যাপা নর্তক ◆ শয়তানের দূত ◆ এখনও ষড়যন্ত্র ◆ প্রমাণ কই? ◆ বিপদজনক-১, ২ ◆ রক্তের রঙ-১, ২ ◆ অদৃশ্য শত্রু ◆ পিশাচ দ্বীপ ◆ বিদেশী গুপ্তচর-১, ২ ◆ ব্ল্যাক স্পাইডার-১, ২ ◆ গুপ্তহত্যা ◆ তিন শত্রু ◆ অকস্মাৎ সীমান্ত-১, ২ ◆ সতর্ক শয়তান ◆ নীল ছবি-১, ২ ◆ প্রবেশ নিষেধ-১, ২ ◆ পাগল বৈজ্ঞানিক ◆ এসপিওনাজ-১, ২ ◆ লাল পাহাড় ◆ হৃৎকম্পন ◆ প্রতিহিংসা-১, ২ ◆ হংকং সম্রাট-১, ২ ◆ কুউউ! ◆ বিদায়, রানা-১, ২, ৩ ◆ প্রতিদ্বন্দ্বী-১, ২ ◆ আক্রমণ-১, ২ ◆ গ্রাস-১, ২ ◆ স্বর্ণতরী-১, ২ ◆ পপি ◆ জিপসী-১, ২ ◆ আমিই রানা-১, ২ ◆ সেই উ সেন-১, ২ ◆ হ্যালো, সোহানা-১, ২ ◆ হাইজ্যাক-১, ২ ◆ আই লাভ ইউ, ম্যান-১, ২, ৩ ◆ সাগরকন্যা-১, ২ ◆ পালাবে কোথায়-১, ২ ◆ টার্গেট নাইন-১, ২ ◆ বিষ নিঃশ্বাস-১, ২ ◆ প্রেতাত্মা-১, ২ ◆ বন্দি গগল ◆ জিম্মি ◆ তুষার যাত্রা-১, ২ ◆ স্বর্ণসঙ্কট-১, ২ ◆ সন্ন্যাসিনী ◆ পাশের কামরা ◆ নিরাপদ কারাগার-১, ২ ◆ স্বর্গরাজ্য-১, ২ ◆ উদ্ধার-১, ২ ◆ হামলা-১, ২ ◆ প্রতিশোধ-১, ২ ◆ মেজর রাহাত-১, ২ ◆ লেনিনগ্রাদ-১, ২ ◆ অ্যামবুশ-১, ২ ◆ আরেক বারমুডা-১, ২ ◆ বেনামী বন্দর-১, ২ ◆ নকল রানা-১, ২ ◆ রিপোর্টার-১, ২ ◆ মরুযাত্রা-১, ২ ◆ বন্ধু ◆ সঙ্কেত-১, ২, ৩ ◆ স্পর্ধা-১, ২ ◆ চ্যালেঞ্জ ◆ শত্রুপক্ষ ◆ চারিদিকে শত্রু-১, ২ ◆ অগ্নিপুরুষ-১, ২ ◆ অন্ধকারে চিতা-১, ২ ◆ মরণকামড়-১, ২ ◆ মরণখেলা-১, ২ ◆ অপহরণ-১, ২ ◆ আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১, ২ ◆ বিপর্যয়-১, ২ ◆ শান্তিদূত-১, ২ ◆ শ্বেত সন্ত্রাস-১, ২ ◆ ছদ্মবেশী ◆ কালপ্রিট-১, ২ ◆ মৃত্যু আলিঙ্গন-১, ২ ◆ সময়সীমা মধ্যরাত ◆ আবার উ সেন-১, ২ ◆ বুমেরাং ◆ কে কেন কীভাবে ◆ মুক্ত বিহঙ্গ-১, ২ ◆ কুচক্র ◆ চাই সাম্রাজ্য-১, ২ ◆ অনুপ্রবেশ-১, ২ ◆ যাত্রা অশুভ-১, ২ ◆ জুয়াড়ী-১, ২ ◆ কালো টাকা-১, ২ ◆ কোকেন সম্রাট-১, ২ ◆ বিষকন্যা-১, ২ ◆ সত্যবাবা-১, ২ ◆ যাত্রীরা হুঁশিয়ার ◆ অপারেশন চিতা ◆ আক্রমণ '৮৯-১, ২ ◆ অশান্ত সাগর-১, ২ ◆ শ্বাপদসঙ্কুল-১, ২, ৩ ◆ দংশন-১, ২ ◆ প্রলয়সঙ্কেত-১, ২ ◆ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১, ২ ◆ তিক্ত অবকাশ-১, ২ ◆ ডাবল এজেন্ট-১, ২ ◆ আমি সোহানা-১, ২ ◆ অগ্নিশপথ-১, ২ ◆ জাপানি ফ্যানাটিক-১, ২, ৩ ◆ সাক্ষাৎ শয়তান-১, ২ ◆ গুপ্তঘাতক-১, ২ ◆ নরপিশাচ-১, ২, ৩ ◆ শত্রু বিভীষণ-১, ২ ◆ অন্ধ শিকারী-১, ২ ◆ দুই নম্বর-১, ২ ◆ কৃষ্ণপক্ষ-১, ২ ◆ কালো ছায়া-১, ২ ◆ নকল বিজ্ঞানী-১, ২ ◆ বড় ক্ষুধা-১, ২ ◆ স্বর্ণদ্বীপ-১, ২ ◆ রক্তপিপাসা-১, ২, ৩ ◆ অপচ্ছায়া-১, ২ ◆ ব্যর্থ মিশন-১, ২ ◆ নীল দংশন-১, ২ ◆ সাউদিয়া ১০৩-১, ২ ◆ কালপুরুষ-১, ২, ৩ ◆ নীল বজ্র-১, ২ ◆ মৃত্যুর প্রতিনিধি-১, ২ ◆

কালকূট-১, ২, ৩ ◆ অমানিশা-১, ২ ◆ সবাই চলে গেছে-১, ২ ◆ অনন্ত যাত্রা-১, ২ ◆ রক্তচোষা ◆ কালো ফাইল-১, ২, ৩ ◆ মাফিয়া ◆ হীরকসম্রাট-১, ২ ◆ সাত রাজার ধন ◆ শেষ চাল-১, ২, ৩ ◆ বিগ ব্যাঙ ◆ অপারেশন বসনিয়া ◆ টার্গেট বাংলাদেশ ◆ মহাপ্রলয় ◆ যুদ্ধবাজ ◆ প্রিন্সেস হিয়া-১, ২ ◆ মৃত্যুফাঁদ ◆ শয়তানের ঘাঁটি ◆ ধ্বংসের নকশা ◆ মায়ান ট্রেজার ◆ ঝড়ের পূর্বাভাস ◆ আক্রান্ত দূতাবাস ◆ জন্মভূমি ◆ দুর্গম গিরি ◆ মরণযাত্রা ◆ মাদকচক্র ◆ শকুনের ছায়া-১, ২ ◆ তুরুপের তাস ◆ কালসাপ ◆ গুডবাই, রানা ◆ সীমা লঙ্ঘন ◆ রুদ্রঝড় ◆ কান্তার মরু ◆ কর্কটের বিষ ◆ বোস্টন জ্বলছে ◆ শয়তানের দোসর ◆ নরকের ঠিকানা ◆ অগ্নিবাণ ◆ কুহেলি রাত ◆ বিষাক্ত থাবা ◆ জন্মশত্রু ◆ মৃত্যুর হাতছানি ◆ সেই পাগল বৈজ্ঞানিক ◆ সার্বিয়া চক্রান্ত ◆ দুরভিসন্ধি ◆ কিলার কোবরা ◆ মৃত্যুপথের যাত্রী ◆ পালাও, রানা! ◆ দেশপ্রেম ◆ রক্তলালসা ◆ বাঘের খাঁচা ◆ সিক্রেট এজেন্ট ◆ ভাইরাস X-৭৭ ◆ মুক্তিপণ ◆ চীনে সঙ্কট ◆ গোপন শত্রু ◆ মোসাদ চক্রান্ত ◆ চরসদ্বীপ ◆ বিপদসীমা ◆ মৃত্যুবীজ ◆ জাতগোক্ষুর ◆ আবার ষড়যন্ত্র ◆ অন্ধ আক্রোশ ◆ অশুভ প্রহর ◆ কনকতরী ◆ স্বর্ণখনি-১, ২ ◆ অপারেশন ইজরাইল ◆ শয়তানের উপাসক ◆ হারানো মিগ ◆ ব্লাইণ্ড মিশন ◆ টপ সিক্রেট-১, ২ ◆ মহাবিপদ সঙ্কেত ◆ সবুজ সঙ্কেত ◆ অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা ◆ গহীন অরণ্য ◆ প্রজেক্ট X-15 ◆ অন্ধকারের বন্ধু ◆ আবার সোহানা ◆ আরেক গডফাদার ◆ অন্ধপ্রেম ◆ মিশন তেল আবিব ◆ ক্রাইম বস ◆ সুমেরুর ডাক-১, ২ ◆ ইশকাপনের টেক্কা ◆ কালো নকশা ◆ কালনাগিনী ◆ বেঈমান ◆ দুর্গে অন্তরীণ ◆ মরুকন্যা ◆ রেড ড্রাগন ◆ বিষচক্র ◆ শয়তানের দ্বীপ ◆ মাফিয়া ডন ◆ হারানো আটলান্টিস-১, ২ ◆ মৃত্যুবাণ ◆ কমাণ্ডো মিশন ◆ শেষ হাসি-১, ২ ◆ স্মাগলার ◆ বন্দি রানা ◆ নাটের গুরু ◆ আসছে সাইক্লোন ◆ সহযোদ্ধা ◆ গুপ্ত সঙ্কেত-১, ২ ◆ ক্রিমিনাল ◆ বেদুঈন কন্যা ◆ অরক্ষিত জলসীমা ◆ দুরন্ত ঈগল-১, ২ ◆ সর্পলতা ◆ অমানুষ ◆ অখণ্ড অবসর ◆ স্নাইপার-১, ২ ◆ ক্যাসিনো আন্দামান ◆ জলরাক্ষস ◆ মৃত্যুশীতল স্পর্শ-১, ২ ◆ স্বপ্নের ভালবাসা ◆ হ্যাকার-১, ২ ◆ খুনে মাফিয়া ◆ নিখোঁজ ◆ বুশ পাইলট ◆ অচেনা বন্দর-১, ২ ◆ ব্ল্যাকমেইলার ◆ অন্তর্ধান-১, ২ ◆ ড্রাগ লর্ড ◆ দ্বীপান্তর ◆ গুপ্ত আততায়ী-১, ২ ◆ বিপদে সোহানা ◆ চাই ঐশ্বর্য-১, ২ ◆ স্বর্ণ বিপর্যয়-১, ২ ◆ কিল-মাস্টার ◆ মৃত্যুর টিকেট ◆ কুরুক্ষেত্র-১, ২ ◆ ক্লাইম্বার ◆ আগুন নিয়ে খেলা-১, ২ ◆ মরুস্বর্গ ◆ সেই কুয়াশা-১, ২ ◆ টেরোরিস্ট ◆ সর্বনাশের দূত-১, ২ ◆ শুভ্র পিঞ্জর-১, ২ ◆ সূর্য-সৈনিক-১, ২ ◆ ট্রেজার হান্টার-১, ২ ◆ লাইমলাইট-১, ২ ◆ ডেথ ট্র্যাপ-১, ২ ◆ কিলার ভাইরাস-১, ২ ◆ টাইম বম ◆ আদিম আতঙ্ক ◆ পার্শিয়ান ট্রেজার-১, ২ ◆ বাউন্টি হান্টার্স-১, ২ ◆ মৃত্যুদ্বীপ ◆ জাপানি টাইকুন-১, ২ ◆ পাতকিনী ◆ নরকের কীট-১, ২ ◆ শার্প শুটার ◆ পাশবিক-১, ২ ◆ গুপ্তসংঘ ◆ বিষনাগিনী ◆ নীল রক্ত ◆ দুরন্ত কৈশোর ◆ মৃত্যুঘণ্টা ◆ ইসাটাবুর অভিশাপ ◆ মাস্টারমাইণ্ড ◆ মায়া মন্দির ◆ কালো কুয়াশা ◆ ধর্মগুরু ◆ নরপশু ◆ দুরাত্মা।

মাসুদ রানা-৪৫৫

দুরাত্মা

কাজী আনোয়ার হোসেন

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

— লেখক

বি. দ্র.: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

এক

এমন মুহূর্তেই বুঝি ক্লান্ত হয়ে পড়ে পৃথিবী। সূর্য ঢলে পড়েছে দিগন্তে, নরম লালচে আভা ছড়িয়ে দিচ্ছে প্রকৃতির বুকে। শূন্য আকাশে এলোমেলো ভঙ্গিতে উড়ে বেড়াচ্ছে এক ঝাঁক পাখি। বাতাস নেই; ধুলো আর পেট্রোল পোড়া ধোঁয়ার মেঘ যেন থমকে রয়েছে। তার মাঝ দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে একটা ধূসর রঙের পন্টিয়াক স্টেশন ওয়্যাগন—উপকূল থেকে ইনল্যাণ্ডের দিকে চলেছে ওটা।

গাড়িটা দেখতে কুৎসিত। আকারে যেমন বেঢপ, গায়ের রঙও ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে বহু আগে, চটে গেছে জায়গায় জায়গায়। স্টিয়ারিং হুইলের ওপর ঝুঁকে রয়েছে চালক। মাত্র পাঁচশো ডলারে গাড়িটা কিনেছে সে। সেলসম্যান কসম কেটে বলেছিল, গ্যালনে চল্লিশ মাইল যাবে এ-গাড়ি, স্পিড উঠবে ঘণ্টায় ষাট মাইল। বলা বাহুল্য, কোনোটাই ঠিক নয়। পুরনো গাড়ির সেলসম্যানের সঙ্গে একজন ঠকবাজের বিশেষ পার্থক্য নেই। রাক্ষসের মত তেল খায় আশির দশকের এই স্টেশন ওয়্যাগন, স্পিড তুলতে পারে কেবল ঢালু পথ ধরে নিচে নামতে গেলে... অথচ ভার্জিনিয়ার পূর্ব উপকূলের এই এলাকায় ঢালু কোনও রাস্তা নেই। চারদিকে শুধুই সমতল ভূমি।

বেশ ভারিক্কি চেহারা ড্রাইভারের। তাকে দেখে প্রফেসর বা লাইব্রেরিয়ান বলে ভ্রম হতে পারে। ফ্যাকাসে চামড়া,

সারাদিন ঘরের ভেতরে থাকলে যা হয়... আঙুলে নিকোটিনের দাগ, আর চোখের ভারী চশমা তার কারণ। মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে লোকটার, উন্মুক্ত হয়ে গেছে বিশাল কপাল—সেখানে ফুটে উঠেছে বলিরেখা। মানুষটার নাম জোসেফ ফিনিঙ্গার—বর্তমানে আমেরিকার নাগরিক হলেও জন্মসূত্রে সে জার্মান।

হুইল থেকে হাত না সরিয়েই চট করে হাতঘড়িটা দেখে নিল ফিনিঙ্গার। গাড়ির মত ঘড়িটাও পুরনো, একটা পুরনো ঘড়ির দোকান থেকে কেনা। ঘড়ি দেখে নিশ্চিন্ত হলো সে—ঠিকমতই এগোচ্ছে, পিছিয়ে পড়েনি। সামনে বাঁক দেখতে পেয়ে ইণ্ডিকেটর জ্বালল, একটু কমাল গতি। ফুরফুরে অনুভব করছে, সবকিছু ঠিকঠাক চললে ঘণ্টাখানেক পরেই অভাব-অনটন কেটে যাবে তার। হাতে চলে আসবে প্রচুর টাকা, যা দিয়ে ভাল গাড়ি, দামি ঘড়ি আর জীবনের সমস্ত আরাম-আয়েশ কিনে নিতে পারবে সে।

খানিক পর একটা ডাইনারের সামনে গাড়ি থামাল ফিনিঙ্গার। রাস্তার ধারের ডাইনারগুলো যেমন হয়, এটাও তেমন। বিশেষত্বহীন। ছাতের উপরে একটা নিয়ন সাইন জ্বলজ্বল করছে—*লুসি'জ।* কী কী পাওয়া যায়, তাও লেখা হয়েছে তলায়ঃ হ্যামবার্গার, হট ডগ, ফ্রাই আর শেকস্... আমেরিকার সনাতন ফাস্ট ফুড আর কী। ভেতর থেকে আবছাভাবে ভেসে আসছে গানের আওয়াজ—জুকবক্স বাজছে। পুরনো এসব ডাইনার ছাড়া আর কোথাও দেখা মেলে না প্রাচীন ওই গান শোনার যন্ত্রের।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে নিজের অতীত নিয়ে ভাবল ফিনিঙ্গার। ছোটবেলা থেকে মহাশূন্যের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল তার। সে-কারণেই স্কুল-কলেজের পাট চুকিয়ে ভর্তি হয়েছিল অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিঙে। পাশও করেছিল বেশ ভাল মার্কস নিয়ে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জন্মভূমি

জার্মানির ওপর রয়েছে মহাশূন্য-বিষয়ক গবেষণায় নানা ধরনের বিধি-নিষেধ। রকেট তৈরির নামে তারা যেন দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করে না বসে, সেজন্যেই আমেরিকা-সহ মিত্রবাহিনীর দেশগুলো আরোপ করেছে হাজারো নিয়ম-কানুন। ফলে সংকুচিত হয়ে পড়েছে অ্যারোস্পেস সংক্রান্ত কর্মক্ষেত্র। অগত্যা দেশ ছেড়ে বছর বিশেক আগে আমেরিকায় পাড়ি দিতে হয়েছে ফিনিঙ্গারকে। বিদেশে এসেও শুরুর দিনগুলো খুব কঠিন গেছে তার। সরাসরি পছন্দের কাজ পায়নি। জীবিকার জন্যে নানা ধরনের কাজ করতে হয়েছে—রাস্তার ফেরিঅলা, রেস্টুরেন্টের বেয়ারা, ট্যাক্সিচালক, আরও কত কী। কিছুদিন শিক্ষকতাও করেছে। শেষে... বছর দশেক আগে, শিকে ছিঁড়েছে ভাগ্যে। ভার্জিনিয়ার ওয়ালপ্স্ আইল্যাণ্ডে ইউ. এস. ন্যাভাল রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে চাকরি পেয়েছে সে। সংস্থাটা নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণার পাশাপাশি মহাকাশ-বিজ্ঞান নিয়েও কাজ করে। ওয়ালপ্স্ আইল্যাণ্ডের লঞ্চসাইট থেকে মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করা হয় আমেরিকার বিভিন্ন স্যাটেলাইট। সেখানেই জেনারেল সুপারভাইজর হিসেবে এখন কাজ করছে ফিনিঙ্গার।

চুয়ান্ন বছর বয়স তার, ক্যারিয়ার শেষ হতে চলেছে খুব শীঘ্রি। আর জীবনের এই মোড়ে এসে ফিনিঙ্গার উপলব্ধি করছে, পছন্দের পেশাটাই সব নয়। ধনসম্পদেরও প্রয়োজন রয়েছে। কাজের পেছনে ছুটতে গিয়ে আজ পর্যন্ত টাকাপয়সার দেখা পায়নি বেচারা। আরাম-আয়েশ কাকে বলে, তা জানে না। অল্প-স্বল্প যা সঞ্চয় করেছিল শেষ জীবনের জন্যে, ডিভোর্সের সময় প্রথম স্ত্রী তার প্রায় পুরোটাই নিয়ে গেছে। ফলাফল, ধার-দেনায় এখন সে জর্জরিত। গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দেখা দিয়েছে দ্বিতীয় স্ত্রী—বছরচারেক আগে ঝোঁকের বশে এক ককটেল ওয়েইট্রেসকে বিয়ে করেছিল,

মেয়েটি তার অর্ধেক-বয়সী... ভেবেছিল নিঃসঙ্গ জীবনে একজন সঙ্গী হলে মন্দ হয় না... কিন্তু দারিদ্র্যের কশাঘাতে সমস্ত ভালবাসা উবে গেছে। স্ত্রীর কথার চাবুকে প্রতিনিয়ত ক্ষত-বিক্ষত হতে হচ্ছে তাকে। এক মুহূর্তের শান্তি নেই কোথাও। এমনকী অফিসেও এখন আর তাকে দাম দেয় না কেউ। দশটা বছর বিলিয়ে দিয়েছে এন.আর.এল.-এ, কিন্তু সেখানকার কারও মাঝেই বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা নেই। বরং তাকে তাড়াবার জন্যে যেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ওরা। নতুন একজন সুপারভাইজর ইতিমধ্যে নিয়োগ করা হয়েছে ফিনিঙ্গারের কাজগুলো বুঝে নেবার জন্যে, যদিও পাক্কা সাত মাস বাকি তার রিটায়ারমেন্টের! কীসের জন্যে তা হলে এতদিন খেটে মরল সে? অবসরকালীন সামান্য কিছু টাকার জন্যে? কাজেই অফারটা যখন পেল, চরম সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়নি তার।

স্টেশন ওয়্যাগনের দরজা লক করে ডাইনারে ঢুকল ফিনিঙ্গার। যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, সে আগেই চলে এসেছে। বসে আছে কোনার একটা টেবিলে। বরাবরের মত তার পরনে কড়া ইস্তিরি দেয়া সুট। টেবিলের ওপর একটা খবরের কাগজ মেলে গভীর মনোযোগে ক্রসওয়ার্ড পাযল মেলাচ্ছে। হ্যারি স্মিথ নামে তাকে চেনে ফিনিঙ্গার, তবে সেটা সম্ভবত লোকটার আসল নাম নয়। দরজায় আওয়াজ শুনে মুখ তুলে তাকাল স্মিথ। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে তার দিকে হাত নাড়ল ফিনিঙ্গার, তারপর এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ল মুখোমুখি।

'কেমন আছেন, মি. ফিনিঙ্গার?' কুশল বিনিময়ের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল স্মিথ। কথায় ম্যানহাটনের টান।

'ভাল আছি, ধন্যবাদ,' খসখসে গলায় বলল ফিনিঙ্গার।

তার চেয়ে অন্তত দশ-বারো বছরের ছোট স্মিথ, কিন্তু দেখতে অতটা মনে হয় না। লম্বাটে মুখ, গলার চামড়ায়

ভাঁজ, আর দু'কানের ওপর ধূসর চুলের গোছা থাকায় তাকে আরও বয়স্ক দেখায়। আঙুলের ডগায় একটা বলপয়েন্ট কলম নাচাচ্ছে সে, অনামিকায় শোভা পাচ্ছে একটা সোনালি আংটি।

'ভেনিজুয়েলার রাজধানীর নাম জানেন?' প্রশ্ন ছুঁড়ল লোকটা।

'কী!' থতমত খেয়ে গেল ফিনিঙ্গার এই আচমকা প্রশ্নে।

'ওপর-নিচে ছ'নম্বর ক্লু,' পেপারের দিকে ইশারা করল স্মিথ। 'সাত অক্ষরের শব্দ... শুরুটা সি দিয়ে। ভেনিজুয়েলার রাজধানী।'

'দুঃখিত, বলতে পারছি না,' ফিনিঙ্গার বলল। 'ক্রসওয়ার্ড পাযলে আমার আগ্রহ নেই।'

'কোনও ব্যাপার না,' হাসল স্মিথ। 'এমনিতেই জিজ্ঞেস করলাম।' সোজা হয়ে বসল এবার। 'কাজের কথা বলুন। হয়েছে তো?'

এবারের প্রশ্নটা প্রত্যাশিত।

এই নিয়ে চতুর্থবার স্মিথের সঙ্গে দেখা করছে ফিনিঙ্গার। প্রথমটা ছিল নির্দোষ—স্যালিসবারির এক বারে অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হয়েছিল তাদের। ওর পাশের স্টুলেই বসেছিল স্মিথ। মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে দু'জনে মেতে উঠেছিল গল্পে। নিজেকে ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দিয়েছিল স্মিথ, কিন্তু কীসের ব্যবসা... তা আর জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠেনি। বরং ফিনিঙ্গারের পেশা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল লোকটা, তা নিয়েই ঘুরপাক খেয়েছে সব আলোচনা। সেধে সমস্ত ড্রিঙ্কের দাম পরিশোধ করেছে স্মিথ, আর ফিনিঙ্গারও বিনে পয়সার মদ গিলতে গিলতে উগরে দিয়েছে নিজের সবকিছু। টুকটাক প্রশ্ন করেছে স্মিথ, তবে সেগুলো সন্দেহজনক ছিল না, গোপন কোনও তথ্যও ফাঁস করতে হয়নি। এখন ফিনিঙ্গার জানে, দু'জনের দেখা হওয়াটা মোটেই কাকতালীয় ছিল না।

সাজানো ছক ছিল পুরোটা। ফিনিঙ্গারের আগ-পাশ-তলা জেনে তবেই মাঠে নেমেছিল স্মিথ ও তার পেছনের লোকেরা।

প্রথম সন্ধ্যার শেষে রীতিমত বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল দু'জনের। ক'দিন পর আবারও দেখা করার প্রস্তাব দেয় স্মিথ, ফিনিঙ্গার নির্দ্বিধায় রাজি হয়ে যায় তাতে। হবে না-ই বা কেন? সঙ্গী হিসেবে লোকটা চমৎকার, তা ছাড়া বিদায় নেবার আগে আলগোছে সে বলেছিল, 'একটা কাজ করলে আপনি বেশ কিছু টাকা কামাতে পারেন... এইমাত্র মাথায় এল। এখন কিছু না বলি, আগামীদিন নাহয় বিস্তারিত আলাপ করা যাবে।'

দ্বিতীয় সাক্ষাতে অবশ্য বিষয়টা নিয়ে কিচ্ছু বলল না স্মিথ। বরং রাজনীতি, সমসাময়িক পরিস্থিতি, খেলাধুলা, ইত্যাদি নিয়ে গল্প জুড়ল। পুরুষালি আড্ডা যেমন হয় আর কী। ফিনিঙ্গারও ভদ্রতার কারণে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারল না। সেদিনও যথারীতি দেদারসে মদ্যপান চলল... এবং অবশ্যই সেটা স্মিথের টাকায়।

অবশেষে তৃতীয় সাক্ষাতে আসল কথা পাড়ল স্মিথ। ততদিনে মোটামুটি ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে দু'জনের। স্মিথও তার সুযোগ নিয়ে ভান-ভণিতা ছেড়ে সরাসরি পেশ করল তার প্রস্তাব। শুনে আঁতকে উঠল ফিনিঙ্গার, বুঝতে পারল ওদের বন্ধুত্বের স্বরূপ... মিথ্যে খোলসের চেহারা। তক্ষুণি পুলিশে যাওয়া উচিত ছিল তার, কিংবা এন.আর.এল.-এর সিকিউরিটি সেকশনে। কিন্তু কোথাও যায়নি সে। যাবে যে না, তা বুঝতে পেরেই ওকে প্রস্তাব দিয়েছিল স্মিথ। সন্দেহ নেই, অনেকদিন থেকেই তার ওপর নজর রেখেছে এরা। ভালমত বুঝে নিয়েছে ওর চরিত্র। তারপরেই বাড়িয়েছে পা।

ঠাণ্ডা মাথায় প্রস্তাবটা নিয়ে ভেবেছে ফিনিঙ্গার। কে এই স্মিথ? কাদের হয়ে কাজ করছে সে? না, এসবে কিছুই যায়-

আসে না তার। দেয়ালে যখন পিঠ ঠেকে যায়, তখন ন্যায়-নীতি নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ নেই... লাভ নেই ওদের গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তা করেও। একটাই লাভ দেখতে পেয়েছে ফিনিঙ্গার—বৈষয়িক লাভ। নগদ পাঁচ লাখ ডলার দেয়া হবে তাকে... আধ মিলিয়ন ডলার! কল্পনাতীত একটা ব্যাপার। এত টাকা কোনোদিন চোখে দেখেনি সে, কোনোদিন নিজের হবে বলে স্বপ্নও দেখেনি। এমন সুযোগ পায়ে ঠেলবে কেন? তা ছাড়া একটু-আধটু অন্যায় না করে দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত কে-ই বা বড়লোক হতে পেরেছে? কাজেই প্রস্তাবে রাজি হতে দ্বিধা করেনি ফিনিঙ্গার।

কী করতে হবে তাকে? ছোট্ট একটা কাজ, তবে সেটা খুব সহজ নয়। এর জন্যে প্রথমেই চাই অ্যারোস্পেস মেকানিক্স ও টেনসিল স্ট্রেস বিষয়ক নিখুঁত জ্ঞান। সৌভাগ্যক্রমে দুটোতেই ফিনিঙ্গার অভিজ্ঞ। তবে কাগজে-কলমে অঙ্কের জটিল সমীকরণ মেলালেই চলছে না, মূল কাজটা আরও কঠিন। সেটার জন্যে বড়জোর চার-পাঁচ মিনিট পাবে সে। যথেষ্ট ঝুঁকিও আছে এতে। তবে ঝুঁকির বিনিময়ে রয়েছে অভাবনীয় পুরস্কার। সেটাই তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

'কী হলো?' স্মিথের অধৈর্য কণ্ঠ শুনে সংবিৎ ফিরল ফিনিঙ্গারের। 'হয়নি কাজটা?'

'হয়েছে,' শ্বাস ফেলে বলল ফিনিঙ্গার। 'যতটা ভেবেছিলাম, তার চেয়ে সহজেই সারতে পেরেছি। ফায়ার ড্রিলের সময় ঢুকে পড়েছিলাম অ্যাসেম্বলি হ্যাঙারে।' এটুকু বলে নিজেকে থামাল সে। নাহ্, সহজ বলে নিজের কৃতিত্বকে খাটো করা ঠিক হচ্ছে না। রীতিমত অসম্ভবকে সম্ভব করেছে সে। 'আসলে... সময়টাই ছিল সবচেয়ে বড় বাধা। খুব অল্প সময়ে পুরো কাজ সারতে হয়েছে আমাকে। যে-কোনও লঞ্চিঙের আগেই সিকিউরিটি খুব কড়া করে দেয়া হয় কিনা। কাজটাও ছিল খুব সূক্ষ্ম। ঠিকমত যদি করতে না পারতাম,

ফাইনাল চেকের সময় ধরা পড়ে যেত ব্যাপারটা। মানে, এমনভাবে সেটা করতে হয়েছে, যা বিশেষজ্ঞদের চোখেও অদৃশ্য হয়ে থাকে।'

'ইঞ্জিনটা ফেল করবে তো?'

'উঁহুঁ। তবে কার্যক্ষমতা কমে যাবে। কমবাশচন চেম্বারে যতখানি ফুয়েল পাম্প করার কথা, তার চেয়ে অনেক কম করবে। এসব অবশ্য আগেই আপনাকে আমি জানিয়েছি। মোদ্দা কথা হলো, শেষ পর্যন্ত আপনারা যা চাইছেন, তা-ই ঘটবে।'

কফিপট নিয়ে একজন ওয়েইট্রেস এগিয়ে আসায় চুপ হয়ে গেল দু'জনে। কফি পরিবেশন করল সে, দিয়ে গেল দুটো মেনু কার্ড। তবে মেনুর দিকে ফিরেও চাইল না ওরা। খেতে আসেনি এখানে।

'লঞ্চের টাইমটেবল?' মেয়েটা চলে গেলে জানতে চাইল স্মিথ।

কফিতে চুমুক দিয়ে মুখ বাঁকাল ফিনিঙ্গার। ভাল বানায়নি। মগটা সরিয়ে রাখল একপাশে। তারপর বলল, 'আজ থেকে বারো দিন পর শিডিউল করা হয়েছে। ওয়েদার ফোরকাস্ট চেক করেছি আমি, আবহাওয়া অনুকূল থাকবে। তবে কিছুই বলা যায় না। বাতাসের তো আর মতি-গতির ঠিক নেই। একটু এদিক-সেদিক হলেই...' কথাটা শেষ করল না সে। 'অবশ্য ওসব আমার মাথাব্যথা নয়। আমার কাজ আমি করে দিয়েছি। টাকাটা এনেছেন তো?'

কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইল স্মিথ। যেন বুঝতে চাইছে, ফিনিঙ্গার সত্যি কথা বলছে কি না। সন্তুষ্ট হয়ে পকেট থেকে সানগ্লাস বের করল সে। চোখে পরল। এর অর্থ, মিটিঙের এখানেই সমাপ্তি।

'টেবিলের তলায় একটা ব্রিফকেস রাখা আছে,' বলল সে। 'ওটা আপনার।'

‘টাকা?’

‘ভেতরে পুরোটাই পাবেন।’

উঠে যেতে চাইছিল স্মিথ, কিন্তু তাকে থামাল ফিনিঙ্গার। বলল, ‘এক মিনিট। জরুরি কয়েকটা কথা বলতে চাই, আপনার শোনা প্রয়োজন।’

‘কী বলবেন, তাড়াতাড়ি বলুন,’ স্মিথকে অধৈর্য দেখাল।

বড় করে শ্বাস নিল ফিনিঙ্গার। কথাগুলো আগেই সাজিয়ে রেখেছে সে। এবার বলতে শুরু করল, ‘টাকাগুলো আমি গুনব না... আশা করছি পুরোটাই দিয়েছেন, ঠকাননি। তবে একই সঙ্গে আপনাকে সতর্ক করে দেয়াও প্রয়োজন মনে করছি। শুনুন, কারা আপনাকে পাঠিয়েছে, আমি জানি না। জানার প্রয়োজনও মনে করি না। তবে তারা যে ভয়ঙ্কর মানুষ, তাতে সন্দেহ নেই। আধ মিলিয়ন ডলারও ছেলেখেলা নয়। নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে আপনারা আমার মুখ বন্ধ করতে চাইতে পারেন, এমন আশঙ্কা করলে দোষ দেবেন না নিশ্চয়ই? সেটাই বরং স্বাভাবিক। এমনও হতে পারে, ব্রিফকেসে বোমা রাখা আছে, আপনি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ফাটবে। কিংবা বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় কোনও দুর্ঘটনায় পড়ব আমি। তবে সেক্ষেত্রে আপনার জেনে রাখা প্রয়োজন—এখন পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, সব লিখে রেখেছি আমি। আপনার চেহারার বর্ণনা দিয়েছি ওতে। শুধু তা-ই নয়, শেষবার যখন দেখা করতে এসেছিলেন, তখন সেলফোনে আপনার ছবিও তুলে রেখেছি আমি। সেই ছবি রাখা আছে আমার স্বীকারোক্তির সঙ্গে। আপনার গাড়ি ও তার রেজিস্ট্রেশন প্লেটের নাম্বারও আমি উল্লেখ করে দিয়েছি। সব কিছু রাখা আছে আমার এক বন্ধুর কাছে। তাকে বলে দিয়েছি, আমার যদি কিছু হয়, ও যেন ওগুলো এন.আর.এল.-এ নিয়ে যায়। কী ঘটবে তা হলে, বুঝতে পারছেন? আপনাদের মতলব বানচাল হয়ে যাবে। পুলিশও

পেছনে লাগবে আপনার। পুলিশ কেন... সেটা এফবিআই, সিআইএ বা এনএসএ-ও হতে পারে।'

নীরবে সব কথা শুনল স্মিথ। তারপর মুচকি হাসল। বলল, 'কী ধরনের মানুষ ভাবছেন আপনি আমাদেরকে, মি. ফিনিঙ্গার? আপনার কি ধারণা, আমরা গ্যাংস্টার? বোধহয় থ্রিলার-টিলার আপনি একটু বেশিই পড়েন, তাই মাথায় উল্টোপাল্টা চিন্তা ঢুকেছে। শুনুন, আপনাকে একটা কাজ দেয়া হয়েছিল, আপনি সেটা সুষ্ঠুভাবে করেছেন, বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিচ্ছেন। ব্যস, সব চুকে-বুকে গেল। আর যদি আধ মিলিয়ন ডলারের কথাই তোলেন, আমাদের জন্যে ওটা কোনও টাকাই না। তার জন্যে খুনখারাপিতে জড়াবার প্রশ্নই ওঠে না। তবে হ্যাঁ, একভাবেই শুধু বিপদ হতে পারে আপনার... যদি আমাদের কথামত কাজ না করে থাকেন। তখন সত্যিকার অর্থেই জীবনসঙ্কট দেখা দেবে আপনার। ওসব চিঠি-ছবি দিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পারবেন না।' কফির দাম বাবদ টেবিলের ওপর একটা নোট রাখল সে। 'রিল্যাক্স, মি. ফিনিঙ্গার। আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করতে না পারলেও আপনার ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে।' পেপারটা গুটিয়ে উঠে দাঁড়াল স্মিথ। 'এখন তা হলে বিদায়।'

'দাঁড়ান।' বিব্রত বোধ করছে ফিনিঙ্গার। 'কারাকাস,' বলল সে।

'কারাকাস মানে?'

'আপনার ক্রসওয়ার্ডের শব্দটা। ভেনিজুয়েলার রাজধানী।'

মাথা ঝাঁকাল স্মিথ। 'ঠিক বলেছেন। ধন্যবাদ।'

তাকে বেরিয়ে যেতে দেখল ফিনিঙ্গার। বিব্রত ভাবটা কাটেনি। কথাটা ভুল বলেনি স্মিথ, থ্রিলার কাহিনী পড়েই অমন একটা হুমকি দেবার কথা মাথায় এসেছে তার। বাস্তবে কিছু লিখে রাখেনি সে, ছবি তোলেনি স্মিথের,

কোনও বন্ধুও নেই যার হাতে অমন স্পর্শকাতর জিনিস গচ্ছিত রাখবে। নিজের নিরাপত্তার জন্যেই হুমকিটা দিতে গিয়েছিল। ভুল করেছে সে? খামোকা লোকটাকে খেপিয়ে দিল না তো? টাকা দিয়েছে কি না, দেখা যাক। তা হলেই বোঝা যাবে সব। টেবিলের তলায় হাত ঢোকাল ফিনিঙ্গার। আছে, দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে ব্রিফকেসটা। তাড়াতাড়ি ওটা তুলে আনল টেবিলে। ডালা সামান্য ফাঁকা করে উঁকি দিল ভেতরে। থরে থরে সাজানো একশো ডলারের নোটের বাণ্ডিল দেখতে পেল। তাড়াতাড়ি ব্রিফকেস আবার বন্ধ করল সে। টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে শুরু করল হনহন করে।

পার্কিং লটে পৌঁছে স্মিথ বা তার গাড়ির চিহ্ন দেখল না ফিনিঙ্গার। চলে গেছে লোকটা। নিজের গাড়িতে উঠে পড়ল সে। ব্রিফকেসটা পাশে রেখে ইঞ্জিন চালু করল, তারপর মুখ ঘুরিয়ে উঠে এল রাস্তায়। স্বাভাবিক বেগে চলতে শুরু করল বাড়ির উদ্দেশে। মানস চোখে ভেসে উঠল জুলিয়ার চেহারা। এবার হয়তো মেজাজ-মর্জি ভাল হবে বউটার। স্বামীকে প্রাপ্য সম্মান দেবে।

যতই দুর্ব্যবহার করুক, জুলিয়ার প্রতি আকর্ষণ এক বিন্দু কমেনি ফিনিঙ্গারের। কমবার উপায়ও নেই, অমন অপূর্ব দেহবল্লরী লাখে একটা মেলে। ওর বুক আর নিতম্ব যে-কোনও পুরুষেরই রাতের ঘুম হারাম করে দিতে পারে। এমন মেয়ে একটা আধ-বুড়ো লোককে বিয়ে করতে পারে, বিশ্বাস করা মুশকিল। জুলিয়া যে বারে কাজ করত, সেখানেই পরিচয় হয়েছিল দু'জনের। ফিনিঙ্গারের পেশা শুনে রোমাঞ্চিত হয়েছিল সে, আকৃষ্ট হয়েছিল। আর তারই পরিণতি, বিয়ে। ওয়ালপ্স্ আইল্যাণ্ডের কাছে, স্যালিসবারিতে একটা বাড়ি ভাড়া করে সংসার পেতেছিল দু'জনে। অশান্তির শুরু তার পর থেকেই। নিতান্ত দরিদ্র ঘরের মেয়ে জুলিয়া; ফিনিঙ্গার

এন.আর.এল.-এ কাজ করে শুনে ভেবেছিল, সে বেশ উচ্চপদস্থ লোক... টাকা-পয়সাও প্রচুর আছে। প্রেম করার সময় ফিনিঙ্গার সেই ভুল ভাঙাতে যায়নি। জুলিয়াও তাকে বিয়ে করে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছিল। ওর পেছনে ঘুরতে থাকা সুদর্শন যুবকদের ফেলে বয়স্ক একজন মানুষের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার প্রধান কারণ ছিল সেটাই। কিন্তু বিয়ের পর দেখল, স্বামীর না আছে টাকা, না আছে সামাজিক প্রতিপত্তি। নিজেকে প্রতারিত মনে হলো তার। ফলে ঝগড়াঝাঁটি আর দুর্ব্যবহার শুরু করে দিল সে। সংসার ফেলে বহু আগেই চলে যেত, যদি যাবার মত কোনও জায়গা থাকত তার... টাকা থাকত। এ-কথা অসংখ্যবার স্বামীকে শুনিয়েছে মেয়েটা।

তবে সবকিছু বদলে যাবে আজ থেকে। হ্যারি স্মিথের কথা আগেই জুলিয়াকে বলেছে ফিনিঙ্গার, স্ত্রীর মতামত নিয়েছে কাজটা করার আগে। তাকে জানিয়েছিল, বড় ধরনের ঝুঁকি আছে কাজটায়, ধরা পড়লে বড় মাপের শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু সেসবের পরোয়া করেনি জুলিয়া, বরং চাপ দিয়েছে কাজটা নেবার জন্যে। কখনও দ্বিধায় ভুগলে উৎসাহ দিয়েছে। সত্যি বলতে কী, কাজটা হাতে নেয়ার পর থেকে সম্পর্কেরও উন্নতি হয়েছে দু'জনের। কমে এসেছে দাম্পত্য কলহ, রাতের পর রাত পাশাপাশি শুয়ে দু'জনে স্বপ্নের ভেলা ভাসিয়েছে—আধ মিলিয়ন ডলার পেলে সেটা নিয়ে কী করবে... কীভাবে করবে। বেশি টাকা একসঙ্গে খরচ করা যাবে না, খরচ করতে হবে অল্প অল্প করে, যাতে কেউ কিছু সন্দেহ না করে। অনেকটাই বদলে গেছে জুলিয়া, মনে মনে ভাবল ফিনিঙ্গার। ইদানীং বেশ প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠেছে ও, বিছানায়ও ঝড় তুলছে বাসর রাতের মত। নাহ্, স্মিথের কাজটা হাতে নিয়ে ভুল করেনি সে।

বিশ মিনিট লাগল বাড়ি পৌঁছুতে। একতলা কাঠের

বাড়ি। একপাশে গ্যারাজ। সামনে পিকেট ফেন্স দিয়ে ঘেরা লন। ছোট্ট, ছিমছাম। সংসার করার জন্যে আদর্শ। কিন্তু জুলিয়া তাতে সন্তুষ্ট নয়। তার চাই রাজপ্রাসাদ। ব্রিফকেসের গায়ে হাত বোলাল ফিনিঙ্গার—এবার সব হবে। রাস্তার পাশে গাড়ি রাখল সে। জানালা দিয়ে দেখল, ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনে দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে জুলিয়া। ফুলের ছাপ দেয়া একটা আঁটোসাঁটো ড্রেস পরেছে, কোমরে বেল্ট। উন্নত স্তনযুগল যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে কাপড় ছিঁড়ে। ব্রিফকেস নিয়ে নেমে পড়ল সে। ওয়াকওয়ে ধরে এগিয়ে গেল স্ত্রীর দিকে।

চুমো খেয়ে স্বামীকে স্বাগত জানাল জুলিয়া। চাপা গলায় জানতে চাইল, 'পেয়েছ?'

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে বলল ফিনিঙ্গার।

'গুনে নিয়েছ তো?'

'তার প্রয়োজন নেই। ওরা ঠকাবার লোক নয়।'

'তাও গুনে নেয়া উচিত ছিল।'

'এখন দেখব। ভেতরে চলো।'

বাড়িতে ঢুকল দু'জনে। প্রথমেই লিভিং রুম, পরিপাটি করে সাজানো। সোফায় বসল ফিনিঙ্গার, সেন্টার টেবিলটা কাছে টেনে তার ওপর রাখল ব্রিফকেসটা। ডালা খুলল। একে একে বের করতে লাগল ডলারের বাণ্ডিল। গুনতে বেশি সময় লাগল না। পুরো পাঁচ লাখ ডলারই পাওয়া গেল ভেতরে। স্মিথ তার কথা রেখেছে।

স্বামীর পাশে বসেছে জুলিয়া, গোনা শেষ হতেই দু'হাতে জড়িয়ে ধরল তাকে। চুমো খেল গালে। বলল, 'উপলক্ষটা স্মরণীয় করে রাখা উচিত, ডিয়ার। কিচেনে চলো, ফ্রিজে আমি এক বোতল শ্যাম্পেন রেখেছি।'

হাসল ফিনিঙ্গার। 'আমি যদি খালি হাতে ফিরতাম?'

'তা হলে তোমার মাথায় ভাঙতাম বোতলটা।'

হাসতে হাসতে কিচেনে গেল দু'জনে। ফ্রিজ খুলে শ্যাম্পেনের বোতল বের করল জুলিয়া, এগিয়ে গেল কাউন্টারের দিকে। ড্রয়ার খুলে কী যেন খুঁজল, তারপর বলল, 'কর্ক-স্ক্রুটা পাচ্ছি না। একটু দেখবে?'

তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল ফিনিঙ্গার। ড্রয়ারে হাত দিতে গিয়েই মনে পড়ল, শ্যাম্পেনের বোতল খুলতে কর্ক-স্ক্রু লাগে না। তা হলে কেন...। বিস্মিত হয়ে স্ত্রীর দিকে ফিরল সে, পরক্ষণেই তীব্র একটা ব্যথা অনুভব করল পেটে—ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। ঝট্ করে নিচে তাকাল, একটা ছুরি ঢুকে গেছে ওখানে, হাতলটা জুলিয়ার মুঠোয়। ঘ্যাচ করে সেটা আরেকটু সেঁধিয়ে দিল সে।

খপ করে স্ত্রীর কাঁধ আঁকড়ে ধরল ফিনিঙ্গার, চোখ রাখল চোখে। জুলিয়ার চোখের তারায় ফুটে ওঠা তীব্র ঘৃণা দেখে শিউরে উঠল। কিন্তু তারপরেও বিশ্বাস করতে পারছে না ব্যাপারটা। এ হতে পারে না... কেন হবে এমনটা! প্রশ্নটার জবাব পেল না। এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল জুলিয়া, টান দিয়ে বের করে আনল ছুরিটা। ক্ষতস্থান দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে। কিছু বলতে চাইল ফিনিঙ্গার, কিন্তু গলায় উঠে আসা রক্তের কারণে পারল না। ঘড় ঘড় করে আওয়াজ বেরুল শুধু। দৃষ্টি নিভে এল তার, হাঁটু গেড়ে প্রথমে বসে পড়ল মেঝেতে, এরপর পড়ে গেল মুখ থুবড়ে।

গা রি-রি করছে জুলিয়ার, তবে সেটা রক্ত দেখে নয়, ফিনিঙ্গারের স্পর্শ থেকে। রাতের পর রাত ওই ঘৃণ্য স্পর্শ সহ্য করতে হয়েছে তাকে, কিন্তু আর নয়। কয়েক পা পিছিয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল সে। কয়েক দফা খিঁচুনি দিল দেহটা, তারপর স্থির হয়ে গেল... চিরদিনের জন্যে।

এবার নড়ল জুলিয়া। কী করবে, তা আগেই ঠিক করে রেখেছে। গ্যাসোলিনের জেরিক্যান কিনে এনেছে সকালে।

গ্যারাজ থেকে নিয়ে এল ওটা। স্বামীর লাশের ওপর ঢালল সেই গ্যাসোলিন, সেই সঙ্গে ছড়াল পুরো বাড়িতে। সুটকেসও গুছিয়ে রেখেছে, টাকাগুলো শুধু ঢোকাতে হলো সেখানে। বাড়ি থেকে বেরুবার আগে একটা দেশলাই জ্বালল সে, দরজা দিয়ে বেরুবার আগে সেটা ছুঁড়ে দিল ভেতরে।

ফিনিঙ্গারের স্টেশন ওয়্যাগনে চড়ে বসল জুলিয়া। গাড়িটা তার চরম অপছন্দের, কিন্তু আপাতত আর কোনও বাহন নেই। নতুন গাড়ির বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত ওটাই চালাতে হবে তাকে... তবে খুব বেশি সময়ের জন্যে নয়। খুব শীঘ্রি গাড়ি পাল্টাবে সে, একই সঙ্গে পাল্টাবে নিজেকে। সুদূর ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়ে শুরু করবে নতুন জীবন। টাকা থাকলে কী না হয়!

ইঞ্জিন চালু করে গিয়ার দিল জুলিয়া। বাঁক ঘুরে উঠে পড়ল রাস্তায়। একবারও পিছু ফিরে তাকাল না। ওদের বাড়ির আনাচ-কানাচ থেকে ততক্ষণে লাফ দিয়ে উঠেছে আগুনের শিখা। ধীরে ধীরে গ্রাস করছে গোটা কাঠামোকে। পুড়ছে জোসেফ ফিনিঙ্গারের বাড়ি... একই সঙ্গে পুড়ছে তার স্বপ্ন।

দুই

দুনিয়ার বহু দেশের বহু শহর ঘুরেছে মাসুদ রানা, কিন্তু ঢাকার মত ভয়াবহ যানজট আর কোথাও দেখেছে কি না, মনে করতে পারছে না। গত আধঘণ্টা ধরে মতিঝিলের জ্যামে

আটকা পড়ে আছে ও—ত্রিশ মিনিটে ত্রিশ গজও এগোতে পারেনি। গাড়িটা যদি ট্যাক্সি হতো, ভাড়া মিটিয়ে নেমে যেত নির্দ্বিধায়। বড়জোর দশ মিনিট লাগত পায়ে হেঁটে অফিসে পৌঁছুতে। নিজের গাড়ি নিয়ে বেরিয়েই ভুলটা করেছে। থাকো এখন বসে! মনে মনে আফসোস হলো তিলোত্তমা নগরীর হাল দেখে। কয়েক ঘণ্টা ট্রাফিক জ্যামে আটকে থাকা যেন এ-শহরে সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছে। তেমনটা না ঘটলেই বরং বিস্মিত হতে হয়।

ঢাকা শহরের যানজটের কারণ কী, এ-নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। যানজট নিরসনে নেয়া হয়েছে নানান পরিকল্পনা এবং মহা-পরিকল্পনা। এ-কারণেই আজ ঢাকার কোনও সড়ক হয়তো 'ওয়ান-ওয়ে', আবার আগামীকাল তা হয়ে যাচ্ছে 'টু-ওয়ে'। আজ এই সড়কে রিক্সা চলাচল বন্ধ, পরদিন আবার খুলে দেয়া হচ্ছে। তার ওপর চলছে আইল্যাণ্ড বা সড়ক দ্বীপ ভাঙাগড়ার খেলা। তৈরি করা হচ্ছে একের পর এক উড়ালসড়ক। অথচ কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। রীতিমত অসহায় লাগে রানার—দুনিয়ার বড় বড় সমস্যার সমাধান করছে ও নিয়মিত, অথচ ঢাকার রাস্তায় নামলে কিচ্ছু করার থাকে না ওর। মাসুদ রানার মত মহানায়কও এই যানজটের কাছে সম্পূর্ণ পরাস্ত, পর্যুদস্ত।

ঘড়ি দেখল রানা। চিফের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই, এখন কেবলই দীর্ঘায়িত হচ্ছে বিলম্বের প্রহর। অথচ দিনের শুরুটা চমৎকারভাবে হয়েছিল। রাতভর শান্তির ঘুম দিয়ে ভোরে উঠেছিল ও, রাঙার মা'র তৈরি পরোটা, সবজি আর পনির-কুচি দেয়া ডিমের ওমলেট দিয়ে খাঁটি দেশি ব্রেকফাস্ট সেরেছিল। চায়ের কাপে চুমুক দিতেই বেজে উঠেছিল ফোন—চিফ ডেকেছেন... দেখা করতে বলেছেন সাড়ে ন'টায়। ডাকটা পেয়ে ছলকে উঠেছিল বুকের রক্ত, পনেরো দিন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার পর

নিশ্চয়ই নতুন কোনও অ্যাসাইনমেন্ট পেতে চলেছে। অবশ্য রাঙার মা'র মুখ বরাবরের মতই কালো হয়ে গিয়েছিল। গম্ভীর গলায় জানিয়েছিল, মিরপুরের মাজারে যাবে। এ তার পুরনো অভ্যেস—রানা কোনও বিপজ্জনক কাজে যাচ্ছে টের পেলেই মাজারে গিয়ে মানত দেবে, ও যেন সহি-সালামতে ফিরে আসতে পারে। এসবে রানার যে তেমন বিশ্বাস আছে, তা নয়; কিন্তু জীবনে যতবার নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে ও, মাঝে মাঝে দ্বিধায় পড়ে যায়, এভাবে বার বার বেঁচে যাবার পেছনে বুড়ির দোয়ার ভূমিকা কি কিছুই নেই?

ঘণ্টাখানেক হাতে রেখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে রানা। ভেবেছিল আধঘণ্টায় অফিসে পৌঁছুবে, পরের আধঘণ্টা আড্ডা দেবে সোহেলের সঙ্গে, এরপর হাজির হবে বুড়োর কামরায়। কিন্তু যানজটে সব গুবলেট হয়ে গেল। মন থেকে রোমাঞ্চ-টোমাঞ্চ উবে গিয়ে এখন ভর করেছে অস্থিরতা। কোনোমতে জ্যাম থেকে বেরুতে পারলে বাঁচে। চিফের কাছে বকা তো খেতেই হবে... তাড়াতাড়ি গেলে হয়তো বকার পরিমাণ কিছুটা কমবে।

আরও বিশ মিনিট লাগল গন্তব্যে পৌঁছুতে। কোনোমতে গাড়িটা পার্ক করে ছুট লাগাল ও। ঢুকে পড়ল ইণ্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কর্পোরেশনের বিল্ডিঙে, যদিও ও-নামে কোনও প্রতিষ্ঠান নেই ভেতরে। আসলে বিশাল এই ভবনটার প্রথম পাঁচটি তলা হরেক রকম বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অফিস, আর ষষ্ঠ ও সপ্তম তলায় রয়েছে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়া বাংলাদেশ কাউণ্টার ইণ্টেলিজেন্সের হেডকোয়ার্টার। অসংখ্য বিসিআই-এজেন্ট ছড়িয়ে আছে সারা পৃথিবী জুড়ে, নিয়মিত কণ্ট্যাক্ট রক্ষা করে চলেছে তারা হেড অফিসের সঙ্গে—কেউ প্রতিদিন, কেউ সপ্তাহে একদিন, কেউ বা মাসে একবার। ঘড়ির কলকব্জার মত নিখুঁতভাবে চলছে এই দুর্ধর্ষ গোপন সংস্থার কাজ।

দেশের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে ওরা সবাই প্রাণপণ চেষ্টায়। রানা সেই সংস্থারই একজন প্রথম সারির এজেন্ট।

লিফটে ঢুকে বোতাম চাপল রানা, সরাসরি উঠে এল সাততলায়। দ্রুত পায়ে পেরুল করিডোর, হাজির হলো চিফের সেক্রেটারি ইলোরার সামনে। ওকে দেখে ভুবনমোহিনী হাসি দিল মেয়েটা। বলল, 'এতক্ষণে আসার সময় হলো তোমার, হুজুর?'

'জ্যামে আটকা পড়েছিলাম,' বলল রানা। 'চিফ কি খুঁজেছেন আমাকে?'

'অলরেডি দু'বার জিজ্ঞেস করেছেন। দেরি না করে ঢুকে পড়ো এখুনি।'

পা বাড়াতে গিয়ে একটু থামল রানা। প্রশংসার দৃষ্টি বোলাল ইলোরার দিকে। আকাশী রঙের একটা সিল্কের শাড়ি পরেছে সে, সেই সঙ্গে কনট্রাস্ট কালারের ব্লাউজ। মাথার চুল খোঁপা করে বাঁধা, কপালে নীল টিপ, ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক।

'কী হলো?' ভুরু নাচাল ইলোরা।

'শাড়িটায় তোমাকে কিন্তু দারুণ মানিয়েছে,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'সেজেছও খুব যত্ন করে। আমার জন্যে নিশ্চয়ই?'

হাত মুঠো করে কিল মারার ভঙ্গি করল ইলোরা। 'ফাজলামি হচ্ছে? জলদি যাও ভেতরে। এমনিতেই লেট করেছ।'

হেসে ঘুরল রানা। এগিয়ে গেল চিফের খাস-কামরার দরজার দিকে। পাল্লার সামনে যখন পৌঁছুল, হাসছে না আর। তার বদলে দুরু দুরু করছে বুক। সবসময় হয় এমন। বুড়োর কামরায় ঢোকার আগে কেমন যেন ভয় লেগে ওঠে ওর, কাঁচাপাকা ভুরুজোড়ার নিচে চিফের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির কথা মনে পড়ে যায়। একই সঙ্গে বুকের মধ্যে ছলকে ওঠে

রক্ত—নতুন অ্যাসাইনমেন্ট... নতুন রোমাঞ্চের আশায়। এত বছর পেরিয়ে গেছে এ-পেশায়, কত কিছুই তো বদলে গেছে, বদলায়নি শুধু এই অনুভূতিটা। সেই প্রথম দিনটির মত আজও এই দরজাটার সামনে দাঁড়ালেই বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে।

নক করল রানা।

'কাম ইন।'

নব ঘুরিয়ে চিফের চেম্বারে ঢুকে পড়ল রানা, পেছনে নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল কবাট।

কামরার চেহারা পরিচিত। গাঢ় সবুজ কার্পেট ঠিক যেন তাজা ঘাস অথচ তুলোর মত নরম, সেই দূরপ্রান্তের দেয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত। দেয়ালটার সবটুকু ফিরোজা রঙের পর্দায় ঢাকা। একপাশে ঝুলে আছে বহুরঙা পৃথিবী, মেহগনি কাঠের ডেস্কটা ওই মানচিত্রের পাশে। পেছনে রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন এসপিয়োনাজ জগতের প্রবাদপুরুষ, নীরবে চুরুট ফুঁকছেন। ধোঁয়ার মেঘ ভাসছে বাতাসে।

'বসো,' জলদগম্ভীর গলায় বললেন রাহাত খান। এরপর কোটের হাতা সরিয়ে চোখ বোলালেন হাতঘড়িতে।

ব্যস, বকা-টকার প্রয়োজন হলো না, ওটুকুতেই যা বলার বলে দিলেন তিনি। তাড়াতাড়ি বলল রানা, 'মাফ করবেন, স্যর। আসলে রাস্তায় এত জ্যাম...'

'জানি,' হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলেন রাহাত খান। প্রসঙ্গটার ইতি ঘটালেন ওখানেই।

চেয়ার টেনে বসল রানা। নিজেকে অপরাধী ছাত্রের মত লাগছে, যেন বসে আছে কড়া হেডমাস্টারের সামনে। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল নীরবতায়। সামনে রাখা একটা ফাইল দেখছিলেন রাহাত খান, সেটা বন্ধ করে বললেন, 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে একটা অনুরোধ এসেছে। কেসটা প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিয়ে।'

অবাক হলো না রানা, ওদের সমস্যার অন্ত নেই। সরকারি ভাষ্যমতে একশো ষাটটা দেশে বাংলাদেশি কর্মী ও কর্মকর্তা রয়েছে, তবে বাস্তবতা হলো, তাদের বেশিরভাগই অবৈধ। সে-কারণে পছন্দসই কাজ বা ন্যায্য মজুরি... কোনোটাই পায় না তারা। বরং আইনের হাতে ধরা পড়লে বিদেশের মাটিতে জেল, জরিমানা আর হেনস্থার শিকার হয়। অনেক সময় ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ফেরতও পাঠানো হয় বাংলাদেশে।

'...আরও স্পেসিফিক্যালি বলতে গেলে, আমেরিকা-প্রবাসী বাংলাদেশি,' বলে চলেছেন রাহাত খান। 'আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে এমনিতে আমাদের অবস্থা ভাল নয়, তারপরেও বছরে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা রেমিটেন্স আসে প্রবাসীদের কাছ থেকে—সেটা দেশের অর্থনীতিতে বেশ বড় ভূমিকা রাখে। সবচেয়ে বেশি রেমিটেন্স আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকে, এরপরে আমেরিকার অবস্থান। কিন্তু সেখানেই দেখা দিয়েছে বিশ্রী সমস্যা। আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট অবৈধ অভিবাসীদের ব্যাপারে কঠোর নীতি নিয়েছেন—বহিষ্কার করছেন তাদেরকে। নৈতিকভাবে এতে আমাদের আপত্তি তোলার উপায় নেই, কিন্তু কেউ যদি সেটাকে সুযোগ ভেবে নিজের স্বার্থোদ্ধারের চেষ্টা করে, আমাদের ক্ষতি করে... আমরা তা মেনে নিতে পারি না।'

'সে-রকম কিছু কি ঘটেছে, স্যর?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন রাহাত খান। 'গত কয়েক মাসে বাংলাদেশ-সহ বেশ কিছু গরিব দেশের বহু প্রবাসীকে বহিষ্কার করা হয়েছে আমেরিকা থেকে—অস্বাভাবিক হারে। এদের মাঝে অবৈধ ইমিগ্র্যান্ট যেমন আছে, তেমনি আছে উচ্চ-শিক্ষিত, বৈধভাবে যাওয়া অনেক মানুষও। মজুর নয়; ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট, প্রোগ্রামার... এ-ধরনের পেশার মানুষ। ভাল ভাল জায়গায় চড়া বেতনে কাজ করছিল

ওরা কর্মনিষ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনও সুযোগ ছিল না... তারপরও বিভিন্ন ছল-ছুতোয় ছাঁটাই করা হয়েছে ওদেরকে। পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে বাংলাদেশে। আমরা জানতে পেরেছি, আমেরিকান সরকারকে উস্কানি দিয়ে, তাদের মুসলিম-ভীতিকে কাজে লাগিয়ে এসব ঘটানো হচ্ছে। আর আমাদের স্থির বিশ্বাস, এর পেছনে গূঢ় কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে।'

'এ-কথা কেন ভাবছেন, স্যর?'

'কারণ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো, আমাদের লোক সরিয়ে সেখানে অন্য লোক নেয়া হচ্ছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে লোকগুলো একই দেশের।'

'চিন, নাকি ভিয়েতনাম?'

'কোনোটাই না। কোরিয়ান... দক্ষিণ কোরিয়ান। লিম ওয়ান-জু'র নাম শুনেছ?'

'জী না, স্যর।'

'সে অবশ্য অ্যাণ্ডি লিম নামে বেশি পরিচিত।'

এবার মনে পড়ল রানার। 'ভদ্রলোক সম্ভবত বড় কোনও ব্যবসায়ী, বিদেশি পত্রিকায় দু-একবার দেখেছি তার নাম।'

'স্রেফ ব্যবসায়ী বললে কম বলা হয়, লোকটা আসলে ম্যানপাওয়ার ও কনস্ট্রাকশন সেক্টরে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় টাইকুনদের একজন। এইটা তার ফাইল।' সামনে রাখা ফাইলটা রানার দিকে ঠেলে দিলেন রাহাত খান।

দ্রুত ফাইলে চোখ বোলাল রানা। লোকটার উত্থানের কাহিনী রূপকথাকে হার মানায়। আসল নাম লিম ওয়ান-জু, চল্লিশের দশকে দক্ষিণ কোরিয়ায় জন্ম। উনিশশো পঞ্চাশে কোরিয়ার যুদ্ধে পুরো পরিবারকে হারিয়ে অনাথ হয়ে যায় সে। শরণার্থী হিসেবে চলে আসে হাওয়াইয়ে। সেখানেই লেখাপড়া শিখে ধীরে ধীরে নিজের পায়ে দাঁড়ায়, ব্যবসা শুরু করে। আশির দশকের শেষে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনীদের কাতারে। আমেরিকায় তার হেডকোয়ার্টার,

তবে অসংখ্য দেশে ছড়িয়ে আছে তার ম্যানপাওয়ারের ব্যবসা। অভিযোগের অন্ত নেই এই লোকের বিরুদ্ধে—গরিব দেশ থেকে ইয়োরোপ আর আমেরিকার জন্যে কর্মী সংগ্রহ করে তার কোম্পানি, অথচ ঠিকমত বেতন-ভাতা পরিশোধ করে না। কেউ যদি প্রতিবাদ করতে যায়, তা হলে আইনের মারপ্যাঁচে ফেলে তাকে সর্বস্বান্ত করে ছাড়ে। এই কারণে আজ পর্যন্ত অফিশিয়ালি কোনও অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি তার বিরুদ্ধে।

'এ তো খুব খারাপ লোক, স্যর,' ফাইল বন্ধ করে মন্তব্য করল রানা। 'গরিব মানুষকে ঠকিয়ে সম্পদের পাহাড় গড়েছে। অথচ সে নিজেই এসেছে হতদরিদ্র এক ব্যাকগ্রাউণ্ড থেকে।'

'ঠিক,' সায় জানালেন রাহাত খান। 'বিদেশে গিয়ে আমাদের দেশের বহু লোক এর কাছে প্রতারিত হয়েছে। তবে এতদিন আমাদের সরকার তা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায়নি, তাকে আর দশটা আদম ব্যবসায়ীর মত ভেবেছে। কিন্তু পরিস্থিতি এখন ভিন্ন।'

'আমেরিকার ঘটনাগুলোর পেছনে এর হাত আছে?'

'হ্যাঁ,' সায় জানালেন রাহাত খান। 'প্রাথমিক তদন্তে তেমন প্রমাণই পেয়েছি আমরা। অ্যাণ্ডি লিম-ই নিজের প্রভাব খাটিয়ে বিভিন্ন দেশের কর্মীদের তাড়াচ্ছে আমেরিকা থেকে, সেখানে ঢোকাচ্ছে স্বদেশি কোরিয়ানদের। এখানে দেশপ্রেম নয়, আরও কিছু জড়িত। অথচ ব্যাপারটা এমনভাবে ঘটাচ্ছে, অফিশিয়ালি অভিযোগ করার মত কিছু নেই। অন্যদিকে আমরা যদি মুখ বুজে থাকি, পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। উপায়ান্তর না দেখে মিনিস্ট্রি থেকে বিসিআইয়ের কাছে অনুরোধ এসেছে এদিকটা দেখার জন্যে।'

'ঠিক কী চাইছেন ওঁরা?'

'চাইছেন অ্যাণ্ডি লিমের বিরুদ্ধে একটা ব্যবস্থা নেয়া

হোক। লোকটার উস্কানি যদি থামানো যায়, তা হলে মার্কিন সরকারের সঙ্গে আলোচনার পথ সুগম হবে। বৈধ বাঙালি অভিবাসীদের ফেরত পাঠানো যাবে আমেরিকায়। তার জন্যে লিমের মুখোশ খুলে দেয়া জরুরি। অফিশিয়ালি যেহেতু সেটা করা যাচ্ছে না, ওঁরা চাইছেন, আমরা যেন সেটা আনঅফিশিয়ালি করি।'

'কাজটা সহজ হবে না, স্যর,' দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলল রানা। 'যদ্দূর বুঝতে পারলাম, অপকর্মের প্রমাণ রাখে না লোকটা।'

'আই হ্যাভ আ প্ল্যান,' চুরুটে টান দিয়ে চিকন ধোঁয়া ছাড়লেন রাহাত খান, সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরে। 'বাঁকা পথে এগোব আমরা। প্রোভোকেশন টেকনিকের কথা বলছি... খেপিয়ে দিতে হবে লোকটাকে, যাতে রাগের মাথায় ভুলভাল চাল দিয়ে বসে সে। আমরা সেই ভুলের ফায়দা তুলব ওকে শূলে চড়িয়ে।'

'তার জন্যে ওর দুর্বল জায়গায় খোঁচা মারতে হবে,' বলল রানা। 'তেমন কোনও দুর্বলতা কি পাওয়া গেছে, স্যর?' ফাইলের পাতা ওল্টাতে শুরু করল ও।

'কার রেসিং,' বললেন রাহাত খান। 'ছ'নম্বর পেজে দেখো।'

দেখল রানা। সত্যিই তাই। স্পোর্টস কার রেসিং, বা জিটি রেসিঙের ভক্ত অ্যাণ্ডি লিম। আন্তর্জাতিক একটা কার রেসিং টিমের মালিক। গত দশ বছরে তার টিমের সাফল্যও ঈর্ষণীয়। ইয়োরোপিয়ান ও ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে অনেকগুলো কাপ জিতেছে।

'রেসিঙের ব্যাপারে অ্যাণ্ডি লিমের এক ধরনের ম্যানিয়া রয়েছে,' রাহাত খান জানালেন। 'ওটা তার জন্যে সম্মানের প্রতীক। হার সহ্য করতে পারে না। কোনও ড্রাইভার যদি রেস হারে, তাকে সঙ্গে সঙ্গে দল থেকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে

তাড়ায়। প্রতিদ্বন্দ্বী টিমের গাড়িতে স্যাবোটাজ করা, ড্রাইভারদের ঘুষ দিয়ে বা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে রেস থেকে সরানো... এ-ধরনের অনেক অভিযোগ শোনা গেছে বিভিন্ন সময়ে। বলা বাহুল্য, সেগুলোও প্রমাণ হয়নি কখনও।'

'আমাকে কী করতে হবে, স্যর?'

জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়লেন রাহাত খান, 'রেসিঙের ব্যাপারে শুনেছি তোমার আগ্রহ আছে। এককালে কিছু রেসও তো করেছ, তাই না?'

মরিস রেনার ছদ্মনাম নিয়ে কিছুদিন ইয়োরোপিয়ান সার্কিট দাপিয়ে বেড়িয়েছে রানা, তবে সেটা কাজের খাতিরে—রেসিং টুর্নামেন্টকেন্দ্রিক অপরাধের তদন্ত করতে গিয়ে। জার্মান ধনকুবের রুডলফ গুন্থারের সঙ্গে সেবারই প্রথম টক্কর লেগেছিল ওর। চকিতে সব মনে পড়ে গেল। বুড়ো কি আবার ওকে কার-রেসিঙে নামাতে চাইছে নাকি? ইতস্তত করে বলল, 'ওসব বেশ কয়েক বছর আগের কথা, স্যর।'

কথাটা কানে তুললেন না চিফ। পরের প্রশ্ন ছুঁড়লেন, 'জার্মানির নিয়রবর্গরিং ট্র্যাকের ব্যাপারে জানো?'

'খুব কঠিন একটা ট্র্যাক, স্যর,' বলল রানা। 'আঁক-বাঁকে ভরা। খুব ভাল ড্রাইভার না হলে ওখানে রেস করা কঠিন।'

মাথা ঝাঁকালেন রাহাত খান। 'আজ থেকে ঠিক পাঁচদিন পর ওখানে অনুষ্ঠিত হবে এ-বছরের ইয়োরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ। তাতে অ্যাণ্ডি লিমের দুটো গাড়ি অংশ নিচ্ছে। তার মধ্যে একটা ড্রাইভ করবে রাশান ড্রাইভার দিমিত্রি জুকভ—দুনিয়ার সেরা রেসারদের একজন। তবে তার চেয়েও ভাল একজন ড্রাইভার থাকছে ওই রেসে। ব্রিটিশ ড্রাইভার নাইজেল মর্টিমার। বলতে গেলে, চ্যাম্পিয়নশিপের জন্যে ওরা দু'জনই আসল প্রতিদ্বন্দ্বী।'

'আমার তা মনে হয় না,' রানা মাথা নাড়ল। রেসিং

জগতের খবরাখবর মোটামুটি ভালই রাখে ও। 'মর্টিমারের সঙ্গে পেরে ওঠার কথা নয় জুকভের।'

'সেটা লিমও জানে,' একমত হলেন রাহাত খান। 'গত বছর কোনও ট্রফি জিততে পারেনি তার টিম, তার জন্যে মর্টিমারই প্রধানত দায়ী। সে-ই জিতেছে ট্রফিগুলো। খেপে গিয়ে পুরনো সব ড্রাইভারকে ছাঁটাই করেছে লিম, নতুন ড্রাইভার নিয়েছে। মর্টিমারকেই নিতে চেয়েছিল, কিন্তু রাজি করাতে পারেনি। শেষে নিয়েছে জুকভকে।'

'তাতে আদৌ লাভ হবে কী?' সন্দেহ প্রকাশ করল রানা।

'এখুনি জানতে পারবে,' বললেন রাহাত খান। 'চেক প্রজাতন্ত্রে ট্রেনিং ক্যাম্প করেছে লিম। কঠোর গোপনীয়তায় সেখানে প্র্যাকটিস করছে তার টিম। ক্যাম্পে সাংবাদিক ঢুকতে দিচ্ছে না। বাছাই করা কিছু লোক ছাড়া আর কারও প্রবেশাধিকার নেই সেখানে। কী যে চলছে ভেতরে, বোঝা মুশকিল। ব্রিটিশরা স্বভাবতই কিছুটা চিন্তিত হয়ে উঠেছে। একজন ইনভেস্টিগেটর পাঠানো হয়েছিল, সে ক্যাম্পের এক পিট স্টাফকে মদ খাইয়ে কিছু তথ্য বের করতে পেরেছে। ওখানে নাকি জুকভ নয়, আসলে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে টিমের দ্বিতীয় ড্রাইভারকে। লোকটাকে ভয় পাবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।'

'কেন? কে সে?'

টেবিলের উপরে রাখা কম্পিউটারের মনিটরটা রানার দিকে ঘুরিয়ে দিলেন বিসিআই চিফ। সাদা-কালো একটা ছবি ফুটে রয়েছে পর্দায়। বিশালদেহী একজন লোক, রুক্ষ চেহারা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি; গালের একপাশে কাটা দাগ, পরনে রেসিঙের জাম্পসুট। এক দেখাতেই বোঝা যাচ্ছে, এ-লোক ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুর।

'ইগোর দ্রোভনি,' বললেন রাহাত খান। 'এ-ও রাশান। এক সময় ফার্স্ট ক্লাস রেসার ছিল, তবে দু'বছর আগে রেসিং

সার্কিট থেকে নিষিদ্ধ করা হয় তাকে। ইচ্ছাকৃতভাবে এক প্রতিদ্বন্দ্বীর গাড়িকে ট্র্যাক থেকে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে ফেলেছিল সে। ভয়াবহ একটা দুর্ঘটনা ঘটে তার ফলে, ওই গাড়ির ড্রাইভার চিরদিনের মত পঙ্গু হয়ে যায়। দ্রোভনি অবশ্য অভিযোগটা স্বীকার করেনি, তারপরেও রেসিং কমিশন ওকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।'

'তা হলে সে লিমের গাড়ি চালাচ্ছে কী করে?'

'অ্যাণ্ডি লিমই কিছুদিন আগে প্রভাব খাটিয়ে দ্রোভনির নিষেধাজ্ঞা বাতিল করিয়েছে। তারপর তাকে ভাড়া করেছে নিজের টিমের ড্রাইভার হিসেবে। যা হোক, দ্রোভনির খবরটা জানার পর ব্রিটিশ সেই ইনভেস্টিগেটর ছদ্মবেশে ঢুকে পড়েছিল লিমের ক্যাম্পে। নিজ চোখে দেখে নিয়েছিল ট্রেনিঙের কার্যক্রম। শেষ রিপোর্টে জানিয়েছিল, ওখানে নাকি গাড়ি ক্র্যাশ করাবার প্র্যাকটিস চলছে। তার পরেই মারা গেছে ওই ইনভেস্টিগেটর—রাস্তা পার হবার সময় একটা গাড়ি চাপা দিয়ে গেছে তাকে। পুলিশ বলছে, দুর্ঘটনা; কিন্তু আসলে ব্যাপারটা খুন হবার সম্ভাবনাই বেশি। অন্তত ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের তা-ই ধারণা। ওরা সন্দেহ করছে, রেসের ট্র্যাকে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে নাইজেল মর্টিমারকে সরিয়ে দিতে চাইছে লিম, আর সে-কারণেই ভাড়া করেছে ইগোর দ্রোভনিকে। মর্টিমারকে সরিয়ে জুকভকে জেতাতে চাইছে সে। তোমার কী মনে হয়, এম.আর.নাইন? সত্যিই কি ট্র্যাকে দুর্ঘটনা ঘটানো সম্ভব... মানে, কারও মনে সন্দেহ না জাগিয়ে?'

জবাব দেবার আগে একটু ভাবল রানা। তারপর বলল, 'একেবারে অসম্ভব বলব না, স্যর। তবে মর্টিমারের মত অভিজ্ঞ ড্রাইভারকে ক্র্যাশ করানো সহজ হবে না।'

'কঠিন উপায়টাই শুনি।'

'মোড় ঘোরার সময় ধাক্কা দেবে না, তা হলে সবাই বুঝে

ফেলবে। দ্রোভনি তো এক দফা ও-কাজ করে ধরা পড়েছে। তবে আরেকটা কায়দা আছে। মর্টিমার যখন কোনও মিডল-স্পিড কার্ভে যাবে... মানে, ধরা যাক আশি বা নব্বুই মাইল স্পিডে... তখন তার পেছনে পজিশন নিতে পারে সে। কাজটা করতে হবে রেসের একেবারে প্রথম দিকে, যখন সব গাড়ি কাছাকাছি থাকছে, ঠেলাঠেলি করে সামনে যেতে চাইছে। তখন টার্ন নেবার সময় যদি মর্টিমারের গাড়ির রিয়ার হুইলে আলতো গুঁতো মারা যায়, নিয়ন্ত্রণ হারাবে সে—ছিটকে যাবে ট্র্যাকের বাইরে। রেলিং বা গাছ-টাছের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে পুরো গাড়িটাই তখন অচল হয়ে যেতে পারে।'

দাঁতের ফাঁক থেকে চুরুট নামালেন রাহাত খান। অর্থপূর্ণ স্বরে বললেন, 'আর যদি ধরো, ঠিক তখন, দ্রোভনির পেছনেও আরেকটা গাড়ি থাকে... দ্রোভনির উপরেই ওই একই কৌশল খাটায়?'

'মর্টিমারকে গুঁতো দেবার আগে?' মুচকি হাসল রানা। চিফের প্ল্যান বুঝতে পেরেছে। 'হ্যাঁ, ওর পরিকল্পনা বানচাল করে দেবার জন্যে ওটুকুই যথেষ্ট।'

আবার চুরুটটাকে কামড়ে ধরলেন রাহাত খান। 'ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চিফ মারভিন লংফেলো আমাকে ফোন করেছিল। নাইজেল মর্টিমার ওদের জাতীয় হিরো। তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, সেটা ঠেকাতে চায়। কিন্তু সমস্যা হলো, বিএসএস-এর নিজস্ব এজেন্টদের মধ্যে কোনও রেস ড্রাইভার নেই। পরিচিত ও বিশ্বস্তদের মধ্যে একমাত্র আছ তুমি। তোমাকে কয়েকদিনের জন্যে ধার চেয়েছে। কেসটার সঙ্গে যেহেতু আমাদের স্বার্থও জড়িত, আপত্তির কিছু দেখছি না। অ্যাণ্ডি লিমকে খোঁচা দেবার জন্যে রেসটাই আমাদের হাতে সবচেয়ে মোক্ষম অস্ত্র।'

'আমার তো অনেকদিন থেকে কোনও প্র্যাকটিস নেই, স্যর,' রানা বলল। 'অতসব প্রফেশনাল রেসারের সঙ্গে

ইয়োরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে পাল্লা দেয়া...'

হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলেন রাহাত খান। 'তোমাকে কেউ রেস জিততে বলছে না। তুমি শুধু ট্র্যাকে নেমে দ্রোভনিকে সামলাবে। হাতে পাঁচদিন সময় আছে, এর মাঝে প্র্যাকটিস করে নিজেকে ঝালাই করে নাও। প্র্যাকটিসের সমস্ত আয়োজন বিএসএস করছে, একজন ট্রেইনারও দেবে ওরা। আজ রাতের ফ্লাইটেই লণ্ডন যাচ্ছ তুমি। সেখানে চারদিন প্র্যাকটিস করবে তুমি। জার্মানিতে যাবে রেস শুরু হবার চব্বিশ ঘণ্টা আগে—শৌখিন এক রেসার হিসেবে। ঠিক আছে?'

'জী, স্যর,' বাধ্য ছেলের মত মাথা ঝাঁকাল রানা। নিয়রবর্গরিঙের ট্র্যাকে নামার জন্যে চারদিনের প্র্যাকটিস মোটেই যথেষ্ট নয়—এ-কথা বলার সাহস পেল না।

'এবার তুমি আসতে পারো,' বললেন রাহাত খান। 'ফাইলটা নিয়ে যাও। ভালমত পড়ে দেখো। অ্যাণ্ডি লিমের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে। ইলোরার কাছে তোমার প্লেনের টিকেট রাখা আছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে পড়ল রানা। এগিয়ে গেল দরজার দিকে। হাতল ধরতেই পিছন থেকে ডাকলেন রাহাত খান।

'রানা!'

ঘুরল রানা। 'জী, স্যর?'

'সাবধানে থেকো।'

ও-দুটো শব্দেই প্রকাশ পেল বৃদ্ধের অন্তরে চেপে রাখা সমস্ত ভালবাসা, শঙ্কা আর উদ্বেগ। ভয়-ডর দূর হয়ে গেল রানার। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ও এখন ঝাঁপ দিতে পারে নির্দ্বিধায়।

একটু হেসে ও বলল, 'জী, স্যর।' তারপর বেরিয়ে এল চিফের কামরা থেকে।

তিন

ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের মর্নিং ফ্লাইটে লণ্ডন থেকে দেড় ঘণ্টায় জার্মানির কোলোনে পৌঁছুল রানা। হাতঘড়ি মিলিয়ে নিল স্থানীয় সময়ের সঙ্গে। ইমিগ্রেশন আর কাস্টমসের ফর্মালিটি শেষ করতে লাগল ত্রিশ মিনিট। ঠিক সাড়ে ন'টায় এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এল ও। ট্যাক্সি না নিয়ে একটা রেণ্টাল কার নিল। তারপর নিজেই ড্রাইভ করে রওনা হলো নিয়রবর্গের উদ্দেশে। তাড়া নেই, আয়েশ করে গাড়ি চালাচ্ছে। টানা কয়েক দিন অহোরাত্র রেসিং কারে কাটাবার পর সাধারণ গাড়ি চালাতে ভাল লাগছে বেশ।

চারদিন পেরিয়ে গেছে এর মাঝে। বিশ্রাম নেবার সুযোগ জোটেনি। প্রতিদিন অন্তত বারো ঘণ্টা রেসিং ট্র্যাকে কাটিয়েছে রানা, বাকি সময় কেটেছে নিয়রবর্গরিঙের সার্কিট স্টাডি করে। অসংখ্য ছবি আর ভিডিও পাঠিয়েছিলেন বিএসএস চিফ মারভিন লংফেলো। সব আত্মস্থ করে নিয়েছে ও। ট্রেইনার হিসেবে উইলিয়াম ওয়াটকিন্স নামে প্রাক্তন এক রেসারকে পাঠানো হয়েছিল, নিয়রবর্গরিঙের অনেকগুলো রেসে তিনি অংশ নিয়েছেন অতীতে; তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকেও পাওয়া গেছে মূল্যবান অনেক তথ্য। রানা এখন চোখ বন্ধ করে ট্র্যাকের সমস্ত খুঁটিনাটি বলতে পারবে। ব্রুনশেন থেকে ফ্ল্যানয্‌গার্টেনের আঁকা-বাঁকা রাস্তা, শোয়ালবেনশোয়াঞ্জ-এর তীক্ষ্ণ বাঁক, টিয়ারগার্টেন ব্রাউ-এর

রাস্তার ঢাল... সবই ওর নখদর্পণে।

শুধু ট্র্যাক বিষয়ক জ্ঞান নয়, ড্রাইভিং স্কিলও ফিরে পেয়েছে ও অনেকখানিই। প্রথম দিন হুইলের পেছনে বসেই টের পেয়েছিল, যতটা ভেবেছে, ততটা মরচে আসলে পড়েনি ওর দক্ষতায়। চারদিনের অবিরাম অনুশীলনে আবারও সাবলীল হয়ে উঠেছে রানা ড্রাইভিং সিটে। রেসে একটা *মাজারাটি* ১২০ মডেলের গাড়ি ড্রাইভ করবে ও, প্র্যাকটিসও করেছে ওটা দিয়েই। গাড়িটা কার্গো বিমানে চড়ে গতকাল রাতেই চলে এসেছে জার্মানিতে। গত ক'দিনে ওটার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছে রানা। গজের দিকে না তাকিয়েই এখন বুঝতে পারে মাজারাটির সব সঙ্কেত। ইঞ্জিনের শব্দ শুনে বুঝতে পারে ওর গতিবেগ কত, শাফটে কতটা রেভল্যুশন হচ্ছে প্রতি মিনিটে। বাঁক নেবার জন্যে হুইল কতটা ঘোরাতে হবে, কখন ব্রেক চাপলে কতটুকু গতি কমবে বা কতদূরে গিয়ে থামবে... সবকিছুই রানার আয়ত্তে এসে গেছে। গাড়িটাকেও খুব পছন্দ হয়েছে ওর।

এসবের পেছনে মি. ওয়াটকিন্সের অবদান কম নয়। জীবনে বহু কট্টর প্রশিক্ষক পেয়েছে রানা, কিন্তু ভদ্রলোক যেন সবাইকে হার মানাবেন। শকুনের মত চোখ রেখেছেন রানার ওপর, তুচ্ছাতিতুচ্ছ ভুল করেও পার পেতে দেননি। যত ভাল ড্রাইভিংই করুক ও, সমালোচনার ঝড় বইয়ে দিয়েছেন।

'ডাবল-ডিক্লাচের ওপর আপনাকে আরও খাটতে হবে, মি. রানা... হুইল অত বেশি ঘুরিয়েছেন কেন? ...চার নম্বর বেণ্ডে গিয়ারবক্সের ওপর প্রেশার বেশি দিয়ে ফেলেছেন, কলকব্জা সব গুঁড়ো করে দিতে চান নাকি? ...এখনও ব্রেক করা শিখলেন না, সামান্য চাপ দিলেই তো হয়, ওকে তো কাজ করার সময় দেবেন!'

রীতিমত নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছেন তিনি রানাকে। ভদ্রলোকের অভিধানে সম্ভবত প্রশংসাসূচক কোনও শব্দের

অস্তিত্ব নেই। তবে মুখে কিছু না বললেও দিনশেষে তাঁর চোখ দেখে বোঝা যেত, রানার অগ্রগতিতে তিনি সন্তুষ্ট। চারটা দিন খাটিয়ে মেরেছেন ওকে, পুরোপুরি তৈরি করে তবেই ছেড়েছেন। গতকাল শেষ প্র্যাকটিসের পর শুধু শান্ত গলায় বলেছেন, 'মন্দ না। ট্র্যাকে অন্তত নামতে পারবেন এবার।' শুনে খুশি হয়ে উঠেছে রানা। ওয়াটকিন্স যে অতটুকু বলেছেন, তা-ই ঢের। ভদ্রলোক ঠিক যেন আরেক রাহাত খান, প্রশংসা আসে না মুখে। তবে লংফেলোর অফিসে ওঁর রিপোর্ট পড়ে অবাক হয়েছে রানা: আর ক'টা দিন আগে ধরে আনলে ছেলেটাকে এবারই নামিয়ে দেয়া যেত প্রতিযোগিতায়।

রাস্তার দিকে মনোযোগ ফেরাল রানা। কোলোন থেকে পঁচাশি কিলোমিটার দক্ষিণে নিয়রবর্গ। ব্যস্ত নগরকে পাশ কাটিয়ে বি-২৫৭ হাইওয়ে ধরল ও, গাড়ি ছোটাল দখিনপানে। দেখতে দেখতে স্পিড উঠে এল আশির ঘরে। এক ঘণ্টার সামান্য বেশি লাগবে গন্তব্যে পৌঁছুতে। সামনে জার্মানির গ্রামাঞ্চলের দিগন্তবিস্তৃত, চোখ-জুড়ানো, সবুজ প্রান্তর। ছোট-খাট বেশ কিছু পাহাড় আছে, জনবসতি কম, শহর-টহর তো নেই বললেই চলে। আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগোবার সময় মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে ফার্মহাউস, পুকুর, আবাদি জমি, আর পশুচারণ ক্ষেত্র। কৃষিপ্রধান এলাকা। ড্রাইভ করছে, আর মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাচ্ছে রানা—জায়গাটা অপূর্ব। নিয়রবর্গও এমনই ছিল অতীতে—অবারিত প্রকৃতির মাঝে সাদামাঠা একটা গ্রাম, যেখানে অল্প কিছু কাঁচা-পাকা বাড়ি, একটা-দুটো দোকান আর পাহাড়চূড়ার কাছে একটা ভাঙাচোরা দুর্গ ছাড়া কিছুই ছিল না। ১৯২৭ সালে রেসিং সার্কিট তৈরির পর বদলে গেছে এলাকার চেহারা। নিয়রবর্গরিং-কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আধুনিক শহর, রেসিং যার প্রাণ। শহরের সমস্ত কর্মকাণ্ড আর

ব্যবসা-বাণিজ্য রেসিংকেন্দ্রিক। শক্তিশালী ইঞ্জিনের গর্জন আর টায়ারের কর্কশ আওয়াজ হয়ে উঠেছে শহরের হৃৎস্পন্দন।

অ্যাণ্ডি লিমের সঙ্গে এখনও টক্কর লাগেনি, কাজেই পেছনে ফেউ লাগার সম্ভাবনা কম। তারপরও সতর্কতায় ঢিল দিল না রানা। প্রতিটি বাঁক ও মোড় ঘোরার সময় নজর রাখল রিয়ারভিউ মিররে। ঘোরা শেষ করামাত্র প্রতিবার কমিয়ে আনল গতি। আধ ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চিত হলো, কেউ ওকে অনুসরণ করছে না।

যথাসময়ে নিয়রবর্গে পৌঁছুল ও। সবুজ প্রকৃতি ছেড়ে যেন প্রবেশ করল ইঁট-পাথরের অরণ্যে। রাস্তার দু'পাশে সারি সারি হোটেল আর গেস্টহাউস, সবগুলোর সামনে পার্ক করে রাখা হয়েছে অসংখ্য দামি গাড়ি। দোকানপাট আর গ্যারাজও রয়েছে—সেগুলোয় শোভা পাচ্ছে হাজারো ব্র্যাণ্ডের টায়ার, লুব্রিক্যাণ্ট, গ্যাসকেট, ড্রাই লাইনার আর মোটর অ্যাক্সেসরিজের বিজ্ঞাপন। নানা দেশের, নানা বর্ণের লোকজন হেঁটে বেড়াচ্ছে—ইটালিয়ান, ফরাসি, জার্মান, ব্রিটিশ, রাশান... পোশাক-আশাক আর চলাফেরার ভঙ্গি দেখে আলাদা করা যায় সবাইকে। পরদিনের প্রতিযোগিতা উপলক্ষে পুরো শহরে একটা উৎসব-উৎসব ভাব।

হোটেল আগেই বুক করা হয়েছে, রিসেপশনে গিয়ে চেক-ইন করল রানা। রুমে গিয়ে দ্রুত ফ্রেশ হয়ে নিল, তারপর পাল্টে নিল পোশাক। সার্কিটের জন্যে মানানসই ও আরামদায়ক একটা সাজ নিল—গায়ে দিল উলের জার্সি, সেটার হাতে ও কাঁধে ওয়াটারপ্রুফ প্যাচ রয়েছে; ট্রাউজার যেটা পরল, সেটার উরুতে রয়েছে পকেট, ম্যাপ রাখার জন্যে। অ্যাসবেস্টসের প্রলেপ দেয়া বুট পরল, প্যাডাল বেয়ে উঠে আসা তাপ থেকে রক্ষা করবে পা-দুটোকে। ইলাস্টিকের একটা বডি-বেল্টও পরল কোমরে, রোড-শক থেকে

কিডনিকে রক্ষা করবে। হেলমেট, গগলস্‌, গ্লাভস্‌ আর ইয়ারপ্লাগ-সহ অন্যান্য টুকিটাকি জিনিস ভরে নিল একটা হ্যাণ্ডব্যাগে। পিট এরিয়ায় যাবে, ওখানেই দেখা হবে নাইজেল মর্টিমারের সঙ্গে। রুম থেকে বেরিয়ে হোটেলের রেস্টুরেন্টে দ্রুত লাঞ্চ সেরে নিল, এরপর রওনা হলো নিয়রবর্গরিঙের সার্কিটের উদ্দেশে।

জায়গামত অপেক্ষা করছে নাইজেল মর্টিমার। টিভির পর্দা আর পত্রিকার পাতায় তাকে বহুবার দেখেছে রানা, চিনতে অসুবিধে হলো না। ওকে দেখে মর্টিমারও এগিয়ে এল।

'মি. মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ। তবে আমাকে শুধু রানা বলে ডাকলেই চলবে।'

'আমাকে শুধু নাইজেল,' হেসে হাত বাড়িয়ে দিল মর্টিমার। 'ওয়েলকাম টু নিয়রবর্গরিং।'

'ধন্যবাদ,' হাত মেলাল রানা। একই সঙ্গে দেখে নিল তাকে। বয়সে রানার চেয়ে দু-এক বছরের ছোটই হবে, সুদর্শন, মাথাভরা সোনালি চুল। হাসিটা নিষ্পাপ, মুখে গুটি গুটি দাগ—এখনও যেন শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে আসতে পারেনি। চলাফেরায় এক ধরনের দম্ভ রয়েছে, তবে সেটা সম্ভবত আত্মবিশ্বাসের ফসল। চলমান সময়ের সবচেয়ে সফল রেসার সে, একটু-আধটু অহমিকা দেখাতেই পারে। অবশ্য কিছুক্ষণ পরেই ভুল ধারণার অবসান ঘটল—কথাবার্তায় বোঝা গেল, মর্টিমার খুবই সরল মনের মানুষ। তাকে পছন্দ হয়ে গেল রানার।

'জার্নি কেমন ছিল?' জানতে চাইল মর্টিমার।

'ভাল,' রানা বলল। 'খুব দ্রুতই পৌঁছেছি। পথে দেরি হয়নি।'

'কিছু মনে কোরো না,' ইতস্তত করে বলল মর্টিমার। 'ব্যাপারটা কী, একটু খোলাসা করতে পারো? ব্রিটিশ এম্বাসি

থেকে আমাকে শুধু অনুরোধ করা হয়েছে, তুমি একটা বিশেষ কাজে আসছ, আমি যেন যথাসম্ভব সাহায্য করি। কিন্তু কাজটা কী, সে-ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি।'

ইচ্ছেকৃতভাবেই আসন্ন বিপদের ব্যাপারে অন্ধকারে রাখা হয়েছে মর্টিমারকে, নইলে সে নার্ভাস হয়ে যেতে পারে। রানাও সে-ঝুঁকি নিল না। বলল, 'সময় হলে জানতে পারবে সব। আপাতত এটুকু বলতে পারি, ওতে তোমার চিন্তিত হবার মত কিচ্ছু নেই।'

'কিন্তু তুমি আসলে কে, সেটা তো বলবে! রেসের জগতের কেউ নও, হলে আমি তোমার নাম শুনতাম।'

নাম নিশ্চয়ই শুনেছ, মনে মনে ভাবল রানা, তবে সেটা মরিস রেনার হিসেবে। এবার ইচ্ছে করেই সে-পরিচয় ব্যবহার করছে না ও। অ্যাণ্ডি লিমের সামনে নিজেকে এক্সপোজ করার জন্যে আসল পরিচয়টাই আদর্শ। রেনার হিসেবে কেউ ওকে চিনে ফেলবে, এমন ভয়ও নেই। কয়েক বছরে চেহারায় যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে ওর। তা ছাড়া ঝরে পড়া অখ্যাত রেসারদের দিকে মনোযোগ দেয় না কেউ।

'আমি নাম ভাঁড়াইনি,' হেসে মর্টিমারকে আশ্বস্ত করল রানা। 'সত্যিই আমি মাসুদ রানা—একটা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন ফার্মের ডিরেক্টর। রেসিং আমার শখ। এখানে এসেছি ব্রিটিশ সরকারের অনুরোধে একটা তদন্তের কাজে।'

'রেসের ট্র্যাকে? তারপরেও বলছ, আমার কোনও চিন্তা নেই?'

'না, নেই। অযথা মাথা ঘামিয়ো না। চলো, আমাকে ট্র্যাকটা দেখাবে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাঁটতে শুরু করল মর্টিমার। বলল, 'শুনলাম, রেসিঙে মোটেই আনাড়ি নও তুমি। উইলিয়াম ওয়াটকিন্সের কাছ থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছ। আমি চিনি তাঁকে। খুব ভাল ট্রেইনার। ভীষণ কড়া।'

‘তা আর বলতে,’ একমত হলো রানা।

‘তবে যত ট্রেনিংই নাও, নিয়রবর্গরিঙে তার কোনোটাই যথেষ্ট নয়।’ আড়চোখে রানাকে দেখল মর্টিমার। ওকে নিতান্তই অ্যামেচার ভাবছে। তাই বলে আন্তরিকতায় ঘাটতি পড়ল না কোনও। ‘এসো, তোমাকে পুরো সার্কিট ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। তা হলেই বুঝতে পারবে, কোথায় কোন্ বিপদ লুকিয়ে আছে। এরপর তুমি যত খুশি প্র্যাকটিস রাউণ্ড দিতে পারবে, তোমার গাড়িটা অলরেডি এসে গেছে এখানে। অন্তত দশটা ল্যাপ দেবার পরামর্শ দেব আমি, কারণ আগামীকাল টাইম ট্রায়াল আছে, ওতে কোয়ালিফাই করতে হবে। ট্র্যাক আর গাড়ির মতিগতি বুঝে নাও ভালমত। কোনও প্রশ্ন থাকলে এরপর আমাকে জিজ্ঞেস কোরো। ড্রিঙ্ক করতে করতে আলোচনা করা যাবে। কী বলো?’

পিটের এক প্রান্তে পার্ক করা আছে মর্টিমারের গাড়ি—লাল রঙের একটা অডি এ-ফাইভ কনভার্টিবল। ওটা অবশ্য রেস কার নয়, সাধারণ চলাফেরার বাহন। প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজা খুলে ধরল সে, রানাকে ওঠাল গাড়িতে, এরপর নিজে গিয়ে বসল ড্রাইভিং সিটে।

ইগনিশন ঘুরিয়ে একটা বোতাম চাপল মর্টিমার, ধীরে ধীরে নেমে গেল হুড। ‘হুড নামিয়ে দিলাম, যাতে ভালমত চারপাশ দেখতে পাও। এবার তা হলে রওনা হওয়া যাক।’

গিয়ার দিয়ে গাড়ি সামনে বাড়াল সে, উঠে এল সার্কিটের রাস্তায়। সাড়ে বারো মিনিটের মাথায় রানার বোঝা হয়ে গেল, কী কঠিন এক চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিয়রবর্গরিং এক মূর্তিমান আতঙ্ক—নির্মম, ক্ষমাহীন। রেসিং কারের গতির তুলনায় মর্টিমারের অডির গতি কিছুই না, তারপরেও প্যাসেঞ্জার সিটে বসে ও যতটুকু দেখেছে, তাতে লণ্ডনে স্টাডি করে আসা সমস্ত ছবি আর ভিডিও গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। বিশ কিলোমিটার দীর্ঘ সর্পিল

সার্কিটটা ওর সমগ্র দেহ, মন আর আত্মার পরীক্ষা নেবে... ছুঁড়ে দেবে একের পর এক বাধা, যেখানে সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের ভেতর তড়িৎ সিদ্ধান্ত নিতে হবে ওকে। সামান্যতম ভুলেরও মাশুল চুকাতে হবে ভয়াবহ পরিণতি দিয়ে। আজ পর্যন্ত অন্তত দু'শো রেসারের জীবন নিয়েছে নিয়রবর্গরিং; সার্কিটটা স্বচক্ষে দেখার পর সংখ্যাটা আর অস্বাভাবিক লাগছে না রানার কাছে।

মর্টিমারের মাঝে অবশ্য কোনও ধরনের উদ্বেগ দেখছে না রানা। অড়িকে পাগলা ঘোড়ার মত ছুটিয়েছে সে, একেকটা বাঁক পেরিয়েছে প্রায় সত্তর মাইল স্পিডে। সে-সময় সিটের ওপর প্রায় কাত হয়ে যেতে হয়েছে রানাকে। তবে মাজারাটি নিয়ে রেস করার সময় আরও পাঁচগুণ বেশি সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের মোকাবেলা করতে হবে ওকে। তখন প্রায় শূন্যে ভাসবে ওর শরীর এবং গাড়ি, একই সঙ্গে ছুটবে পরের অবস্টেকলের দিকে। অতীতে যত সার্কিটে গাড়ি চালিয়েছে রানা, নিয়রবর্গরিঙের তুলনায় সেগুলো কিছুই না। একমাত্র আঁকা-বাঁকা পাহাড়ি পথের সঙ্গে তুলনা করা যায় এখানকার, ট্র্যাকটা তেমনই বুনো। এখানে গাড়ি নয়, রাস্তাটা মনিব—সে-ই নির্ধারণ করে সবার চালচলন। এই ভয়াল পথে একদল প্রফেশনালের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে রানাকে... এমন সব মানুষ, যারা দিনরাত এ-ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বেড়ায়। তাদের নেশা-পেশা, ধ্যান-জ্ঞান... সবই রেসকে কেন্দ্র করে। দ্বিধায় পড়ে গেল রানা, অপ্রস্তুত অবস্থায় এমন একটা অ্যাসাইনমেন্টে পা বাড়ানো ঠিক হলো কি না কে জানে!

দু'বার পুরো ট্র্যাক চক্কর দিয়ে এসেছে মর্টিমার—প্রথমবার দ্রুত, দ্বিতীয়বার কিছুটা মন্থর গতিতে। সে-সময় ধারাভাষ্যের মত করে বর্ণনা করেছে ট্র্যাকের খুঁটিনাটি। ষোলোটা বাঁক আছে পুরো সার্কিটে, বেশিরভাগই

অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। এ ছাড়াও আছে উঁচু-নিচু ঢাল, কুঁজ, ব্লাইণ্ডস্পট, ইত্যাদি। প্রত্যেকটার জন্যে প্রয়োজন আলাদা আলাদা চুলচেরা হিসেব। দেখতে দেখতে গম্ভীর হয়ে গেল রানা। ট্যুর শেষে দু'জনে ফিরে এল পিটে।

'ব্যস, সবই তো দেখলে,' বলল মর্টিমার। 'এবার নেমে পড়ো প্র্যাকটিসে। গুড লাক। তোমার মাজারাটিটা আমি দেখেছি। ব্লাডি নাইস কার! রেসিঙের জন্যেই বানানো। ঠিকমত চালাতে পারলে জাদু দেখানো সম্ভব। চেসিস নিয়ে ওরা যা করেছে, তাতে আমি ইম্প্রেসড্। নিচু করে ফেলায় ভাল একটা অ্যাডভান্টেজ পাবে তুমি। যাক গে, এখন তা হলে আসি। সন্ধ্যায় *আহ্ল ওয়ার্স্ট* পাবে চলে এসো। টুর্নামেন্টের আগের রাতে রেসাররা সাধারণত ওখানেই আড্ডা দেয়। ছ'টায় এলেই চলবে।'

'বেশি আর্লি হয়ে গেল না?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'উঁহুঁ। আমাদের আসর তাড়াতাড়ি শুরু হয়, ভাঙেও তাড়াতাড়ি। আগামীকাল রেস আছে... তাড়াতাড়ি ঘুমাতে হবে তো!'

'ঠিক আছে, চলে আসব,' হাসল রানা।

বিদায় নিয়ে চলে গেল মর্টিমার। একা হয়ে গেল রানা। হাঁটতে শুরু করল ও—নিজের গাড়িটা খুঁজে নেবে। পিটেরই কোথাও আছে ওর মাজারাটি। বাতাসে তেল আর মেথানলের গন্ধ ভাসছে। গাড়ির ওপর উবু হয়ে আছে কিছু ড্রাইভার; কেউ কেউ আবার জটলা করে সিগারেট টানছে, গল্প করছে। এক ধরনের ভ্রাতৃত্ববোধের আভাস পাওয়া যাচ্ছে রেসারদের মাঝে। আগামীকাল ডোরা-কাটা পতাকা নড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সব ভুলে যাবে এরা, হয়ে উঠবে পরস্পরের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী। তবে যুদ্ধে নামার প্রাক্কালে, এই অপরাহ্নে, সবার মাঝে একটা শিথিল, বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব বিরাজ করছে।

না, ভুল হলো। সবাই নয়, একজন তাদের চেয়ে

আলাদা। দাঁড়িয়ে আছে একাকী। প্রথমে তার গাড়িটা দেখল রানা—কালো রঙের একটা *বিএমডব্লিউ এম-থ্রি।* সম্ভ্রম জাগাবার মত চেহারা গাড়িটার। সেটার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। বিশালদেহী, রুক্ষ মুখশ্রী। গালের একপাশে কাটা দাগ—কেউ ছুরির পোঁচ দিয়েছিল। পরনে রেসিঙের জাম্পসুট। ক্ষণিকের জন্যে থমকাল রানা। যেন রাহাত খানের কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখা ছবিটাই জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। ইগোর দ্রোভনি!

রানার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল লোকটা, এক মুহূর্তের জন্যে চোখাচোখি হলো দু'জনের। দ্রোভনির দৃষ্টিতে বরফের শীতলতা, আবেগের লেশমাত্র নেই। কোনও কথা বলল না সে, তবে রানা বুঝল, ওকে যাচাই করে নিচ্ছে সে, মেপে নিচ্ছে দৃষ্টির পাল্লায়। রানাও একই কাজ করল। সেই সঙ্গে খুঁটিয়ে দেখল প্রতিপক্ষের গাড়িটা। খুব শীঘ্রি ট্র্যাকে মোলাকাত হবে এদের সঙ্গে।

কয়েক মুহূর্ত রানার দিকে তাকিয়ে থাকার পর আগ্রহ হারাল দ্রোভনি। হাত থেকে সিগারেট ফেলে পায়ের তলায় পিষে নেভাল। তারপর ঘুরে চলে গেল আরেকদিকে। রানাও হাঁটতে শুরু করল, একটু পর পৌঁছে গেল নিজের গাড়ির কাছে।

অক্ষত অবস্থায় নিয়রবর্গরিঙে পৌঁছেছে ওর মাজারাটি ১২০। পিটের এক প্রান্তে বসে আছে ঘুমন্ত সিংহের মত। কভারঅল পরা এক লোক পরিচর্যা করছে ইঞ্জিনের, সঙ্গে দু'জন পিট ক্রু। পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘুরল সে। ন্যাকড়ায় হাত মুছতে মুছতে এগিয়ে এল রানার দিকে।

'আপনি মি. মাসুদ রানা?' জিজ্ঞেস করল লোকটা। রানাকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে বলল, 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। আমি রাউল মেণ্ডেজ—আপনার চিফ মেকানিক। মি. উইলিয়াম ওয়াটকিন্স ভাড়া করেছেন আমাকে।'

'জানি,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তিনি আমাকে আপনার কথা বলেছেন।'

মেঙেজের বয়স পঞ্চাশের কোঠায়, গালে চাপদাড়ি, কামানো গোঁফ। দু'কানের উপরে চুলের গোছায় পাক ধরেছে। চেহারায় অভিজ্ঞতার ছাপ। ওয়াটকিন্স জানিয়েছেন, এককালে সে-ও রেসার ছিল। এখনও সে-নেশা কাটেনি, রেসিঙের সংস্পর্শে থাকার জন্যে মেকানিকের পেশা বেছে নিয়েছে।

'ইঞ্জিন ওয়ার্ম-আপ করে রেখেছি আমরা,' বলল মেঙেজ। 'ঠাণ্ডা হবার জন্যে কয়েক মিনিট সময় দিন, এরপর ড্রাইভ করতে পারবেন। আপনি তো বোধহয় এই প্রথম রেস করতে চলেছেন নিয়রবর্গরিঙে?'

'হ্যাঁ,' সায় জানাল রানা।

'ওয়েদার রিপোর্টে চোখ বুলিয়েছি আমি,' বলল মেঙেজ। 'আগামীকাল ভাল থাকবে আবহাওয়া। তারপরেও একটা পরামর্শ দিতে চাই। রোড সারফেসের অ্যাডহেশন ফ্যাক্টরের দিকে খেয়াল রাখবেন। ওটাই সবকিছুর চাবিকাঠি। চাকাগুলোকে খুব বেশি স্পিন করতে দেবেন না। আর শুরুতে একটু আস্তে চালাবেন।' মুচকি হাসল সে। 'সবাই ভাববে, ট্র্যাকে আপনি সুবিধে করতে পারছেন না। অসতর্ক হয়ে পড়বে। আর সে-সুযোগে স্পিড বাড়িয়ে পাশ কাটাবেন সবাইকে।'

রানাও হাসল। 'ধন্যবাদ। আপনার পরামর্শ মাথায় রাখব।'

হেলমেট, গগলস্, হ্যাণ্ডগ্লাভস্, আর ইয়ারপ্লাগ পরে নিল ও। খানিক পর মেঙেজের ইশারা পেয়ে উঠে পড়ল মাজারাটিতে। চক্কর দিতে শুরু করল নিয়রবর্গরিঙের কঠিন সার্কিটে।

বিকেল পর্যন্ত এক নাগাড়ে প্র্যাকটিস করল রানা, এরপর ক্ষান্ত দিল। গাড়িটা মেঙেজের জিম্মায় দিয়ে বসে পড়ল

বিয়ারের একটা ক্যান নিয়ে। সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে বেশ কিছুদিন হলো, কিন্তু আজ একটা না হলেই নয়। কাজেই মেগুেজের কাছ থেকে একটা ধার নিয়ে আয়েশ করে ধরাল। ভাবতে শুরু করল সারাদিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে।

যতটা শুনেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন এই ট্র্যাক। মর্টিমার, জুকভ আর অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় ড্রাইভারদের সঙ্গে পাল্লা দেয়া সম্ভব নয় ওর পক্ষে—অন্তত বাইশটা ল্যাপ তো নয়ই! আশার বাণী একটাই—দ্রোভনি হয়তো রেসের শুরুর দিকে তার চাল দেবে... প্রথম বা দ্বিতীয় ল্যাপে... সেটার সম্ভাবনাই বেশি। পরের দিকে যখন একেকটা গাড়ির মাঝে দূরত্ব বেড়ে যাবে, তখন স্যাবোটাজ করতে গেলে চোখে পড়ে যাবে সবার, ব্যাপারটা দুর্ঘটনা বলে চালাতে পারবে না। কাজেই প্রথম কয়েকটা ল্যাপে শয়তানটার লেজে লেজে থাকতে পারলেই চলবে। নিজস্ব কিছু কৌশল রানারও রয়েছে—স্টার্টিংটা যদি ভাল হয়, আর তীক্ষ্ণ বাঁকগুলো ঠিকঠাক মত পেরিয়ে যেতে পারে, দ্রোভনির চাল ভেস্তে দিতে অসুবিধে হবে না।

বিয়ার আর সিগারেট শেষ করে উঠে পড়ল ও। ফিরে এল হোটেলে। শাওয়ার নিল, বিশ্রাম নিল, এরপর ছ'টা বাজার খানিক আগে রওনা হলো পাবের উদ্দেশে। জিন্সের সঙ্গে পুলোভার পরেছে, পায়ে দিয়েছে স্নিকার। অল্পক্ষণেই পৌঁছে গেল আহ্‌ল ওয়ার্স্ট-এ।

পাবটা পুরনো, তবে বেশ জমজমাট। শুধু রেসাররাই নয়, দূর-দূরান্ত থেকে আসা রেসপ্রেমী মানুষেরাও ভিড় জমিয়েছে ওখানে—সান্ধ্যকালীন আড্ডা আর রেসারদের সঙ্গে পরিচিত হবার লোভে। বিখ্যাত রেসারদের ঘিরে রেখেছে সুন্দরী তরুণীর দল, নানাভাবে প্রলুব্ধ করছে তাদেরকে। রানা নিতান্তই অপরিচিত বলে পাত্তা পেল না কারও কাছে। তাতে একদিক থেকে ভালই হলো। পাবের এক কোণে একটা বুথে

শান্তিতে বসতে পারল ও। অর্ডার দিল ড্রিঙ্কের।

একটু পরেই পাবে ঢুকল নাইজেল মর্টিমার। রীতিমত একটা সাড়া পড়ে গেল, অটোগ্রাফের খাতা-কলম নিয়ে ছোটাছুটি শুরু করল ভক্তরা। যতটা পারল, তাদের খায়েশ মেটাল মর্টিমার। তারপর ক্ষমা চেয়ে সরে এল ভিড়ের মাঝ থেকে। ভক্তরাও তার পিছু নিতে চাইছিল, কিন্তু পাবের নিরাপত্তা-কর্মীরা বাধা দেয়ায় পারল না।

রানাকে দেখতে পেয়েছে মর্টিমার। এগিয়ে এল হাসিমুখে। 'গুড ইভ্নিং! কখন এলে?'

'এই তো,' রানাও পাল্টা হাসল।

'প্র্যাকটিস কেমন করলে?'

'যতটা পারা যায়।'

'আগামীকালের জন্যে তৈরি?'

'হুঁ,' বলেই থেমে গেল রানা। চোখ চলে গেছে পাবের দরজায়। দ্রোভনি আর জুকভ এসে ঢুকেছে ভেতরে, সঙ্গে আরেকজন মানুষ। জুকভের ভক্তরা এগিয়ে আসতে চাইছিল, কিন্তু তাদেরকে ঠেকাবার জন্যে নিরাপত্তা-কর্মীদের ইশারা করল সে। কেমন যেন কাঁচুমাচু দেখাচ্ছে তাকে। দ্রোভনিও সসম্ভ্রমে কথা বলছে নবাগতের সঙ্গে। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ মানুষটা আর কেউ নয়... স্বয়ং অ্যাণ্ডি লিম।

সামনাসামনি লোকটাকে দেখে রানা বুঝতে পারল, ফাইলের ছবিগুলো তার প্রতি মোটেও সুবিচার করেনি। লিমের অবয়বে অদৃশ্য এক ক্ষমতার দ্যুতি রয়েছে, যা ছবিতে ধরা পড়েনি। আর দশজন কোরিয়ানের মত বেঁটে নয় সে, যথেষ্ট লম্বা, এবং কাঠামোতে ইস্পাতের মত কঠিন ও ধারালো একটা ভাব আছে। বয়স সত্তরের ঘরে হলেও দেখাচ্ছে অন্তত পঁচিশ বছর কম। নিশ্চয়ই যত্ন নেয় শরীর-স্বাস্থ্যের। সাদামাঠা চেহারা, ক্লিন-শেভড্। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। ধূসর রঙের সুট পরেছে, পায়ে চকচকে কালো

অক্সফোর্ড শু। জুকভ আর দ্রোভনির সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভেতরে ঢুকল সে। পিছন পিছন ঢুকল দু'জন দেহরক্ষী। পাবের ম্যানেজার ব্যস্ত-সমস্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল, অভ্যর্থনা জানিয়ে লিম ও তার সঙ্গীদের নিয়ে গেল রিজার্ভ করা একটা টেবিলে।

রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে মর্টিমারও তাকিয়েছে ওদিকে। জিজ্ঞেস করল, 'চেনো?'

'না,' মিথ্যে বলল রানা। 'কে?'

'বলো কী!' একটু অবাক হলো মর্টিমার। 'ওঁকে তো সবাই এক নামে চেনে! বিখ্যাত কোরিয়ান ধনকুবের অ্যাণ্ডি লিম। আসল নাম অবশ্য লিম দিয়েই কী যেন... বেশ কঠিন। পশ্চিমা দুনিয়ার সঙ্গে তাল মেলাবার জন্যে ডাকনাম নিয়েছেন অ্যাণ্ডি, সবাই যাতে সহজে ডাকতে পারে... মনে রাখতে পারে।'

'ও হ্যাঁ,' মনে পড়ার ভঙ্গি করল রানা, 'নাম শুনেছি। চেহারা চিনতাম না। ভদ্রলোক এখানে কেন?'

'রেসিঙের ভক্ত, সেই সঙ্গে একটা টিমের মালিকও। সঙ্গে যে-দু'জনকে দেখছ, ওরা কালকের রেসে তাঁর ড্রাইভার। দিমিত্রি জুকভকে তো নিশ্চয়ই চেনো, আমার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। দ্বিতীয়জন অবশ্য খুব নামকরা কেউ নয়। ওর নাম ইগোর দ্রোভনি। কেন যে তাকে টিমে নিয়েছে, কে জানে।'

নিয়েছে তোমাকে চিরতরে সরিয়ে দেবার জন্যে—বলতে ইচ্ছে হলো রানার, কিন্তু নিরস্ত করল নিজেকে। জিজ্ঞেস করল, 'মি. লিমের সঙ্গে পরিচয় আছে তোমার?'

'সামান্য। মোনাকো আর প্যারিসে দেখা হয়েছিল। প্রত্যেকটা রেসের পরে বিশাল পার্টি দেয়া তাঁর অভ্যাস, সেখানে সব ড্রাইভারকে নিমন্ত্রণ করা হয়। ওভাবেই আলাপ হয়েছে। এখানেও পার্টি হবে। নিয়রবর্গের কাছেই একটা প্রাইভেট দুর্গ আছে তাঁর।'

‘সবাই যায় ওঁর পার্টিতে?’

‘যাবে না মানে! বিনে পয়সায় দামি শ্যাম্পেন আর ক্যাভিয়ার খাওয়ার সুযোগ কে হাতছাড়া করতে চায়? তা ছাড়া থাকে সুন্দরী মেয়েদের মেলা!’ চোখ টিপল মর্টিমার। ‘হাত-পা বা ঘাড় না ভেঙে যদি রেস থেকে ফিরতে পারো, তুমিও সুযোগ পাবে যাবার।’

চলে গেল সে। রানার বিয়ার এসে গেছে—রেসের আগের রাতে নেশা করতে চায় না। বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে অ্যাণ্ডি লিমের দিকে নজর দিল ও। তাকে মেপে নিল দৃষ্টি দিয়ে যতটা সম্ভব। নিচু গলায় দুই রেসারের সঙ্গে কথা বলছে লোকটা, হাবভাব খুব সিরিয়াস। নিশ্চয়ই শেষ মুহূর্তে নিজেদের প্ল্যান ঝালাই করে নিচ্ছে।

অসুবিধে নেই, যত খুশি প্ল্যান আঁটো—মনে মনে ভাবল রানা, খুব শীঘ্রি তোমাদের ষড়যন্ত্রের বারোটা বাজাব আমি।

চার

আকাশে গনগনে সূর্য। গ্র্যাণ্ডস্ট্যাণ্ড ভরে উঠেছে কানায় কানায়। অন্তত কয়েক হাজার লোক হাজির হয়েছে নিয়রবর্গের রেসিং ট্র্যাকে—ইয়োরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ দেখার জন্যে। উত্তেজনায় টগবগ করছে সবাই। তার সঙ্গে মিশেছে ভারী ইঞ্জিনের গর্জন আর পেট্রোলের কটু গন্ধ। এই পরিবেশ রানার চেনা। ইটালিয়ান রেসার আমবার্তো ম্যাগলিয়োলির একটা বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ল ওর—*রোড*

রেসাররা জুয়াড়ির মত। দুটো অঙ্গনেই অভিজ্ঞতা আছে ওর; তাই জানে, এক বিন্দু ভুল বলেননি ভদ্রলোক। দুটোই ঝুঁকিপূর্ণ, দুটোতেই সবকিছু হারাবার ভয় থাকে... তারপরও জুয়াড়ি আর রেসারদের সে-ঝুঁকি নেয়া চাই।

অবশ্য জুয়ার টেবিলের চেয়ে রেসের ট্র্যাক অনেক গুণ ভয়ঙ্কর। জুয়ায় হারলে কেবল সর্বস্বান্ত হয় মানুষ, কিন্তু রেসের ট্র্যাকে চলে যেতে পারে জীবনটাই। বলা হয়ে থাকে, কার রেসিঙে নবীন ড্রাইভার, আর যুদ্ধের ময়দানে একজন সৈনিকের বেঁচে থাকার সম্ভাবনার হার নাকি সমান—প্রতি আটজনে একজন! হিসেবটা অস্বাভাবিক নয়; দেড়শো-দু'শো মাইল বেগে, আঁকা-বাঁকা রাস্তায়, একদল প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যখন কেউ গাড়ি চালাতে যায়, তখন প্রতিটা সিদ্ধান্ত নিতে হয় সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের ভেতর... গাড়িটাকে চালাতে হয় নিজের শরীরের চেয়েও নিখুঁতভাবে। কিন্তু ভুল হয়েই যায়, তার খেসারত দেয় রেসাররা নিজের জীবন দিয়ে। নিয়রবর্গরিং একাই তার একটা বড় অংশের সাক্ষী। তবুও প্রতিটা প্রতিযোগিতার সময় ভরে ওঠে গ্যালারি। ভয়ঙ্কর এই প্রতিযোগিতাকে চালিয়ে যেতে, রেসারদেরকে জীবনের ঝুঁকি নেবার জন্যে উৎসাহিত করতে লোকের অভাব হয় না। শুধুই কি দ্রুত গাড়ি-চালনা দেখতে আসে ওরা? উঁহুঁ, সবাই মনে মনে চায়, একটা-দুটো দুর্ঘটনা ঘটুক, গাড়ি ভাঙুক, মানুষ মরুক... তবেই না মজা!

অ্যাণ্ডি লিমকে দেখতে পাচ্ছে না রানা। গ্র্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডের এক প্রান্তে, নিজের ভিআইপি বক্সে বসে আছে সে। রানা যেখানে রয়েছে, সেখান থেকে ওটা দৃষ্টিগোচর হয় না। রেসের চব্বিশজন প্রতিযোগীর মধ্যে ও-ও একজন। শুরুটা হবে ৩-২-৩ ফর্মেশনে, মানে প্রথম সারিতে তিনটা গাড়ি, তারপর দুটো, এরপর আবার তিনটা... এভাবে। কে কোথায় থাকবে, তা নির্ধারিত হয়েছে সকালের টাইম ট্রায়ালে।

দুর্ভাগ্যক্রমে ওতে খুব একটা ভাল করতে পারেনি ও, পজিশন নিতে হয়েছে পাঁচ নম্বর সারিতে। ট্রায়াল রাউণ্ডে গিয়ার বদলাতে গিয়ে একটি বার সামান্য দেরি করে ফেলেছিল, তার খেসারত দিতে হয়েছে বাড়তি সময় দিয়ে। পিটে ফিরতেই মেণ্ডেজ হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়েছে, তবে রানা তাতে বিশেষ পাত্তা দেয়নি। ভুল-ত্রুটি হতেই পারে... সেটা ট্রায়ালের সময় হওয়ায় ভাল হলো। মূল রেসে অনেক বেশি সতর্ক থাকবে ও। স্টার্টিং পজিশন পিছিয়ে যাওয়ায় কিছু যায়-আসে না, ও তো আর রেস জেতার জন্যে নামছে না! বরং সবকিছু ঠিকঠাকমত এগোলে সার্কিটে বেশি সময় থাকতেও হবে না ওকে।

দর্শকদের হৈ-হল্লা বেড়ে যাওয়ায় ঘাড় ফেরাল রানা। মর্টিমার এগিয়ে যাচ্ছে তার গাড়ির দিকে। হাত নাড়ছে ভক্তদের উদ্দেশে। দর্শকরা উঠে দাঁড়িয়েছে, হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছে তাকে। দ্রোভনিকেও দেখতে পেল—গলায় একটা লাল রঙের সিল্কের স্কার্ফ বাঁধছে, তাকে ঘিরে রেখেছে টিমের লোকজন। শেভ করেনি লোকটা, গাল ঢাকা পড়ে আছে খোঁচা খোঁচা দাড়িতে। চেহারা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে তাতে। একদৃষ্টে মর্টিমারের দিকে তাকিয়ে আছে সে, হঠাৎ মুখ ঘোরাতেই রানার চোখে চোখ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে সমস্ত দ্বিধা দূর হয়ে গেল রানার। দ্রোভনির উদ্দেশ্যের ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। স্নাইপার-স্কোপের পেছনে একজন খুনির দৃষ্টি যেমন থাকে, তার চোখেও সেই দৃষ্টিই ফুটে উঠেছে। শিকার আর শিকারিকে চিনতে ভুল হয় না রানার। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, মর্টিমার আর দ্রোভনি এখন ওই দুটো ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

মাজারাটির পাশে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে মেণ্ডেজ। রানা এগিয়ে যেতেই বলল, 'সকালে মস্ত ভুল করেছেন, মি. রানা। আরেকটু হলেই ছিটকে যেতেন রেস থেকে। এবার

যেন আর সে-ভুল না হয়।'

'হবে না,' তাকে আশ্বস্ত করল রানা। 'এক ভুল দু'বার করি না আমি।' আশপাশে নজর বোলাল, গোপন কৌশলটা খাটাবার সময় হয়েছে। মেণ্ডেজকে বলল, 'এক কাজ করুন, ট্যাঙ্কটা খালি করতে শুরু করুন। কেউ যেন দেখতে না পায়।'

'কী!' চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল মেণ্ডেজের। 'ট্যাঙ্কি খালি করব মানে?'

'কোয়ার্টার ট্যাঙ্ক ফিউয়েল নিয়ে রেস শুরু করতে চাই আমি।'

'আপনি সিরিয়াস?' মেণ্ডেজের কণ্ঠে দ্বিধা। 'তা হলে তো খুব শীঘ্রি রিফিউয়েলিঙের জন্যে পিটে ফিরতে হবে আপনাকে। অনেকটা সময় হারাবেন। সেটা পরে রিকভার করা কঠিন হবে।'

'ওসব নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। দু-তিন ল্যাপ দেবার মত তেল থাকলেই চলবে। এর বেশি প্রয়োজন নেই।'

কয়েক মুহূর্ত বোকার মত তাকিয়ে রইল মেণ্ডেজ। শেষে কাঁধ ঝাঁকাল। 'বেশ, আপনার যা মর্জি।'

হাত নেড়ে একজন সহকারীকে ডাকল সে। হাবভাবে হতাশা ফুটে উঠেছে। রানার সত্যিকার মিশন জানা নেই তার, ভাবছে রেস শুরু হবার আগেই স্বেচ্ছায় হেরে যেতে চাইছে ও। তার ভুল ভাঙানোর কোনও চেষ্টা করল না রানা।

আসলে জুয়া খেলতে চলেছে ও। ধরে নিয়েছে, যা করার, রেসের প্রথম দু-তিন ল্যাপেই তা করবে দ্রোভনি। সেটাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ এরপর অনেকটা এগিয়ে যাবে মর্টিমার, তাকে নাগালে পাবে না সে। কাজেই তেল কমিয়ে একটা সুবিধে পেতে চাইছে রানা। ট্র্যাকে ওর গাড়িটা সবচেয়ে হালকা হয়ে যাবে এতে। ওজন কমায় বেড়ে যাবে

গতি। সমস্যা হলো, গতি বাড়াতে গিয়ে দূরত্ব খোয়াচ্ছে ও। দ্রোভনি যদি তার চাল দিতে দেরি করে, বিপদে পড়ে যাবে। রিফিউয়েলের জন্যে থামতে হবে পিটে। তখন লোকটাকে নাগালে পেতে চাইলে ড্রপ করতে হবে পুরো একটা ল্যাপ। তাতে সবার নজর পড়বে ওর ওপর। ভণ্ডুল হবে পরিকল্পনা। কিন্তু ঝুঁকিটা না নিয়ে উপায়ও নেই। অভিজ্ঞ প্রফেশনাল রেসারদের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়ে কিছুতেই পেরে উঠবে না ও, কৌশল খাটাতেই হবে। সত্যিকার অর্থেই জুয়ায় নামতে হচ্ছে তাই।

মেণ্ডেজ ইতিমধ্যে কাজে নেমে পড়েছে। পোর্টেবল একটা স্ক্রিন খাটিয়ে আড়াল করেছে গাড়িটা, যাতে কী করছে সেটা আর কেউ দেখতে না পায়। রানা নিজেও তৈরি হলো। কানে ইয়ারপ্লাগ ঢোকাল, হাতে পরে নিল গ্লাভস্। এরপর কপাল থেকে গগলস্ নামিয়ে আনল চোখে। আশু-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন, দূর করে দিয়েছে দুশ্চিন্তা। দ্রোভনিকে এক মেকানিকের উদ্দেশে খেঁকিয়ে উঠতে দেখল। তার বিএমডব্লিউ-র ইঞ্জিন চালু করা হয়েছে, এগজস্ট দিয়ে বেরুচ্ছে কালো ধোঁয়া। কেঁপে কেঁপে যেন হুমকি দিচ্ছে সবাইকে—দূরে সরে থাকার জন্যে। আশপাশে অন্যান্য গাড়িও স্টার্ট দেয়া হচ্ছে; রানার মনে হলো, যান্ত্রিক গর্জনের এক সাগরের মাঝে ডুবতে শুরু করেছে ও। জাম্পসুটের হাতা সরিয়ে হাতঘড়ি দেখে নিল—চার মিনিট বাকি রেস শুরু হতে।

স্ক্রিন সরে গেল। মেণ্ডেজের কাজ শেষ। এক মেকানিককে দুটো বড় জেরিক্যান নিয়ে চলে যেতে দেখল রানা। মেণ্ডেজ হাতছানি দিয়ে ডাকল ওকে। কাছে গিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল ও। মনে মনে চেকলিস্ট মিলিয়ে নিচ্ছে। গগলস্ অ্যাডজাস্ট করতে হবে, ভালমত আটকে নিতে হবে সিটবেল্ট আর শোল্ডার স্ট্র্যাপ। বসতে হবে হুইলের খুব

কাছে, হাতদুটো যেন ভাঁজ হয়ে থাকে। এসব কথা ওয়াটকিন্স বার বার বলে দিয়েছেন ওকে। হুইল ঘোরাবার সমস্ত শক্তি আর প্রতিক্রিয়া আসে হাত থেকে—কাজেই হাতের পজিশন ঠিক রাখাটা সবচেয়ে জরুরি। হাত একটু এদিক-সেদিক হলেই সব শেষ।

দু'পাশ থেকে দু'জন পিট ক্রুকে এগিয়ে আসতে দেখল রানা, ঠেলে গাড়িকে ট্র্যাকে নিয়ে যাচ্ছে তারা। স্টার্টিং পজিশনে নিয়ে রাখল ওরা গাড়িটা। একটা চোখ রাখল রানা পতাকার দিকে, ওটা নড়লেই রেস শুরু হবে; আরেক চোখ সামনে। মনে মনে হিসেব কষছে, কীভাবে সামনের গাড়িগুলোর ফাঁকফোকর গলে এগিয়ে যাবে। মর্টিমার একেবারে সামনের সারিতে। জুকভও তা-ই। দ্রোভনি পজিশন নিয়েছে দ্বিতীয় সারিতে, মর্টিমারের বাম কোণে। মাঝে রয়েছে জার্মানি, ইটালি, ফ্রান্স, পর্তুগাল-সহ অন্যান্য দেশের প্রতিযোগীরা। পঞ্চম সারির ঠিক মাঝখানে রানার অবস্থান। কাঁধে রোদ পড়ছে ওর, ইন্দ্রিয়গুলোর ওপর আঘাত হানছে গগনবিদারী আওয়াজ আর পেট্রোল-পোড়া ধোঁয়া। স্নায়ু টান টান করে অপেক্ষা করছে সবাই রেস শুরুর সঙ্কেত পাবার জন্যে। কপালের পাশ দিয়ে এক ফোঁটা ঘাম নেমে এল রানার। লণ্ডনের যে-ট্র্যাকে গত কয়েকদিন প্র্যাকটিস করে এসেছে, সেটা এখানকার তুলনায় নিতান্তই ছেলেখেলা ছিল। এবার সত্যিকার পরীক্ষায় নামতে চলেছে ও।

সময় যেন থমকে রইল... তারপর ঝপ্ করে নেমে গেল পতাকা।

সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আওয়াজ উঠল অ্যাসফল্টের সঙ্গে টায়ারের ঘর্ষণের। জ্যা-মুক্ত তীরের মত ছিটকে সামনে এগোল সবক'টা গাড়ি। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গেছে সবাই, এখন কেবলই ছুটে চলার পর্ব... প্রতিদ্বন্দ্বীদের পেছনে ফেলার প্রচেষ্টা। কিছুক্ষণের জন্যে মিশনের কথা রানাও ভুলে গেল,

ওর সমস্ত মনোযোগ এখন ভাগাভাগি হয়ে গেছে রাস্তা, গিয়ার, হুইল, ওয়েট-ট্রান্সফার, আর সামনে এগোবার পথ খুঁজে নেয়ায়। রেভ কাউন্টারের দিকে তাকাবার ইচ্ছেটা বহু কষ্টে গলা টিপে মারল ও, ওদিকে তাকালেই ভিড়ের মাঝে একটা দুর্ঘটনা ঘটবে। শুরুতে অর্ধেকের বেশি রেভল্যুশন দেয়া নিষেধ, ইঞ্জিনের ওপর বাড়তি চাপ পড়ে... কাউন্টারের দিকে না তাকিয়ে স্রেফ অনুমানের ভিত্তিতে সীমারেখাটা মেনে চলার চেষ্টা করল ও। কিন্তু বারংবার মনের ভেতরে হানা দিল ভয়—বেশি করে ফেলছে না তো? কাউন্টারের কাঁটা কি স্পর্শ করছে লাল দাগ? কিন্তু তাকাবার সাহস হলো না। ওর দৃষ্টি এখন সামনে আর পেছনে নিবদ্ধ। একই সঙ্গে সবকিছু দেখছে, আবার দেখছে না। গ্যালারি তো পেরিয়ে এসেছে বহু আগেই, এখন দু'পাশের দৃশ্যও মিলিয়ে গেছে। দু'পাশের জানালায় এখন কেবলই রঙিন ঘোলাটে রেখা, ঝড়ের বেগে সরে যাচ্ছে।

আচমকা টের পেল রানা, ট্র্যাকের ঢালু অংশে পৌঁছে গেছে। সার্কিটের প্রথম হেয়ারপিন টার্নটা ঠিক সামনে। হুইলে মোচড় দিল ও... না, বেশি হয়ে যাচ্ছে... আলতো করে ঘোরাতে হবে। দ্রুত সংশোধন করল নিজেকে। প্রায় ঘষা দেবার ভঙ্গিতে একটা পোর্শা, আর দুটো ফিয়াটকে পেরিয়ে এল। অর্ধেক কাজ মাজারাটিই করে দিচ্ছে—হালকা শরীর নিয়ে দুর্বার বেগে ছুটছে গাড়িটা। কারও সাধ্য নেই ওটাকে ঠেকায়।

মোড়ের কাছে চলে এসেছে রানা। নিঃশব্দে কথা বলছে নিজের সঙ্গে—শান্ত থাকো, ট্র্যাকে অন্তত ডজনখানেক চক্কর দিয়েছ তুমি, প্রতিটা ইঞ্চি তোমার চেনা। ডানের লেনে যাও। সাবাস! এবার একেবারে কিনার ঘেঁষে ঘোরো! মুখস্থ করে আসা সমস্ত ডায়াগ্রাম আর ছবি ততক্ষণে ঝোড়ো বাতাসে শুকনো পাতার মত উড়ে গেছে মনের পর্দা থেকে। এখন

স্রেফ ইন্সটিঙ্কটের বশে ড্রাইভ করছে ও, যুঝছে সেণ্ট্রিফিউগাল ফোর্স বা কেন্দ্রাতিগ বলের ভর আর বেগের অমিত শক্তির বিরুদ্ধে—ওরা চাইছে গাড়িসহ রানাকে ছিটকে ফেলে দিতে। রানার একমাত্র অস্ত্র—গাড়ির চাকা আর রাস্তার মধ্যকার চৌম্বকীয় শক্তি। তার জোরেই টিকে আছে ও, কাঁচকলা দেখাচ্ছে সেণ্ট্রিফিউগাল ফোর্স বা কেন্দ্রাতিগ বলকে। পুরোটাই রানার হাত, পা, আর মস্তিষ্কের খেলা... গাড়ি আর নিজের দেহকে একাত্ম করে ছুটে চলার খেলা।

সাঁই সাঁই করে দুটো ইটালিয়ান ফেরারিকে ওভারটেক করল ও। মৃদু হাসি ফুটল ঠোঁটে। হ্যাঁ, কাজে লেগেছে প্ল্যান। স্টার্টিং পজিশনের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। এবার আসল কাজের পালা। মর্টিমার আর দ্রোভনি কোথায়? কতটা এগিয়ে গেছে ওরা?

ঝুঁকি নিয়ে চট করে স্পিডোমিটারের দিকে তাকাল রানা, পরক্ষণেই গাল দিল নিজেকে। কারণ সেকেণ্ডের যে-ভগ্নাংশের জন্যে মনোযোগ ফিরিয়েছিল, তাতেই সর্বনাশ হয়েছে। পরের মুভের টাইমিঙে গড়বড় হয়ে গেছে ওর। ঢিবির মত উঁচু একটা অংশের মাথা থেকে শূন্যে লাফ দিল মাজারাটি, চাকার নিচে রাস্তা না থাকায় ক্ষণিকের জন্যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল ও। গতি কমিয়ে রাস্তা কামড়ে জায়গাটা পার হবার কথা ছিল ওর, কারণ নিচে পৌঁছুলেই পরের মোড় পার হবার জন্যে গাড়ির নাক ঘোরাতে হবে। তার বদলে ধড়াম করে রাস্তার ওপর নেমে এল মাজারাটি, প্রচণ্ড ঝাঁকিতে আর্তনাদ করে উঠল শরীরের প্রতিটি অস্থিসন্ধি। সবচেয়ে বড় কথা, গাড়ির নাক তখনও সোজা। বন বন করে হুইল ঘোরাল রানা, বিপজ্জনক ভঙ্গিতে পেরিয়ে এল মোড়টা। শেষ মুহূর্তে ব্রেক চেপে উদ্দাম গতিকে নিয়ন্ত্রণে আনল। ধীরে বাঁক ঘোরার কথা এখানে, ঘোরা শেষ হলে গতি বাড়াবার কথা... অথচ ও করেছে ঠিক উল্টোটা! দুর্ঘটনা

ঘটে যাওয়াই স্বাভাবিক ছিল, স্রেফ ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছে ও।

না, আর ভুল করা যাবে না। পরের বাঁক পেরুনোর সময় রোবটের মত নিয়ম পালন করল রানা—আলতো ব্রেক, হুইলে মোচড়, তারপর ফের থ্রটল চাপা। রাস্তায় কী যেন চকচক করে উঠল, সামনের কোনও গাড়ি থেকে তেল ঝরেছে। ওখানে চাকা পিছলে যেতে পারে, এঁকেবেঁকে জায়গাটা পেরিয়ে এল ও।

নিয়রবর্গরিঙের একটার পর একটা সেকশন পার হয়ে চলেছে রানা। *দ্য পিক, দ্য মাইন, দ্য ক্যারুসেল, দ্য লিটল ফাউন্টেইন...* নির্দোষ নামগুলো শুনে বোঝার উপায় নেই, প্রতিটার আড়ালে কী ভয়ানক বিপদ লুকিয়ে আছে। ডানে-বাঁয়ে ক্রমাগত তীক্ষ্ণ বাঁক নিতে হচ্ছে ওকে, কখনও বা ঝপ্ করে নেমে যাচ্ছে রাস্তা, পরক্ষণে আবার খাড়া হয়ে উঠে আসছে উপরে। একের পর এক পরীক্ষা নিচ্ছে ওর। শেষ সেকশনটা ওকে স্বাগত জানাল একটা ব্লাইণ্ড কর্নার উপহার দিয়ে। সেটা পেরুতেই পাকস্থলী খামচে-ধরা একটা ড্রপে পড়ে গেল ও—ফাঁদটা একেবারে শেষ মুহূর্তের আগে দেখতে পায়নি, ওটা একটা ব্রিজের আড়ালে ঢাকা পড়ে ছিল। নিচে রয়েছে ঘন গাছপালার সারি, সেগুলোকে কাটিয়ে যেতে হবে। ধড়াম করে রাস্তায় আছড়ে পড়ল মাজারাটি, চকিতে হুইল ঘোরাল রানা। পরক্ষণে টের পেল, রাস্তায় কামড় বসাতে ব্যর্থ হয়েছে চাকা, ভয়ঙ্কর বেগে পিছলাতে শুরু করেছে গাড়ির পুরো কাঠামো। ব্রেক চাপলেই শেষ... স্রেফ উল্টে যাবে ও, গড়াতে গড়াতে গিয়ে বাড়ি খাবে গাছের গায়ে। থ্রটল চাপল না রানা, কোনোমতে হুইল ঘুরিয়ে বিপর্যয় এড়াল, চাকাগুলোকে সময় দিল রাস্তাকে আঁকড়ে ধরার। আর সেটা করতে গিয়ে কয়েকটা মূল্যবান সেকেণ্ড হারাল। মর্টিমার, আর দ্রোভনিকে দেখতে পেয়েছিল শেষ সেকশনে ঢোকার

আগে; এখন তারা আবার হারিয়ে গেছে দৃষ্টিসীমা থেকে।

পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা, এভাবে বাইশটা ল্যাপ দেয়া কিছুতেই সম্ভব নয় ওর পক্ষে। হাত আর পায়ের পেশিতে ব্যথা শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। ক্রমাগত ঝাঁকি খেয়ে দেহের ভেতরের সবকিছু যেন ওলটপালট হয়ে গেছে। বমি পাচ্ছে। এভাবে কতক্ষণ টেকা সম্ভব? খুব শীঘ্রি সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে যাবে ও, তখন হয় দুর্ঘটনায় পড়বে, নয়তো স্বেচ্ছায় সরে যেতে হবে রেসের ট্র্যাক থেকে। তার আগেই নাগাল পেতে হবে মর্টিমার আর দ্রোভনির। একটাই সুবিধে রয়েছে ওর হাতে—ওরা কিছুটা সতর্কভাবে ড্রাইভ করছে, গাড়িকে অক্ষত রাখতে চাইছে রেসের শেষ পর্যন্ত। কিন্তু রানাকে তা করতে হচ্ছে না। গাড়ি আর ইঞ্জিনের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার চালাতে পারছে ও, দীর্ঘমেয়াদি পরিণতির আশঙ্কা না করে। বেশি না, সর্বোচ্চ তিনটে ল্যাপ টিকে থাকতে হবে ওকে; এরপর যা হয় হোক। গতি বাড়িয়ে দিল ও।

একটু পরেই সামনে ফুটে উঠল মর্টিমার আর দ্রোভনির গাড়ির অবয়ব। জুকভও রয়েছে, তবে ইচ্ছাকৃতভাবে একটু পিছিয়ে রয়েছে সে; মর্টিমারের দুর্ঘটনার জন্যে যেন কেউ তাকে দোষারোপ করতে না পারে। আচমকা কেশে উঠল রানার ইঞ্জিন। আঁতকে উঠল ও। ব্যাপার কী... এত তাড়াতাড়ি ফিউয়েল ফুরিয়ে গেল? নাকি ওর অত্যাচারে কোনোভাবে ব্লক হয়ে গেছে ফিউয়েল ইঞ্জেকশন সিস্টেম? আরেকবার কাশল ইঞ্জিন। মাথার ওপর দিয়ে ব্রিজস্টোন টায়ারের বিশাল এক ব্যানার চলে যেতে দেখল ও—আগেও দেখেছে ওটা। এর অর্থ, হয় ব্রিজস্টোন কোম্পানি একই রকম দুটো ব্যানার টাঙিয়েছে ট্র্যাকে, নয়তো ইতিমধ্যে একটা ল্যাপ কমপ্লিট করেছে ও। তা কী করে হয়? নিয়রবর্গরিঙে পৌনে সাত মিনিটের কমে আজ পর্যন্ত কেউ ল্যাপ দিতে

পারেনি... অতটা সময় তো যায়নি এখনও! রানার হিসেবে দু-আড়াই মিনিটের বেশি হবার কথা নয় কিছুতেই। চোখের কোণে রঙের ফুলঝুরি দেখতে পেল, গ্র্যাণ্ডস্ট্যাণ্ড পেরোচ্ছে ও। তারমানে সত্যিই একটা ল্যাপ চলে গেছে, রেসের উত্তেজনায় সময়জ্ঞান লোপ পেয়েছে ওর। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে দুশ্চিন্তা ভর করল মাথায়। বরাদ্দ তিনটে ল্যাপের মধ্যে প্রথমটা চলে গেছে, কিছু করেনি দ্রোভনি; পরের দুটোর মধ্যেও যদি না করে, রিফিউয়েলের জন্যে থামতে বাধ্য হবে রানা... হয়তো পিটে দাঁড়িয়ে শুনবে, ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে মর্টিমার।

সাময়িকভাবে মনোযোগ টুটে যাওয়ায় পরের বাঁকটা ঠিকমত ঘুরতে পারল না ও, একপাশের চাকা চলে গেল ঘাসে। ক্ষণিকের জন্যে গ্রিপ হারাল রানা, তবে ফিরে পেল চাকাগুলো রাস্তায় উঠে আসতেই। টের পেল, ভুলটা আসলে উপকার করেছে ওর। বলতে গেলে সরলরেখায় পার হয়েছে সহজ বাঁকটা, ফলে কয়েক মাইক্রোসেকেণ্ড এগিয়ে গেছে। সামনে সোজা রাস্তা দেখে সাহস আরও বাড়ল। গ্যাস প্যাডাল চেপে ধরল ফ্লোরবোর্ডে। হু-হু করে গতি বেড়ে গেল মাজারাটির। হাতের পেশিতে ঢিল দেবার সুযোগ মিলল; একই সঙ্গে সুযোগ মিলল ড্যাশবোর্ডে চোখ বোলাবার। অয়েল প্রেশার, ওয়াটার টেম্পারেচার, আর রেভল্যুশন... সবই ঠিকঠাক দেখাচ্ছে গজগুলোয়। রিডিঙের সত্যতা প্রমাণের জন্যে ইঞ্জিনও কাশছে না আর। অনায়াসে জুকভকে পেরিয়ে এল রানা। সে-ই সম্ভবত দিল সুযোগটা। সাধু সাজার জন্যে মর্টিমারের সঙ্গে নিজের দূরত্ব আরও বাড়িয়ে নিচ্ছে। রানার সামনে এখন শুধুই মর্টিমার আর দ্রোভনি।

কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে স্থির হয়ে রইল গাড়ি তিনটে। আসলে সমান বেগে ছুটছে, পরস্পরের মাঝে দূরত্ব বাড়ছে-কমছে না। গুঁড়ি মেরে দ্রোভনির ঠিক পেছনে চলে এল রানা,

কৌশলে প্রতিপক্ষের গাড়িটাকে বাতাসের বিরুদ্ধে ঢালের মত ব্যবহার করতে চায়। বাতাস যদি কম ঠেলতে হয়, গতি বাড়বে ওর গাড়ির। চলে গেল একেবারে টেইলের কাছাকাছি। দুই গাড়ির মাঝে এখন কয়েক ইঞ্চি দূরত্ব। স্পিডোমিটারে চোখ বোলাল ও—একশো ত্রিশ মাইল বেগে ছুটছে। তারমানে সেকেণ্ডে প্রায় দু'শো ফুট! এখন সামান্যতম ভুলেও ভয়াবহ অঘটন ঘটে যাবে, মারা পড়বে ও আর দ্রোভনি। মর্টিমার অবশ্য বেঁচে যাবে, কিন্তু তাকে বাঁচাতে গিয়ে আত্মহত্যা করবার কোনও ইচ্ছে নেই রানার।

দ্রোভনিকে হঠাৎ জানালা দিয়ে হাত বের করতে দেখল ও। পরমুহূর্তে মাজারাটির উইণ্ডশিল্ডে মাকড়সার জালের মত হাজারো ফাটল ধরল। মাতালের মত ডানে-বামে দুলল গাড়িটা, সামনের দৃশ্য ঠিকমত দেখতে পাচ্ছে না রানা। কী ঘটেছে, সেটা বুঝল দু'সেকেণ্ড পরে। জানালা থেকে নুড়িপাথর জাতীয় কিছু একটা ছুঁড়ে দিয়েছে রাশান শয়তানটা, যাতে অন্ধ হয়ে যায় রানা, পেছনে লেগে থাকতে না পারে। কিন্তু কেন? ও যে মর্টিমারকে রক্ষা করতে চাইছে, সেটা তো লোকটার জানার কথা নয়! বিকল্প ব্যাখ্যা একটাই—মর্টিমারের ওপর আঘাত হানতে চলেছে সে, তাই পিছন থেকে সরিয়ে দিল একমাত্র সাক্ষীকে। আশপাশে কোনও দর্শক নেই, রাস্তার দু'ধারে শুধু গাছপালার সারি। ক্যামেরা বলতে আকাশে উড়তে থাকা একটা হেলিকপ্টারে রয়েছে টিভি ক্যামেরা—রেসের সরাসরি সম্প্রচার করছে ওটা; কিন্তু অত ওপর থেকে দ্রোভনির সূক্ষ্ম চাল ধরা পড়বে না।

কপাল চাপড়াতে ইচ্ছে করল রানার। উইণ্ডশিল্ড ফেটে যাওয়ায় স্পিড কমাতে বাধ্য হয়েছে ও, সেই সুযোগে অনেকটাই এগিয়ে গেছে মর্টিমার আর দ্রোভনি। ওদেরকে ধরতে পারবে না। অসহায়ভাবে এখন মরতে হবে মর্টিমারকে। দাঁতে দাঁত পিষল ও। না, তা হতে দেয়া যায়

না। হুইলের ওপর ঝুঁকে পড়ল রানা, উইণ্ডশিল্ডের ফাটলগুলোর মাঝে খুঁজে নিল পরিষ্কার একটা অংশ, মুখ যতটা সম্ভব কাছে নিয়ে চোখ রাখল ওই বরাবর। এরপর চেপে ধরল অ্যাকসেলারেটর। যতটুকু দেখতে পাচ্ছে, তার ওপর ভর করেই কঠিন ঝুঁকি নিচ্ছে ও।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে মর্টিমারের কাছে এগিয়ে যাচ্ছে দ্রোভনি, কমিয়ে আনছে ব্যবধান। সেফটি মার্জিনের পরোয়া করছে না। রানা যেভাবে ভেবেছে, ঠিক সেভাবেই নিচ্ছে পজিশন। ব্যাটার মতলব নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। ওভারটেক করবে না সে, বরং ওভারটেকের ভঙ্গিতে পাশ কাটাবার সময় গুঁতো মারবে মর্টিমারের পেছনের চাকায়। সঙ্গে সঙ্গে ব্যালেন্স হারাবে বেচারা। গাড়িটা চরকির মত ঘুরতে ঘুরতে ছিটকে চলে যাবে রাস্তার বাইরে। চোখের সামনে সব দেখতে পাচ্ছে রানা, অথচ করার কিছু নেই। ও এখনও অনেকটাই পিছে।

কপাল ভাল, আচমকা দ্রোভনির ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠল মর্টিমার। ওভারটেকের চেষ্টাটা ভণ্ডুল করে দিল নিজের গাড়িকে বিএমডব্লিউর সামনে নিয়ে এসে। অগত্যা গোড়া থেকে আবারও প্রক্রিয়াটা শুরু করতে বাধ্য হলো দ্রোভনি... আবারও পজিশন নেবার জন্যে নড়াচড়া করতে হলো তাকে। রানা পেয়ে গেল মূল্যবান কয়েকটা সেকেণ্ড। অ্যাকসে-লারেটরের ওপর প্রায় দাঁড়িয়ে গেল ও—মাজারাটির ইঞ্জিন নিংড়ে বের করে আনছে শক্তির শেষ বিন্দুটুকু। মরিয়া পশুর মত আগে বাড়ল মাজারাটি, একটু একটু করে চলে এল দ্রোভনির বিএমডব্লিউ-র পাশে। বিস্মিত হয়ে দ্রোভনিকে ঘাড় ফেরাতে দেখল রানা, বিভ্রান্ত চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে... বুঝতে চাইছে ঘটনা। তার উদ্দেশ্যে একটা হাত নাড়ল ও, আলতো চাপ দিল ব্রেকে। পিছিয়ে এসে মাজারাটির সামনের চাকাকে অ্যালাইন করল বিএমডব্লিউ-র

পেছনের চাকার সঙ্গে।

বাঁকের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। এতক্ষণে দ্রোভনি বুঝতে পারল ব্যাপারটা—পাশার ছক উল্টে গেছে, ওর অস্ত্রেই ওকে ঘায়েল করতে চলেছে রানা। মুখ থেকে রক্ত সরে গেল তার। অ্যাকসেলারেটর চেপে দ্রুত ঘোরাল স্টিয়ারিং হুইল, ফাঁদ কেটে রানার সামনে চলে যেতে চায়। কিন্তু ততক্ষণে মরণ-গুঁতোটা দিয়ে ফেলেছে রানা। দ্রোভনির অপ্রত্যাশিত মুভমেন্টের কারণে ফলাফলটা একটু অন্যরকম হলো—চরকির মত ঘুরতে ঘুরতে রাস্তা থেকে ছিটকে গেল না বিএমডব্লিউ, বরং আধ পাক খেয়ে আড়াআড়িভাবে চলে এল রানার সামনে। রিঅ্যাকশন টাইম পেল না রানা, খেপা ষাঁড়ের মত বিএমডব্লিউ-র গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাজারাটি।

ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের সংঘর্ষের বিশ্রী আওয়াজ হলো। হুইলে কপাল ঠুকে গেল রানার, আঁধার হয়ে এল দৃষ্টি। মাজারাটির নাক তুবড়ে গেল, লেজটা উঠে গেল উপরে, একই সঙ্গে উড়িয়ে দিল বিএমডব্লিউ-কে। নাটাইয়ের মত শূন্যে কয়েকবার পাক খেল ওটা, এরপর দড়াম করে আছড়ে পড়ল নিচে। থামল না, পাক খেতে খেতে চলে গেল ট্র্যাকের বাইরে। মাজারাটি তখন লেজ ভাসিয়ে ট্র্যাকে নাক ঘষছে। ডিগবাজি খেতে খেতেও খেল না, ধাম করে পেছনের চাকাদুটো নেমে এল রাস্তায়। সজোরে ব্রেক চাপল রানা, নেমে এল ঘাসে। থমকে দাঁড়াল মাজারাটি।

আচ্ছন্নের মত লাগছে রানার। চোখের কোণে রঙের ঝলকানি দেখছে—ওদেরকে পেরিয়ে বুলেটের মত চলে যাচ্ছে পেছনের গাড়িগুলো; দুর্ঘটনা নিয়ে মাথা ঘামালো না কেউ। কষ্টে-সৃষ্টে নিজের গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ও। কাঁপা কাঁপা হাতে খুলে ফেলল হেলমেট। কয়েক সেকেণ্ড লাগল ধাতস্থ হতে। এরপর দ্রোভনির খোঁজে চঞ্চল দৃষ্টি বোলাল ও। শিউরে উঠল পরক্ষণে।

বিশাল এক ওক গাছের গায়ে আছড়ে পড়েছে দ্রোভনির বিএমডব্লিউ। গাড়ি বলে চেনা যায় না আর—ভাঙাচোরা ইস্পাতের একটা তালে পরিণত হয়েছে। তার মাঝে আটকে আছে রাশান ড্রাইভার। শরীর রক্তাক্ত; মোচড়াচ্ছে তীব্র যন্ত্রণায়। বিএমডব্লিউ-র ফিউয়েল ট্যাঙ্ক ফেটে গেছে, অঝোর ধারায় নেমে আসছে তরল জ্বালানি। প্রমাদ গুনল রানা, আগুন লাগলেই সর্বনাশ, স্রেফ একটা বোমায় পরিণত হয়ে বিস্ফোরিত হবে গাড়িটা।

ছুটল রানা। দ্রোভনিকে খুন করতে আসেনি ও, তার প্রয়োজনও নেই। মর্টিমার এখন বিপদমুক্ত, তাই মনের মধ্যে জেগে উঠেছে মানবতাবোধ। দৌড়ে ধ্বংসস্তূপের পাশে পৌঁছুল ও, ঝুঁকে পড়ল দ্রোভনির দিকে। ওকে দেখতে পেয়ে এক মুহূর্তের জন্যে বিস্ময় ফুটল লোকটার চোখে, পরমুহূর্তে ফুটল আকুতি। মুখ দিয়ে আওয়াজ করতে পারছে না, চোখের ভাষায় সাহায্য চাইছে।

সিটবেল্টের ক্লিপ আটকে গেছে দ্রোভনির, বোতাম চেপে খোলা গেল না। বেল্টটা মুঠো করে ধরে সর্বশক্তিতে টান দিল রানা, গোড়া থেকে উপড়ে ফেলল লকের অংশটা। এরপর লোকটার বগলের তলায় ঢুকিয়ে দিল দু'হাত, জানালা দিয়ে তাকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে আনল গাড়ির ভেতর থেকে। দেহটা কাঁধের ওপর ফেলে টলমল পায়ে ছুটল উল্টোদিকে। কিছুদূর যেতেই বিস্ফোরিত হলো বিএমডব্লিউ। শকওয়েভের ধাক্কায় মাটিতে আছড়ে পড়ল দু'জনে।

নড়বার শক্তি পাচ্ছে না রানা। পড়ে রইল নিথরভাবে। জ্ঞান হারাবার আগে শুনতে পেল সাইরেনের তীক্ষ্ণ আওয়াজ। ছুটে আসছে অ্যাম্বুলেন্স আর ফায়ার ট্রাক। চোখ মুদল ও।

পাঁচ

পূর্ণিমার চাঁদ, কালো পানির হ্রদ আর তার মাঝে ভেসে থাকা প্রাচীন পাথুরে দুর্গ—দৃশ্যটা যেন উঠে এসেছে জার্মান ইতিহাসের পাতা থেকে। অন্তত তেমনটাই মনে হচ্ছে রানার। ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে ও, গায়ে সান্ধ্য অনুষ্ঠানের উপযোগী টাক্সিডো। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে দুর্গটার দিকে। আবাস হিসেবে পুরনো আমলের রাজা-বাদশাহ্ বা জমিদারদের জন্যে বড়ই মানানসই। অবশ্য এ-মুহূর্তে যে-মানুষটা এই দুর্গের মালিক, সে তাদের চেয়ে কোনও অংশেই কম নয়।

নিয়রবর্গ থেকে শ্লস ব্রনসার্ট আধঘণ্টার দূরত্ব। বাড মুনস্টারাইফেলের দক্ষিণে, ঘন বনভূমির মাঝখানে দুর্গটার অবস্থান। *ওয়াসারবার্গ* বা ওয়াটার-কাসল বলে এগুলোকে, জার্মানির প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এমন বহু দুর্গ। প্রাচীন আমলের ধনী লোকেরা চোর-ডাকাতের হামলা থেকে বাঁচার জন্যে এমন দুর্ভেদ্য দুর্গ বানাত। এ-মুহূর্তে রানা যেটাকে দেখছে, সেটা দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক কৃত্রিম হ্রদের মাঝে। ভেতরে যাবার জন্যে পানির ওপর দিয়ে একটা কজওয়ে তৈরি করা হয়েছে। অযাচিত শত্রুকে ঠেকাবার জন্যে মেইন এণ্ট্রান্সের সামনে রয়েছে ড্র-ব্রিজ আর লোহার গ্রিল দেয়া ভারী গেট। মূল বিল্ডিংটা তিনতলা। পুরু দেয়ালের গায়ে হাঁ করে থাকা অতিকায় সব জানালা, ছাতের ওপর

খাঁজকাটা রেলিং—সবই মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় আরেকটা কাঠামো রয়েছে প্রথমটার পাশে—নিঃসঙ্গ একটা টাওয়ার... মাথাটা গম্বুজের মত। পানির ঠিক ওপর দিয়ে, সরু একটা সেতু বানিয়ে মূল দুর্গের সঙ্গে সংযোগ ঘটানো হয়েছে ওটার। ওপরদিকে একটা কানেক্টিং করিডোরও আছে, তবে সেটা পরে বানানো—মূল নকশার সঙ্গে মানায়নি জিনিসটা। ছোট একটা জেটি দেখা গেল টাওয়ারের নিচে—স্থলপথের বদলে অতিথিরা যদি জলপথে লেক পাড়ি দিয়ে আসে, তাদের নামার জন্যে।

রেসের শেষে হোটেলে ফিরেই ইনভাইটেশন কার্ড পেয়েছিল রানা। এ-মুহূর্তে ড্রাইভওয়ের এক মাথায় দাঁড়িয়ে আছে ও, গাড়ি পার্ক করেছে পার্কিং এরিয়ার শেষ প্রান্তে। আমন্ত্রণকর্তার ইচ্ছে, দুর্গে প্রবেশের আগে আধুনিকতাকে পেছনে ফেলে আসবে অতিথিরা। তাই শেষ একশো গজ হেঁটে যেতে হচ্ছে সবাইকে। কজওয়ের দু'পাশে জ্বালানো হয়েছে মশালের সারি, ওগুলোর হলদে-কমলা শিখার প্রতিবিম্ব নাচছে কালো পানির বুকে। গেটের দু'পাশে বিশাল দুটো ব্রোঞ্জের গামলায় জ্বলছে অগ্নিকুণ্ড। খোলা দরজা দিয়ে ভেসে আসছে বাদকদলের বাজানো সঙ্গীত, সুরটা যেন উড়ছে পানির ওপর দিয়ে। বোঝা গেল, অ্যাণ্ডি লিম নাটকীয়তার ভক্ত।

ন'টা বাজে প্রায়। অতিথিরা সবাই এসে পড়েছে—পুরুষদের পরনে সান্ধ্য পোশাক; মেয়েরা নিজেদের সাজিয়েছে সিল্ক, পশমি কাপড়, আর বহুমূল্য গহনা দিয়ে। ভিড়ের পিছু পিছু রানাও এগোল। দুর্গের খোলা দরজা দিয়ে ভেসে আসা আলো, কোলাহল আর সঙ্গীত যেন চুম্বকের মত টানছে সবাইকে।

গেট আর কোর্টইয়ার্ড পেরিয়ে মূল ভবনে ঢুকল রানা। ভেতরে পা রাখতেই উর্দি-পরা বেয়ারা এগিয়ে এল, ধরিয়ে

দিল শ্যাম্পেনের গ্লাস। ওতে চুমুক দিল রানা। মর্টিমারের কথাই ঠিক—দামি শ্যাম্পেন পরিবেশন করা হচ্ছে। চুমুক দিয়েই বুঝতে পেরেছে ও কত দামি। প্রশস্ত এক হলওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে রানা, ছাতটা অনেক উঁচুতে। হলওয়ের শেষ প্রান্তে মার্বেল পাথরের সিঁড়ি, চলে গেছে ওপরতলায়। তবে ওদিকে তাকিয়েই বুঝতে পারল, অতিথিদের উপরে যাওয়া বারণ। টাক-মাথার এক পালোয়ান গোছের জার্মান প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির গোড়ায়, হাত ভাঁজ করে রেখেছে বুকের ওপর, পাহারা দিচ্ছে সিঁড়িটা। আড়ষ্ট ভাবভঙ্গি—সিঁড়ির দু'পাশে সাজিয়ে রাখা নাইটদের দুটো মানব-আকৃতির লৌহবর্মের সঙ্গে তার বিশেষ পার্থক্য নেই। হাতে তলোয়ার থাকলে পুরোপুরিই মানিয়ে যেত। মুচকি হেসে তার উদ্দেশে শ্যাম্পেনের গ্লাস তুলল রানা, লোকটার চোখের পলক পড়ল না।

বামে একটা দরজা রয়েছে, সেটা পেরিয়ে রিসেপশন রুমে পৌঁছুল রানা। এরপরেই বিশাল বলরুম—ওখানেই হচ্ছে মূল পার্টি। বাদকদল বসেছে উপরের ব্যালকনিতে। বিশাল হলঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্তত শ'দুয়েক অতিথি, তাদের মাঝে আজ সকালের রেসারদের চেনা যাচ্ছে খুব সহজে। ছোট ছোট জটলা ঘিরে রেখেছে তাদেরকে—ভক্তদের জটলা। তাদের মাঝে সুন্দরী মেয়েদের সংখ্যা দেখে অবাক হতে হয়, সবাই চেষ্টা করছে পছন্দের রেসারের মনোযোগ আকর্ষণ করতে। এক ধরনের উদগ্র কামনা লক্ষ করল রানা মেয়েগুলোর চোখে... নিয়রবর্গরিঙের রেসাররা এতটাই কাঙ্ক্ষিত তাদের কাছে! দেহ-মন উজাড় করে দিতে উন্মুখ হয়ে আছে তারা। সাবধানে ওদেরকে এড়িয়ে গেল রানা। যেসব মেয়ে না-চাইতেই সব লুটিয়ে দিতে প্রস্তুত, তাদের প্রতি আগ্রহ নেই ওর।

রেসে অংশ নেয়া দু'ডজন ড্রাইভারের সবাই হাজির

হয়েছে পার্টিতে—ইগোর দ্রোভনি ছাড়া। হাসপাতালে পড়ে আছে সে... হাত, পা আর পাঁজর মিলিয়ে অন্তত গোটাদশেক হাড় ভেঙেছে তার, অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণও হয়েছে শরীরে। সব মিলিয়ে খুবই নাজুক দশা। বেঁচে গেলেও সুস্থ হতে অনেক সময় লাগবে, তা ছাড়া আর কোনোদিন রেসিঙে নামতে পারবে না। সে-তুলনায় রানার কিছুই হয়নি। ছোটখাট কয়েকটা আঘাত লেগেছে শরীরে, কোনোটাই গুরুতর নয়। ফার্স্ট এইড দিয়ে ওকে ছেড়ে দিয়েছে ডাক্তার। ঘটনার তদন্ত করেছে রেসের কমিটি, এরিয়াল ভিডিও-র ফুটেজ দেখেছে, তারপর রায় দিয়েছে—ব্যাপারটা দুর্ঘটনা... দ্রোভনির ভুলের কারণে ঘটেছে। মোড় নেবার সময় রানাকে বেপরোয়াভাবে বাধা দিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল, আর সেজন্যেই সংঘর্ষ হয়েছে গাড়িদুটোর। ব্যাখ্যাটা মেনে নিয়েছে সবাই, ফলে সহানুভূতির পাল্লা দ্রোভনির পরিবর্তে রানার দিকে ঝুঁকে গেছে—আরেকজনের ভুলের কারণে ও রেসটা শেষ করতে পারল না বলে। ওরা তো আর জানে না, রেসের জন্যে আসেনি মাসুদ রানা। যে-কাজে এসেছিল, সেটা সফল হয়েছে পুরোপুরি। দ্রোভনিকে ঠেকিয়ে দেয়ায় অনায়াসে রেস জিতেছে মর্টিমার—জুকভকে পাক্কা দশ সেকেণ্ড পেছনে ফেলে। অ্যাণ্ডি লিমকেও মোক্ষম একটা খোঁচা দেয়া গেছে। এখন লোকটা কী করে, সেটাই দেখার বিষয়।

ভিড়ের মাঝে ঢেউ ওঠায় ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা—অ্যাণ্ডি লিম উদয় হয়েছে বলরুমে। সবাই সরে গিয়ে হাঁটার রাস্তা করে দিচ্ছে তাকে। গর্বিত সম্রাটের ভঙ্গিতে হাঁটছে লিম, ঠোঁটে মৃদু হাসি, মাঝে মাঝে নড করছে অতিথিদের উদ্দেশে। সতর্ক প্রহরীর মত তার সামনে রয়েছে একজন দেহরক্ষী। কোটের তলায় আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে লোকটার, ফুলে আছে বগলের তলা। লিমকে আজ আরও আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে, হয়তো বা নিয়রবর্গের পানশালার

বদলে নিজের দুর্গে দাঁড়িয়ে আছে বলেই—ক্ষমতার অদৃশ্য দ্যুতিটা প্রখর হয়েছে আরও। অতিথিদের সৌজন্য দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু একই সঙ্গে চোখের দৃষ্টি দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে, কাউকেই নিজের সমকক্ষ ভাবছে না সে।

হঠাৎ রানার ওপর চোখ পড়ল তার, সঙ্গে সঙ্গে দিক বদলে চলে এল ওর কাছে। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আপনি তো বোধহয় মি. মাসুদ রানা? আমি অ্যাণ্ডি লিম।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' হাত মেলাল রানা। 'নাইস পার্টি... আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বলে ধন্যবাদ।' ঘাড়ের কাছটা শিরশির করছে ওর। দীর্ঘদিন বিপজ্জনক পেশায় থাকায় ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ—আগে থেকেই বিপদের আভাস পায়। সেই ইন্দ্রিয় এখন তারস্বরে চিৎকার করছে—এ-লোকের থেকে সাবধান!

'মাই প্লেযার,' বলল লিম। 'আজ আপনার ড্রাইভিং দেখেছি আমি, যদিও খুব অল্প সময়ের জন্যে। আপনিই তো বোধহয় অ্যাকসিডেন্ট করেছেন আমার টিমের একটা কারের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যজনক,' নীরস গলায় বলল রানা। 'তবে আপনার ড্রাইভারের ভুলেই ঘটেছে দুর্ঘটনাটা। রেসের কমিটি তদন্ত করে দেখেছে।'

'ব্যাপারটা খুব অস্বাভাবিক, বুঝলেন? ইগোর দ্রোভনি খুবই অভিজ্ঞ ড্রাইভার, ওর এমন ভুল হবার কথা নয়।'

'তা হলে কি ধরে নেব, দু'বছর আগে ইচ্ছে করে আরেক গাড়িকে ধাক্কা দিয়েছিল সে?'

এক মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল লিম। তারপর হাসল শব্দ করে। 'আপনার জিভ খুব ধারাল, মি. রানা। বাদ দিন দ্রোভনির কথা। নিজের কথা বলুন। কতদিন থেকে রেস করছেন? আপনাকে তো আমি আগে কোনও কম্পিটিশনে দেখিনি।'

‘কারণ আজকেই প্রথম কম্পিটিশনে নামলাম,’ রানা জানাল। ‘তবে প্রথম রেসেই যে-অভিজ্ঞতা হলো, ভবিষ্যতে আর নামব কি না, সন্দেহ আছে। আপনার ড্রাইভারের জন্যে সহানুভূতি রইল। আশা করি শীঘ্রি সেরে উঠবে সে।’

‘মনে হয় না। ইনজুরিগুলো সিরিয়াস, সারতে সময় লাগবে। মরেও যেতে পারত, যদি না আপনি তাকে গাড়ি থেকে বের করে আনতেন। সেজন্যে একটা ধন্যবাদ পাওনা হয়েছে আপনার।’

‘আরে না, কী যে বলেন!’ বলল রানা। ‘ওটা তো আমার কর্তব্য ছিল। চোখের সামনে একজন মানুষকে মরতে দিই কী করে? সবাই অবশ্য ওভাবে চিন্তা করে না। সামান্য একটা রেস জেতার জন্যে খুনখারাপিতে জড়াতে দ্বিধা করে না তারা।’ শেষ কথাটা খোঁচা দেবার জন্যে বলা। ‘আপনার জন্যে সমবেদনা রইল।’

‘মানে?’ চোয়াল শক্ত হলো লিমের।

‘দু-দু’জন ড্রাইভার নামিয়েও রেস জিততে পারলেন না কিনা, তাই। ব্যাড লাক, মি. লিম।’

শীতল চোখে ওকে একটু জরিপ করল লিম। বুঝে নিতে চাইছে কথাটার মর্মার্থ। খানিক পর বলল, ‘রেসের প্রসঙ্গ থাক। আমার দুর্গটা আপনার কেমন লাগছে, মি. রানা?’

‘ইম্প্রেসিভ,’ বলল রানা। ‘অস্বীকার করব না।’

প্রশংসায় খুশি হলো লিম। গর্বের সুরে বলল, ‘দুনিয়ার আনাচে-কানাচে এমন অনেক স্থাপনা আছে আমার। অতিথি আপ্যায়নের কাজে লাগে। তবে এটার প্রতি আলাদা একটু দুর্বলতা আছে আমার... হয়তো বা নিয়রবর্গের এতটা কাছে বলেই। কার রেসিং আমার প্যাশন।’

‘আমি শুনেছি।’

‘এই শ্লস ব্রনসার্ট দুর্গ তৈরি করেছিল ভন শ্লেইডেন পরিবার। নিয়রবর্গের দুর্গটাও ওদের বানানো। ইয়োরোপে

এলে আমি সাধারণত এখানেই উঠি... এখান থেকেই ব্যবসা সামলাই।'

'কবে থেকে থাকছেন এখানে?'

'বছরদশেক তো হবেই। পুরনো মালিক ডুবে মারা যাবার পর তার পরিবারের কাছ থেকে কিনেছিলাম। মজার ব্যাপার কী, জানেন? বেঁচে থাকতে লোকটা আমার কাছে এই দুর্গ বিক্রি করতে চায়নি।'

'এরপরেই সে পানিতে ডুবে মরল?' থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করল রানা।

'লেকটা খুবই গভীর, মি. রানা... পানিও খুব ঠাণ্ডা,' অর্থপূর্ণ স্বরে বলল লিম। 'আমার কী করার আছে, বলুন? আপনিও একটু সাবধানে থাকবেন... মানে, পার্টি শেষে ফেরার সময়। বলা তো যায় না, পা ফসকে যদি পানিতে পড়ে যান?'

হুমকিটা বুঝতে অসুবিধে হলো না। রানা একগাল হেসে বলল, 'ভয় পাবেন না, আমি খুব ভাল সাঁতারু। সাঁতার কেটে ঠিক উঠে আসব।'

একদৃষ্টে ওর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল লিম। তারপর বলল, 'হ্যাভ আ প্লেয্যাণ্ট ইভ্নিং।' ঘুরে চলে গেল সে। হারিয়ে গেল ভিড়ের আড়ালে।

শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে ভাবনায় ডুবে গেল রানা। হুমকি নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে না, ভাবছে লিমের বলা অন্য একটা কথা নিয়ে। ইয়োরোপে এলে এই দুর্গে ওঠে সে, এখানে বসে ব্যবসা পরিচালনা করে। তারমানে ভেতরে কোথাও একটা অফিস আছে নিশ্চয়ই। আর অফিস মানেই ফাইল, চিঠি, মেমো, কম্পিউটার... সোজা কথায় নানা ধরনের তথ্যের ভাণ্ডার। একবার ঢুঁ মারতে পারলে মন্দ হয় না। কিন্তু কোথায় সেই অফিস? অনুমান করার চেষ্টা করল। যতটুকু দেখেছে, তাতে নিচতলার পুরোটাই আনুষ্ঠানিকতার

জন্যে বরাদ্দ বলে মনে হয়েছে। এখন পর্যন্ত হলওয়ে, রিসেপশন রুম আর বলরুম চোখে পড়েছে ওর। লাউঞ্জ, ডাইনিং হল, কিচেন, আর স্টোরেজ এরিয়াও থাকার কথা। এর অর্থ, আবাসিক অংশটা ওপরতলায়। ওখানেই কোথাও পাওয়া যাবে লিমের ব্যক্তিগত অফিস।

ট্যাঙ্গো মিউজিক ধরেছে বাদকেরা। জোড়ায় জোড়ায় বেশ কিছু জুটি নেমে পড়েছে নাচে। মর্টিমারকে সুন্দরী নারী পরিবেষ্টিত অবস্থায় এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। চোখাচোখি হতেই হাত নাড়ল সে। রানা নড করল, তবে কাছে গিয়ে কথা বলল না। রেসের পরেও দেখা করেনি। মর্টিমারকে ওর সঙ্গে জড়াতে চায় না। লিম যদি প্রতিশোধ নিতে চায় তো ওর একার ওপর হামলা করুক।

শ্যাম্পেনের গ্লাস হাতে হলওয়েতে বেরিয়ে এল রানা। সিঁড়ির গোড়ায় পাহারাদারটি রয়েছে আগের মতই। কী করবে ভাবছিল, এমন সময় বলরুম থেকে আরেকজন বেরিয়ে এল ওর পিছু পিছু। সুন্দরী এক তরুণী। লাল রঙের একটা সিল্কের ড্রেসে ঝলমল করছে মেয়েটা। ড্রেসের নিচের অংশ হাঁটু পর্যন্ত ঢেকেছে, পুরো কাঁধ আর পিঠের খানিকটা ঢাকেনি, শরীরের সঙ্গে ওটাকে আটকে রেখেছে গলায় জড়ানো সরু এক স্ট্র্যাপ। পিঠের ওপর নেমে এসেছে ঘন বাদামি চুল। অলঙ্কার বলতে কোমরে পেঁচানো সরু একটা সোনার চেন আর একটা সোনার কাফ নেকলেস। সুঠাম পা-জোড়া অনাবৃত, খোলা লাল জুতোর ভেতর দেখা যাচ্ছে পায়ের পাতা। এক দেখাতেই রানা বুঝল, এ মেয়ে রেসারদের সঙ্গে মাখামাখির জন্যে আসেনি। হাবভাবে আত্মসম্মানী বলে মনে হচ্ছে তাকে, নীল চোখদুটোয় খেলা করছে বুদ্ধির দীপ্তি।

রানাকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল মেয়েটা। কাছে যেতেই তার পথরোধ করল প্রহরী।

'এক্সকিউজ মি,' বলল মেয়েটি। 'আমাকে একটু উপরে যেতে দিন।' আমেরিকান উচ্চারণে কথা বলছে।

'দুঃখিত, ফ্রাউলাইন,' ভারী গলায় বলল গার্ড, 'ওপরতলাটা প্রাইভেট এরিয়া। ওখানে যাওয়া বারণ।'

'কিন্তু আমার যে মাথা ধরেছে! কোথাও গিয়ে একটু শুয়ে থাকতে পারলে ভাল হতো। একটা গেস্টরুম কি কিছুক্ষণের জন্যে ব্যবহার করতে পারি না?'

'মাফ করবেন, ফ্রাউলাইন। আমি নিরুপায়।'

'একটু দেখুন না! আপনি চাইলেই পারবেন।'

'দুঃখিত। আপনি ফিরে যান।' গার্ড অনড়।

হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল মেয়েটা। উল্টো ঘুরে হন হন করে ফিরে চলল বলরুমে। দরজার সামনে আসতেই ধাক্কা খাবার উপক্রম হলো রানার সঙ্গে।

'পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?' বিরক্তি ফুটল মেয়েটার গলায়।

'আমার ফুপু বলতেন, আদা খেলে নাকি মাথাব্যথা সেরে যায়,' রানা বলল।

'এখানে আদা পাব কোথায়?'

'তা হলে মাথা মালিশ করে দিতে পারি। দেব?' হাসল রানা। 'হাই! আমি মাসুদ রানা।'

'জানি,' বিরস গলায় বলল মেয়েটা। 'আপনি তো আজ ক্র্যাশ করেছেন ট্র্যাকে। হাসপাতালে যাননি কি এখানে এসে মেয়ে পটাবেন বলে?'

'ওরেব্বাপরে!' আঁতকে ওঠার ভান করল রানা। 'এখানেই ক্ষান্ত দিচ্ছি। আপনি তো ডেঞ্জারাস মেয়ে!'

'পথ ছাড়ুন।'

ছাড়ল না রানা। জিজ্ঞেস করল, 'রেসের কতটুকু দেখেছেন আপনি?'

'পুরোটাই। আমি জার্নালিস্ট। আমাকে পাঠানোই হয়েছে

ইয়োরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ কাভার করার জন্যে।'

'কোন্ পত্রিকা থেকে?'

'মোটরস্পোর্ট।'

মেয়েটিকে ভাল করে দেখল রানা। জার্নালিস্ট বলেই বোধহয় এত স্মার্ট। হালকা গলায় বলল, 'আজকের অ্যাকসিডেন্টের ব্যাপারে যদি রিপোর্ট করেন তো আমার দিকটা একটু সহানুভূতির সঙ্গে লিখবেন। ওই দ্রোভনির কারণে আমার রেসটা মাটি হলো। আসলে... চালানোর জন্যে পোর্শা গাড়ি নেয়াই উচিত হয়নি লোকটার। ওগুলো খুবই আনরিলায়্যাবল।'

'আপনার বিষয়ে আমার কিছুই লেখার আগ্রহ নেই, মি. রানা,' ঠাণ্ডা গলায় বলল মেয়েটা। 'আমার পাঠকেরা শুধু বিজয়ীদের খবর জানতে চায়।'

গটমট করে চলে গেল সে। পিছন থেকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল রানা। আর যা-ই হোক, এ-মেয়ে যে জার্নালিস্ট নয়, তা পরিষ্কার। পোর্শা নয়, বিএমডব্লিউ চালাচ্ছিল দ্রোভনি—সেটাই জানে না। এত বড় একটা রেস যাকে কাভার করতে পাঠানো হয়েছে, সে এতটা অজ্ঞ হতে পারে না। কে এই মেয়ে?

খানিক পরে আনমনে মাথা নাড়ল রানা। মেয়েটাকে নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, পরে খোঁজখবর নেয়া যাবে। আপাতত হাতের কাজের দিকে মনোযোগ দেয়া যাক। দুর্গের ওপরতলায় পৌঁছুতে হবে ওকে।

ছয়

উপরে যাবার একটাই সিঁড়ি দেখতে পাচ্ছে রানা। আরও সিঁড়ি থাকতে পারে, কিন্তু সন্দেহ নেই, সবগুলোতেই পাহারা বসিয়েছে অ্যাণ্ডি লিম। লুকাবার মত অনেক কিছুই আছে তার।

কোর্টইয়ার্ডে বেরিয়ে এল ও। খুঁটিয়ে দেখল দুর্গের দেয়াল। আইভি লতাঝাড় আছে, তবে ওর ওজন নিতে পারবে না। তা ছাড়া ওপরদিককার সবক'টা জানালা বন্ধ—দেয়াল বেয়ে উঠতে পারলেও জানালা গলে ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয়। লেকের পানিতে নজর গেল ওর—চাঁদের আলোয় সেখানে ফুটে উঠেছে নিঃসঙ্গ টাওয়ারের প্রতিবিম্ব। টাওয়ার থেকে সেতু আর কানেক্টিং করিডোরের মাধ্যমে যোগাযোগ আছে দুর্গের, কিন্তু তার জন্যে টাওয়ারে ঢুকতে হবে প্রথমে। সে-সুযোগ নেই। তাড়া অনুভব করল রানা, যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। রাত হয়েছে বেশ, পার্টি শেষ হলেই বেরিয়ে আসবে অতিথিরা, লিমও ফিরে যাবে ওপরতলায়। তার আগেই কাজ সারতে হবে ওকে।

দরজায় নড়াচড়া লক্ষ করে ঘাড় ফেরাল রানা, তাড়াতাড়ি শরীর মিশিয়ে দিল দেয়ালের গোড়ার ছায়ায়। আরেকজন মানুষ বেরিয়ে এসেছে কোর্টইয়ার্ডে। ভাল করে তাকাতেই চিনতে পারল তাকে। লিমের সঙ্গে ছিল এই লোক—তার দেহরক্ষী। কেন বেরিয়ে এসেছে, তাও বোঝা

গেল—সিগারেটের নেশা। ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি ফুটল রানার। বুঝে গেছে কী করতে হবে।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল লিমের দেহরক্ষী। একটা স্টিক গুঁজল ঠোঁটে। এরপর প্যাকেট রেখে পকেট থেকে রূপালি রঙের একটা লাইটার বের করল। সিগারেট ধরাল। বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার দেহে, ছায়া থেকে চিতাবাঘের মত ক্ষিপ্রতায় বেরিয়ে এল ও, চোখের পলকে পৌঁছে গেল লোকটার পেছনে। কৌশল ঠিক করে ফেলেছে আগেই। চলন্ত অবস্থাতেই হাত মুঠো করে ঘুষি ছুঁড়ল ও, আঘাত হানল প্রতিপক্ষের কিডনিতে।

হুঁক করে একটা আওয়াজ করল দেহরক্ষী, ঠোঁট থেকে সিগারেট খসে পড়ল তার, এলিয়ে পড়ল পিছনদিকে। পরক্ষণে সাপের মত ছোবল দিল রানার হাত—পেঁচিয়ে ধরল তাকে। কনুইয়ের ভাঁজে আটকা পড়ল লোকটার গলা। ধস্তাধস্তির সুযোগ পেল না লোকটা, কণ্ঠার ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ায় জ্ঞান হারাল। শ্বাসনালী বন্ধ হয়ে গেছে। এভাবে কিছুক্ষণ ধরে রাখলে বাতাসের অভাবে নির্ঘাত মারা যাবে সে। চাইলে চাপ বাড়িয়ে রানা তার ঘাড়টাও মটকে দিতে পারে। কিন্তু তাকে খুন করতে চায় না ও, চায় শুধু অজ্ঞান করতে। নিশ্চিত হবার জন্যে বাড়তি কয়েক সেকেণ্ড ওভাবে লোকটাকে ধরে রাখল, তারপর সাবধানে নিথর দেহটা শুইয়ে দিল মাটিতে।

রুমাল বের করে মুখ মুছল রানা, এরপর অজ্ঞান দেহরক্ষীকে তুলে নিল পাঁজাকোলা করে। তাকে নিয়ে ঢুকে পড়ল হলওয়েতে।

'জলদি ডাক্তার ডাকুন!' সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা গার্ডকে লক্ষ্য করে চেঁচাল ও। 'এই ভদ্রলোক হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন।'

অজ্ঞান দেহরক্ষীকে চিনতে পেরেছে গার্ড, তারপরেও

দ্বিধা দেখা গেল তার মাঝে—পোস্ট ছেড়ে নড়া ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছে না।

'কী হলো? ডাক্তার নেই?' আবারও চেঁচাল রানা। 'গেস্টদের জিজ্ঞেস করে দেখুন, নিশ্চয়ই কোনও ডাক্তার পাবেন ওদের মাঝে।'

এবার দ্বিধা ঝেড়ে ফেলল গার্ড, ছুট লাগিয়ে ঢুকে পড়ল বলরুমে। অজ্ঞান দেহটা কার্পেটের ওপর নামিয়ে রাখল রানা, সরে এল একপাশে। যা ভেবেছে তা-ই ঘটল, কয়েক সেকেণ্ড পরেই হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল অতিথিরা—কী ঘটেছে দেখতে চায়। হলওয়ে ভরে গেল মানুষে। ডাক্তার গোছের বয়স্ক এক ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে পড়লেন অজ্ঞান দেহরক্ষীকে নিয়ে।

পায়ে পায়ে ভিড় থেকে সরে এসেছে রানা। আড়চোখে সিঁড়ির দিকে তাকাল—একদম উন্মুক্ত। গার্ড এখনও তার পজিশনে ফিরতে পারেনি। এ-ই সুযোগ। ছুট লাগিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় চলে গেল ও, এরপর দ্রুত পায়ে একেকটা ধাপ পেরিয়ে উঠে গেল উপরে।

নিচতলার মত দোতলাও জমকালোভাবে সাজানো। সিঁড়ি দিয়ে উঠলেই একটা খোলা ওয়েইটিং এরিয়া—বসার জন্যে কয়েক সেট সোফা রাখা হয়েছে। ওয়েইটিং এরিয়ার দু'দিকে চলে গেছে দুটো প্যাসেজ। প্যাসেজের দু'পাশে সারি সারি দরজা। যদ্দূর দেখা যায়, ছাত থেকে শুরু করে দেয়াল পর্যন্ত সবই মেহগনি কাঠের প্যানেলিং করা; তাও যে সে প্যানেল নয়—রীতিমত জটিল নকশাকাটা... অদ্ভুত সুন্দর! মেঝে ঢাকা পড়ে আছে ঘন, নিপুণ বুনটে গাঁথা ইরানী কার্পেটে। চারপাশের দেয়ালের শোভা বর্ধন করছে নানান রকম জিনিস। প্রথমেই চোখে পড়ে হান্টিং ট্রফি—নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর ঝুলছে বিভিন্ন পশুর মাথা। হরিণ আছে, বাঘ আছে... গণ্ডারের মাথাটা এমনভাবে বসানো, হঠাৎ দেখায় মনে হয়

ওপাশ থেকে কাঠের প্যানেল ভেদ করে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে ওটা। এ ছাড়াও হরেক আকারের ফ্রেমে ঝুলছে দামি তৈলচিত্র। ঝুলছে দেশ-বিদেশের মুখোশ। নিচে শোভা পাচ্ছে বড় বড় বেশ কিছু ডিসপ্লে-কেস; সেখানে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিক।

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই একটা সোফার পেছনে আশ্রয় নিয়েছে রানা, উঁকি দিয়ে দেখে নিচ্ছে আশপাশ। দোতলায় কোনও প্রহরী থাকলে তার হাতে ধরা পড়তে চায় না। তবে কয়েক মিনিট কেটে গেলেও কারও দেখা পাওয়া গেল না। সম্ভবত পার্টি উপলক্ষে সবাইকে নিচতলার নিরাপত্তায় পাঠিয়েছে লিম। নিশ্চিন্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, এবার লিমের অফিস খুঁজে পাবার পালা। একদিকের প্যাসেজ অন্ধকার করে রাখা হয়েছে, ওদিকটা মনে হলো ব্যবহার হয় না। অন্যদিকের আলোকিত প্যাসেজ ধরে এগোল ও। পথে হাতল ঘোরাচ্ছে সবক'টা দরজার। কোনোটাতেই তালা দেয়া নেই, নিজের সিকিউরিটি টিমের ওপর বোধহয় একটু বেশিই আস্থা রাখে কোরিয়ান টাইকুন। বিভিন্ন ধরনের কামরা পেল রানা দরজাগুলোর পেছনে—বেশিরভাগই বেডরুম... এ ছাড়া আছে ডাইনিং স্পেস, প্রমাণ সাইজের ক্লজিট আর লাইব্রেরি। বেডরুমগুলো পরিপাটি করে সাজানো, কেউ থাকে না ওগুলোয়। যেটায় লিম থাকে, সেটা চেনা গেল সহজে—তার ব্যবহার্য জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। কিন্তু অফিস কোথায়?

প্যাসেজের শেষ মাথায় চলে এল রানা। দুই পাল্লার বড় একটা দরজা শোভা পাচ্ছে ওখানে। এই একটা দরজাতেই শুধু তালা দেয়া। হাতল ঘুরিয়ে খোলা গেল না। হতাশ হলো না রানা, এ-ধরনের পরিস্থিতির জন্যে তৈরি হয়েই এসেছে ও। পকেট হাতড়ে বের করে আনল একটা পাউচ—লক-পিকিং টুল রয়েছে ওতে। টরশন রেঞ্চ আর ডায়মণ্ড পিক

নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। খানিক পরেই খুট করে শব্দ হলো... তালা খুলে গেছে। পাউচটা পকেটে চালান করে উঠে দাঁড়াল ও। হাতল ঘুরিয়ে নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল দরজার ফাঁক গলে।

ওপাশে বড়-সড় একটা কামরা। দুর্গের ঠিক সামনের দিকে ওটা, জানালা দিয়ে তাকালে চোখে পড়ে কজওয়ে আর কার পার্ক। ভেতরে কোনও আলো জ্বলছে না, তবে তার প্রয়োজনও নেই। পর্দা সরিয়ে রাখা হয়েছে জানালার, সেখান দিয়ে ভেতরে ঢুকছে পূর্ণিমার উজ্জ্বল আলো। কামরার মাঝখানে রয়েছে একটা মেহগনি কাঠের বড় ডেস্ক। তার পেছনে গদিমোড়া চেয়ার। ডেস্কের ওপর ছড়িয়ে আছে বেশ কিছু ফাইল আর কাগজপত্র। এক পাশে টেলিফোন সেট আর একটা ডেস্কটপ কম্পিউটার রাখা হয়েছে। সন্দেহ নেই, অ্যাণ্ডি লিমের প্রাইভেট অফিসে পৌঁছে গেছে রানা।

মেঝেতে বিছিয়ে রাখা একটা বড় কার্পেটের ওপর নজর গেল ওর। জিনিসটা বেমানান—পুরো কামরা এমনিতেই কার্পেটে মোড়া, তার উপরে আলাদাভাবে বসানো হয়েছে ওটা। কেন? কপালে ভাঁজ পড়ল রানার। দরজা ভেজিয়ে সাবধানে এগোল কার্পেটটার দিকে। পা দিল না ওটায়, বরং কিনার ঘেঁষে ঘুরে ঘুরে দেখতে শুরু করল। একটু পরেই ধরতে পারল রহস্যটা। কার্পেটের তলা থেকে একটা সরু তার বেরিয়ে এসেছে... ডেস্ক আর চেয়ারের নিচ দিয়ে চলে গেছে দেয়াল পর্যন্ত, এরপর ঢুকে পড়েছে কাঠের প্যানেলের ভেতরে। দরজার দিক থেকে তারটা দেখতে পাবার কোনও উপায় নেই। কার্পেটের নিচে প্রেশার অ্যালার্ম জাতীয় কিছু আছে, অনুমান করল রানা, পা পড়লেই বেজে উঠবে। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর জন্যে ফাঁদ... দরজা দিয়ে ঢুকে সরাসরি ডেস্কের দিকে এগোলেই পা পড়বে সেই ফাঁদে।

ঘুরে ডেস্কের পেছনে চলে গেল রানা, এরপর বসল লিমের চেয়ারে। ছড়িয়ে থাকা ফাইল আর কাগজপত্র ঘাঁটতে

শুরু করল। সবই কোরিয়ান ভাষায় লেখা। ছবি তুলে নিয়ে যেতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু স্পেশাল কোনও ক্যামেরা আনেনি ও। পকেটে অবশ্য সেলফোন আছে, তবে সেটার ক্যামেরা এই স্বল্প আলোয় ছবি তোলার উপযোগী নয়। কামরার আলো জ্বালবারও সাহস পাচ্ছে না, বাইরে থেকে দেখা যাবে। অগত্যা এলোমেলোভাবে কয়েকটা কাগজ তুলে পকেটে ভরল। বলা যায় না, অনুবাদ করার পর জরুরি কিছু বেরিয়েও আসতে পারে।

কাগজ দেখার পর কম্পিউটারে হাত দিল রানা, কিন্তু ওটা পাসওয়ার্ড চাইছে। কাজেই কম্পিউটার বাদ। ডেস্কের ড্রয়ার খুলল ও। মোটাসোটা একটা খাম মিলল সেখানে। খামটা ডেস্কের উপরে রেখে মুখ খুলল ও। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল অনেকগুলো ফটোগ্রাফ। প্রথমটার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে গেল ওর—এ-ছবি লিমের কাছে কেন? মিসাইলের মত দেখাচ্ছে... কিন্তু ভাল করে দেখতেই বুঝল, না, মিসাইল নয়; ছবিটা আসলে একটা স্পেস-রকেটের, যেগুলো মহাশূন্যে পাঠানো হয়। পরের কয়েকটা ছবিও ওই একই রকেটের—বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে তোলা। প্রি-লঞ্চ ফটো বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু কোথাকার? আশপাশের দৃশ্য দেখে বোঝা গেল না। পর পর আরও কয়েকটা ছবি দেখল ও। তাড়া অনুভব করছে। লিমের দেহরক্ষীর জ্ঞান ফিরলেই সবাই জেনে যাবে কী ঘটেছিল। তখন রানাকে খুঁজতে বেরুবে ওরা।

একটা ছবিতে কভারঅল পরা কয়েকজন মানুষকে দেখা গেল—ট্রলি ঠেলছে, তাতে রকেটের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ। কভারঅলের পিঠে গুটি গুটি হরফে কিছু লেখা। শব্দগুলো পড়া না গেলেও ভাষাটা অনুমান করা গেল। ইংরেজি। তারমানে কি রকেটটা আমেরিকান? আরেকটা ফটো দেখল রানা; এবার নিশ্চিত হলো, আমেরিকানই বটে। আমেরিকার

একটা পতাকা উড়তে দেখা যাচ্ছে ছবির এক কোণে। বিভ্রান্ত বোধ করল ও—আমেরিকান স্পেস-রকেটের প্রতি লিমের আগ্রহ কী কারণে? পরের ছবিটায় চোখ বোলাতেই খটকা লাগল—কী যেন একটা অসঙ্গতি আছে ওতে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল আবার।

ছবিটা একটা অসমাপ্ত রকেটের... বোধহয় প্রথমে যেটা দেখেছে, সেটারই নির্মাণাধীন অবস্থার ছবি। হ্যাঙার বা ওয়্যারহাউসের মত একটা জায়গায় রাখা হয়েছে ওটার নোজ কোন আর মেটাল হাউসিং—জোড়া দেয়া হচ্ছে। এ-পর্যন্ত সব ঠিক আছে, কিন্তু রানার সন্দেহ জাগিয়েছে খানিক দূরে অ্যাপ্রন পরে দাঁড়িয়ে থাকা তিনজন মানুষ। তাদের হাতে ক্লিপবোর্ড; হাবভাবে মনে হচ্ছে, তদারক করছে কাজের। প্রথম দেখায় চাইনিজ মনে হলো; ভালমত দেখতেই বুঝল, না, চাইনিজ নয়, তিনজনই কোরিয়ান। চেহারার বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্ট। আমেরিকান একটা রকেট তৈরির কাজ কোরিয়ানরা সুপারভাইজ করবে কেন? অন্তত একজন হলেও তো আমেরিকান সুপারভাইজর থাকবে!

দ্রুত বাকি ছবিগুলোও দেখল রানা। শেষ ছবিটায় সময় দিল খানিকটা। লঞ্চপ্যাডে দাঁড়ানো অবস্থায় রকেটটাকে দেখা যাচ্ছে ওতে—সাগরে ভাসমান কোনও বোট থেকে তোলা হয়েছে ছবিটা। কোস্টলাইন দেখতে পাচ্ছে ও, ঢেউ আছড়ে পড়ছে সৈকতে। বিক্ষিপ্ত কিছু সাদা বিল্ডিংও দেখা যাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে ঝোপঝাড়। সমুদ্র দু'দিক থেকে ঘিরে রেখেছে ডাঙাকে। তারমানে ওটা একটা দ্বীপ। আমেরিকার কোন্ দ্বীপে এ-ধরনের লঞ্চসাইট আছে, ভাবার চেষ্টা করল ও। কিন্তু জবাবটা মনে পড়ার আগেই শব্দ ভেসে এল দরজার দিক থেকে—কেউ হাতল ঘোরাচ্ছে!

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। লুকানোর মত একটাই জায়গা দেখতে পেল, পিছিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল পর্দার

আড়ালে। পরক্ষণে শোনা গেল দরজা খোলা আর বন্ধ হবার আওয়াজ। কেউ একজন ঢুকেছে কামরায়!

পর্দার কিনার দিয়ে সাবধানে উঁকি দিল রানা। লিম বা তার কোনও সাগরেদকে আশা করেছিল, কিন্তু দেখতে পেল নিচতলার লাল পোশাক পরা সেই মেয়েটিকে। ভুয়া জার্নালিস্ট এবার তার সত্যিকার রূপ নিয়ে হাজির হয়েছে। আলো জ্বালল না সে, চুপচাপ কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে নিশ্চিত হলো, পিছু নিয়ে আর কেউ আসছে কি না। এরপর এগিয়ে এল ডেস্কের দিকে। ছড়িয়ে থাকা ছবি, ফাইল আর কাগজপত্র হাতাতে শুরু করল।

একদৃষ্টে তাকে দেখছিল রানা, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় আঁতকে উঠল। মেয়েটা সরাসরি এগিয়েছে ডেস্কের দিকে... ঠিক প্রেশার প্যাডের ওপর দিয়ে। তারমানে বাড়ির ভেতরে কোথাও অ্যালার্ম বেজে উঠেছে, এক্ষুণি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছুটে আসবে লিমের নিরাপত্তারক্ষীরা!

লুকোচুরির সময় নেই, পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এল রানা। ওকে দেখে চমকে গেল মেয়েটা। স্থবির হয়ে গেল মুহূর্তের জন্যে। তারপরেই খেপা গলায় বলল, 'তুমি এখানে কী করছ?' উত্তেজনায় সম্বোধন পাল্টে ফেলেছে।

'একই প্রশ্ন আমারও,' বলল রানা, 'তবে এখন খোশগল্পের সময় নেই। অ্যালার্ম বাজিয়ে দিয়েছ তুমি।'

'কোথায় অ্যালার্ম?' বোকার মত ইতি-উতি তাকাল মেয়েটা।

'তোমার পায়ের তলায়। জলদি এসো... কথাবার্তা পরে বলা যাবে।'

ছোঁ মেরে টেবিল থেকে কয়েকটা ছবি তুলে নিল রানা, ঢুকিয়ে ফেলল কোটের ভেতরের পকেটে। এখন আর নিজের উপস্থিতি লুকানোর প্রয়োজন নেই, মেয়েটা সব ভণ্ডুল করে দিয়েছে। লিম জেনে যাবে, রানা তার অফিসে হানা

দিয়েছিল। কাজেই কয়েকটা ছবি নিয়ে যাওয়া যাক।

পালাতে হবে, বুঝতে পারছে রানা—আর কোনও বিকল্প নেই। মেয়েটার হাত ধরে টান দিল ও, দরজা খুলে বেরিয়ে এল লিমের অফিস থেকে। করিডোরে কেউ নেই, তবে দূর থেকে ভেসে আসছে হাঁকডাকের আওয়াজ। লিমের লোকেরা সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে উপরে।

'এদিকে!' পাশের আরেকটা প্যাসেজ ধরে দৌড়াতে শুরু করল রানা। মেয়েটার হাত ছাড়েনি। সৌভাগ্যক্রমে সে প্রতিবাদ করছে না—বোধহয় নিজের উপরেই ক্ষিপ্ত, ওভাবে অ্যালার্মের ফাঁদে পা দিয়েছে বলে।

দৌড়াতে দৌড়াতে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে রানা। নিঃসন্দেহে দুর্গ থেকে বেরুবার রাস্তা বন্ধ করে দেবে লিম—সেটা খুব সহজ, কজওয়েটা আটকে দিলেই, ব্যস। সমস্ত দরজা, সিঁড়ি আর বাইরের আঙিনায় বসানো হবে গার্ড। অতিথিদের মাঝে ওরা যেন মিশে যেতে না পারে, সেটাও নিশ্চিত করবে। পৌঁছুতেই দেবে না বলরুমে। অনুপ্রবেশকারীরা যতক্ষণ না ধরা পড়ছে, অতিথিদেরও বেরুতে দেবে না বাইরে। আশাবাদী হবার মত কিছু চোখে পড়ছে না।

প্যাসেজ ধরে ছুটে চলেছে দু'জনে, পেরিয়ে আসছে দেয়ালে ঝোলানো তৈলচিত্র আর বন্ধ দরজার সারি। একটা মোড়ে এসে পৌঁছুল—প্যাসেজ ওখানে দু'ভাগ হয়ে ডানে-বাঁয়ে চলে গেছে। পেছনে জার্মান ভাষায় কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠল—সশব্দে খোলা হলো দরজা। লিমের অফিসে পৌঁছে গেছে গার্ডেরা। ওখানে কাউকে না পেয়ে নিঃসন্দেহে ছড়িয়ে পড়বে তারা। মোড়ে পৌঁছে এক মুহূর্তের জন্যে থেমেছিল রানা, এবার বাঁয়ে ঘুরে আবারও ছুটতে শুরু করল। মেয়েটাও তাল মিলিয়ে অনুসরণ করছে ওকে। হাই হিল পরে দৌড়ানো যায় না, তাই খুলে ফেলেছে জুতোজোড়া। চপল

হরিণীর মত দৌড়াচ্ছে সে এখন। দৌড়ের তালে ড্রেসের তলা থেকে ক্ষণে ক্ষণে বেরিয়ে আসছে ফর্সা, সুঠাম দুই ঊরু। ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকে দেখে নিল রানা। মনে ঘুরপাক খাচ্ছে প্রশ্ন—কে এই মেয়ে? কেন এসেছে এখানে? মনে মনে রাগও হচ্ছে মেয়েটার বোকামির জন্যে। ওর কারণেই এখন বিপদে পড়তে হলো রানাকে।

হঠাৎ একটা সংকীর্ণ প্যাসেজ দেখতে পেল রানা—পাশাপাশি দু'জন মানুষ কোনোমতে যেতে পারে ওখান দিয়ে। প্যাসেজটার আকৃতি চেনা চেনা লাগল ওর, তারপরই বুঝে গেল, এটা সেই কানেক্টিং করিডোর—দুর্গ আর টাওয়ারের মাঝে সংযোগ ঘটিয়েছে। টাওয়ারেই যাবে বলে ঠিক করল, মেয়েটাকে ইশারা করে ঢুকে পড়ল করিডোরে। শেষ মাথায় পৌঁছুতেই একটা প্যাঁচানো সিঁড়ি মিলল, টাওয়ারের শিরদাঁড়া বরাবর উঠে এসেছে ওটা। উপরে, না নিচে যাবে, ভাবল রানা। টাওয়ারের গোড়ায় জেটি রয়েছে, সেখান থেকে একটা বোট ধার করা যেতে পারে। কিন্তু ওখানেও কি প্রহরী রাখেনি লিম? প্রশ্নটার জবাব দেবার জন্যেই যেন কয়েক সেকেণ্ড পর নিচ থেকে ভেসে এল কণ্ঠস্বর... কারা যেন উঠে আসছে সিঁড়ি ধরে।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল রানা, কোণঠাসা হয়ে পড়েছে ওরা। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে এক দল; আরেক দল রয়েছে করিডোরের ওপাশে। একটা রাস্তাই শুধু খোলা। সঙ্গিনীর দিকে তাকাল ও। বলল, 'উপরে চলো।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। তাকে আগে যেতে দিল রানা। দ্রুত পায়ে দু'জনে উঠতে শুরু করল সিঁড়ি ভেঙে। প্যাঁচানো সিঁড়িটা টাওয়ারের সিংহভাগ দখল করে রেখেছে। বাকিটুকুতে রয়েছে ছোট-বড় প্রকোষ্ঠ আর স্টোরেজ স্পেস। দেয়ালগুলো পাথর দিয়ে গাঁথা, তাতে প্লাস্টার করা হয়নি। জানালাগুলো ছোট ছোট... ভেন্টিলেটরের মত... সেখান দিয়ে

মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে এক চিলতে রাতের আকাশ। টাওয়ারের ওপরদিকে উঠে এসেছে ওরা, এখন আর দুর্গে ফেরার কোনও পথ নেই। লুকানোর একটা জায়গা খুঁজে নেয়া যেতে পারে, কিন্তু তাতে কোনও লাভ হবে না। টাওয়ারের প্রতিটা ইঞ্চি তন্ন তন্ন করে খুঁজবে লিমের লোকেরা। ধরা পড়া সময়ের ব্যাপার মাত্র।

সিঁড়ি ভেঙে একদম উপরে পৌঁছুল ওরা, মুখোমুখি হলো একটা ভারী কাঠের দরজার। ছিটকিনির সঙ্গে অতিকায় একটা তালা ঝুলছে। লক-পিকিং টুল বের করে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা, খুলে ফেলল তালাটা। দরজা খুলে এরপর দু'জনে বেরিয়ে এল সরু একটা কার্নিশে। টাওয়ারের গম্বুজের মত চূড়াটার চারদিক ঘিরে রেখেছে এই কার্নিশ। রেলিঙের ওপর ঝুঁকে উঁকি দিল রানা, চোখে পড়ল লেকের পানি—অন্তত পঞ্চাশ ফুট নিচে। লিমের বলা কথাটা মনে পড়ল: *লেকটা খুবই গভীর, মি. রানা...।* গভীর হলেই ভাল, তাতে সুবিধে হয়। লাফ না দিয়ে তো উপায় নেই।

ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে পরিষ্কার চোখে পড়ছে দুর্গের এণ্ট্রান্স। রানার ধারণাই ঠিক—কজওয়েতে সশস্ত্র গার্ড বসানো হয়েছে। তবে তাদের মনোযোগ দুর্গের দিকে... ওখান থেকেই অনুপ্রবেশকারীরা বেরিয়ে আসবে বলে আশা করছে। লেকের দিকে নজর নেই কারও। তা ছাড়া বাকি অতিথিদের সামনে পরিস্থিতি স্বাভাবিক দেখাবার জন্যে ভেতরে উচ্চৈঃস্বরে এখনও বাজছে সঙ্গীত... তার আওয়াজ ভেসে আসছে বাইরে। ওতে সুবিধেই হবে রানার। পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় যদি খুব বেশি শব্দ না হয়, তা হলে তা চাপা পড়ে যাবে মিউজিকের আড়ালে।

কার্নিশের কিনারার দিকে এগিয়ে গেল রানা। মেয়েটা ওর মতলব বুঝতে পেরেছে, তাকিয়ে আছে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে।

'লাফ দিতে পারব না আমি,' বলল সে। 'অনেক উঁচুতে

রয়েছি আমরা...’

তাকে থামিয়ে দিল রানা। জিজ্ঞেস করল, ‘কী নাম তোমার?’

একটু ইতস্তত করল মেয়েটা। তারপর নিচু গলায় বলল, ‘মিশেল... মিশেল হান্টার।’

তার কণ্ঠ শুনে বুঝল রানা, মিথ্যে বলছে না। বড় করে শ্বাস নিল ও, বলল, ‘শোনো, মিশেল, তোমার সামনে এখন দুটো পথ রয়েছে। হয় আমার সঙ্গে চলো, নয়তো থেকে যাও এখানে। কোনোটাতেই আপত্তি করব না। নিজেই ঠিক করো কী করবে। আমি চললাম।’

‘আমাকে ফেলে যাবে তুমি?’ মিশেলের কণ্ঠে অবিশ্বাস।

‘অবশ্যই! আমি তোমাকে ডেকে আনিনি এখানে, কাজেই আমার কোনও দায়িত্বও নেই। গুড বাই, মিশেল। আগামীতে যদি একই কাভার নাও, রেসাররা কে কোন্ গাড়ি চালাচ্ছে, সেটা অন্তত জেনে এসো।’

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল রানা, তৈরি হলো লাফ দেবার জন্যে। নিচে তাকাতেই কেঁপে উঠল বুক। মিশেল ভুল বলেনি, লেক থেকে টাওয়ারের ছাতের উচ্চতা নেহাত কম নয়। কালচে পানিকে দেখাচ্ছে নিরেট জমিনের মত।

‘দাঁড়াও!’ পিছন থেকে চাপা গলায় বলে উঠল মিশেল। পাশে এসে দাঁড়াল। রাগে ফুঁসছে, যেন রানার দোষে ঘটছে এসব।

‘লেডিজ ফার্স্ট!’ মুচকি হেসে বলল রানা।

‘নিকুচি করি!’ মুখ ঝামটে উঠল মিশেল। ‘চলো!’

একসঙ্গে লাফ দিল দু’জনে। সবেগে ধেয়ে গেল নিচে। কানে বাতাসের শোঁ-শোঁ আওয়াজ শুনল রানা, লেকটা যেন লাফ দিয়ে উঠে আসছে ওদের দিকে। ডাইভ দেয়নি, পা নিচে রেখে পানিতে পড়ার চেষ্টা করছে ও। শরীর যতটা সম্ভব খাড়া রাখল; লাগিয়ে রাখল পা-জোড়া; হাত নিয়ে গেল

উপরে। ছুরির ফলার মত মসৃণভাবে ঢুকে যাবে পানির সারফেস ভেদ করে। তা হলে শব্দ কম হবে। একেবারে শেষ মুহূর্তে আতঙ্ক ভর করল মাথায়—লিম যদি মিথ্যে বলে থাকে? পানি যদি অগভীর হয়? বলা তো যায় না, লেকের তলায় হয়তো বড় বড় পাথর আছে। ওগুলোর ওপর আছড়ে পড়লে গুঁড়িয়ে যাবে ওর পা... থেঁতলে যাবে শরীর। তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে হয়তো মারা যাবে ও! মনে মনে নিজেকে গালমন্দ করল—এখন এসব ভেবে লাভ আছে? কিন্তু দূরও তো করতে পারছে না দুশ্চিন্তা। ব্যাপার কী? এখনও নিচে পৌঁছুচ্ছে না কেন ও? যেন অনন্তকাল ধরে পড়ে চলেছে ও।

হঠাৎ পানির স্পর্শ পেল রানা। লেকের সারফেস ভেদ করল ওর পা-দুটো। পিছু পিছু পানিতে তলিয়ে গেল পুরো দেহ। নামছে তো নামছেই। চারদিকে কালিগোলা অন্ধকার আর হিমশীতল পানি—মৃত্যুর সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য নেই পরিবেশটার। দম আটকে রেখেছে ও, কিন্তু খানিক পরেই আকুলি-বিকুলি শুরু করল ফুসফুস। শরীর তখনও নিচে নামছে, হ্রদের তলদেশের দেখা নেই। লিমের কথাই ঠিক... লেকটা খুব গভীর, পানিও খুব ঠাণ্ডা—সম্ভবত পাহাড়ি কোনও গ্লেসিয়ার গলে পানিটা এসে জমা হচ্ছে এখানে। অসাড় হয়ে আসছে রানার শরীর। হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে, ফুসফুসে যেন আগুন ধরে গেছে, ব্যথায় আর্তনাদ করছে প্রতিটা রোমকূপ। ডুবছে না ভাসছে, বুঝতে পারছে না রানা। কাজ করছে না ইন্দ্রিয়গুলো। সজ্ঞানে আছে কি না, তা-ই নিশ্চিত নয়।

হঠাৎ রানার মনে হলো, থেমে গেছে ও... সুতোয় বাঁধা পুতুলের মত পানির তলায় ঝুলছে ওর দেহ। সঙ্গে সঙ্গে পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়ল ও—ভেসে উঠতে চায়। কিন্তু সহজ হলো না সেটা। জামাকাপড় ভিজে ভারী হয়ে গেছে,

মনে হচ্ছে কয়েক টন; ওকে টেনে নামাতে চাইছে নিচে। তাই বলে হার মানল না রানা, শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে লাথি মারতে থাকল, হাতও চালাচ্ছে সমানে। খানিক পরেই ভেসে উঠল ভুস করে।

হাঁপানি রোগীর মত শ্বাস ফেলছে ও, বুক ভরে টেনে নিচ্ছে তাজা বাতাস। দৃষ্টি একটু পরিষ্কার হলে চারপাশে তাকাল—মিশেলকে খুঁজছে। ওর চোখের সামনেই মাথা জাগাল মেয়েটা—অক্ষত অবস্থায়। সুন্দর চুলগুলো লেপ্টে গেছে খুলির সাথে, চোখদুটো বড় হয়ে আছে... বোধহয় বিশ্বাসই করতে পারছে না যে, অত ওপর থেকে ঝাঁপ দেবার পরও বেঁচে গেছে। ইশারায় ওকে শান্ত থাকতে বলল রানা, এরপর টাওয়ার আর দুর্গের দিকে তাকাল গার্ডদের প্রতিক্রিয়া দেখতে। আওয়াজ শুনে থাকলে ছুটে আসবে ওরা। কিন্তু দেখা গেল না কাউকে।

মিশেলকে ইশারা দিয়ে সাঁতার কাটতে শুরু করল রানা। দুর্গ থেকে দূরে সরে গিয়ে ডাঙায় উঠবে। হাত-পা নাড়ছে ধীরে ধীরে, পানিতে যাতে বেশি আলোড়ন না ওঠে। ভীষণ ঠাণ্ডা পানি, শরীর জমে যাবার জোগাড়। একভাবে না পেরে লেকটা যেন আরেকভাবে খুন করতে চাইছে ওদেরকে। আঙুলগুলোয় কোনও অনুভূতি টের পাচ্ছে না ও, ঠকঠক করে বাড়ি খাচ্ছে দাঁতের সারি। লেকের পাড়ও যেন ক্রমেই সরে যাচ্ছে দূরে। মিশেলের দিকে তাকাল—রীতিমত হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে বেচারি। কিন্তু এখুনি সাহায্য দরকার নেই ওর। সাঁতারে মনোযোগ দিল রানা। এই টেম্পারেচারে পাঁচ-ছ'মিনিটের বেশি টিকবে না ওরা, যেমন করে হোক তার আগেই পৌঁছুতেই হবে ডাঙায়।

যেন অনন্তকাল পর তীরে পৌঁছুল ওরা। জায়গাটা দুর্গের পেছনে... অন্তত তিনশো গজ দূরে। অগভীর পানিতে পৌঁছে উঠে দাঁড়াল রানা, মিশেলকেও টেনে দাঁড় করাল, তারপর

দু'জনে পানি ভেঙে উঠে এল তীরে। দুর্গের নিচতলায় আলোর আভা দেখা যাচ্ছে ওখান থেকে, অস্পষ্টভাবে ভেসে আসছে গান-বাজনার আওয়াজ। পার্টি এখনও পুরোদমে চলছে; অতিথিদের জানা নেই, তাদের চোখের আড়ালে কী ঘটে চলেছে। মিশেলের দিকে ফিরল রানা, থমকে গেল মুহূর্তের জন্যে। ভেজা পোশাক লেপ্টে আছে মেয়েটির শরীরে, ফুটে উঠেছে আকর্ষণীয় দেহসৌষ্ঠব, প্রকট হয়ে উঠেছে প্রতিটি আঁক-বাঁক। ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়ছে তার সারা দেহ থেকে, চাঁদের আলোয় অপার্থিব লাগছে দৃশ্যটা... মনে হচ্ছে যেন হ্রদ থেকে উঠে এসেছে আস্ত এক জলপরী।

হঠাৎ ঠাণ্ডায় কেঁপে উঠল মিশেল। রানা সংবিৎ ফিরে পেল তাতে। জিজ্ঞেস করল, 'কীভাবে এসেছ তুমি? গাড়ি নিয়ে?'

'না, ট্যাক্সিতে,' বলল মিশেল। ঘাড় ফেরাল দুর্গের দিকে। 'আমার হ্যাণ্ডব্যাগটা ফেলে এসেছি বলরুমে। মোবাইল ফোন, টাকা-পয়সা... সব ব্যাগের ভেতরে।'

'ওসবের প্রয়োজন হবে না। আমার গাড়ি আছে, তোমাকে নামিয়ে দেব। চলো।'

লেকের চারপাশে রয়েছে ঘন জঙ্গল, তার ভেতরে ঢুকে পড়ল দু'জনে। ঘুরপথে এগিয়ে চলেছে কার পার্কের দিকে। ইতিমধ্যে পকেট হাতড়ে দেখে নিয়েছে রানা, গাড়ির চাবিটা হারায়নি। জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে রয়েছে লিমের অফিস থেকে আনা ছবিগুলোও... পানিতে ভিজে খুব বেশি ক্ষতি না হলেই হয়।

দশ মিনিট লাগল পার্কিং এরিয়ায় পৌঁছুতে। আড়াল থেকে বেরুবার আগে জায়গাটা জরিপ করে নিল রানা। নিঃসঙ্গ এক গার্ড ছাড়া আর কেউ নেই, বাকি সব লোক দুর্গে... ওদিকেই বেশি জোর দিয়েছে লিম, চেয়েছে অনুপ্রবেশকারীদের দুর্গের ভেতরে কোণঠাসা করতে।

অতিথিদের গাড়ি পাহারার জন্যে কার পার্কের গার্ড আগে থেকেই আছে... গাড়ি রাখার সময় তাকে দেখে গেছে রানা... লোকটাকে আর সরানো হয়নি, তবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এখন গার্ডের হাতে শোভা পাচ্ছে একটা পিস্তল। পার্কিং এরিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত টহল দিচ্ছে সে।

ঠোঁটের কাছে আঙুল তুলে মিশেলকে সঙ্কেত দিল রানা, বসে রইল ঘাপটি মেরে। খানিক পরেই ওদের সামনে দিয়ে হেঁটে গেল গার্ড। লোকটাকে একটু এগিয়ে যাবার সুযোগ দিল ও, এরপর নিঃশব্দে আড়াল থেকে বেরিয়ে পিছু নিল তার। শেষ মুহূর্তে বিপদ টের পেয়ে ঘুরবার চেষ্টা করল গার্ড, কিন্তু তার আগেই ঘাড়ের ওপর ভয়ানক এক রদ্দা খেয়ে লুটিয়ে পড়ল। অজ্ঞান দেহটা টেনে ঝোপের আড়ালে নিয়ে এল রানা, হাতছানি দিয়ে ডাকল মিশেলকে।

গাড়িটা পার্কিং এরিয়ার শেষ প্রান্তে, নিচু হয়ে ওদিকে ছুটে গেল দু'জনে। গাড়ির পাশে পৌঁছে লক খুলল রানা, উঠে পড়ল ড্রাইভিং সিটে। মিশেল উঠে বসল ওর পাশে। ইগনিশন ঘোরাল রানা, ইঞ্জিন চালু হলো। হ্যাণ্ডব্রেক রিলিজ করে গিয়ার দিল, তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল কার পার্ক থেকে। হেডলাইট জ্বালেনি, শুধু হিটার চালিয়েছে। ধীরে ধীরে আরামদায়ক উষ্ণতায় ভরে উঠছে গাড়ির অভ্যন্তর।

রিয়ারভিউ মিরর থেকে শ্লস ব্রনসার্টের অবয়ব হারিয়ে গেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। হেডলাইট জ্বালল এবার, অ্যাকসেলারেটর চেপে গাড়ির গতি বাড়াল।

'কোথায় যাবে?' মিশেলকে জিজ্ঞেস করল ও।

'কোলোনে ফিরে যাবার কথা আমার,' মিশেল বলল। 'একটা ট্যাক্সিকে বলে রেখেছি রাত বারোটায় আমাকে এখান থেকে তুলে নিতে।'

'সেটা তো হচ্ছে না। তা ছাড়া এ-অবস্থায় একাকী

কোলোনে ফিরে যাওয়াও নিরাপদ নয়।'

'টাকা নেই আমার কাছে। যাবার কোনও জায়গাও নেই।'

'তা হলে আমার সঙ্গে নিয়রবর্গে গেলেই ভাল করবে। হোটেলে আমার কামরা আছে... ওখানে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারো। সকালে তোমার কোলোনে ফেরার ব্যবস্থা করে দেব।'

আপত্তি করল না মিশেল, মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল। চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি? অ্যাণ্ডি লিমের অফিসে কী করছিলে?'

'প্রশ্নটা আমিই করতে যাচ্ছিলাম,' শান্ত গলায় বলল রানা। মিশেলকে অপ্রস্তুত দেখাল। মুখ ঘুরিয়ে বাইরে তাকাল সে। হাসল রানা। 'বেশ, এখন যদি বলতে না চাও, সকালে এ-নিয়ে আলোচনা করা যাবে।'

আর কোনও কথা হলো না দু'জনের মধ্যে। রাতের আঁধার চিরে হু হু করে ছুটে চলল রানার গাড়ি।

সাত

থমথমে নীরবতা বিরাজ করছে অ্যাণ্ডি লিমের অফিসে।

মূর্তির মত নিজের চেয়ারে বসে আছে দক্ষিণ কোরিয়ান ধনকুবের, পার্টির পোশাক বদলায়নি। নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস নিলেও কোটের আড়ালে তার বুকের ওঠানামা তেমন একটা বোঝা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে চোখের পলক না ফেললে

হয়তো বা মূর্তি বলেই ভ্রম হতো। টেলিফোনে খানিক আগে কথা বলা শেষ করেছে সে, তারপর থেকে বসে আছে এভাবে। ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে নিজের এলোমেলো ডেস্কের দিকে।

আরও চারজন মানুষ রয়েছে কামরায়। এদের মাঝে তিনজন পজিশন নিয়েছে কামরার তিন পাশে—সতর্ক ভঙ্গি, মুহূর্তের নোটিশে অস্ত্র বের করতে তৈরি। চতুর্থজন শরীর এলিয়ে দিয়েছে ডেস্কের উল্টোপাশের চেয়ারে—গলায় কালশিরে, এক হাতে চেপে ধরে রেখেছে পেটের একপাশ... এখনও পুরোপুরি সুস্থ নয় সে। একেই কোর্টইয়ার্ডে আক্রমণ করেছিল রানা।

অবশেষে নড়ল লিম। মুখ তুলে তাকাল সামনে বসা লোকটার দিকে। তারপর হেলান দিল চেয়ারে।

'ব্যাপারটা গুরুতর, হান্স,' বলল সে। 'ছ'টা ফটো গায়েব। জেনে-বুঝে ওগুলো চুরি করা হয়েছে, নাকি স্রেফ সন্দেহের বশে সরানো হয়েছে, বলা মুশকিল। কয়েকটা কাগজও খোয়া গেছে, তবে সেগুলো মূল্যহীন। আমার স্পনসরেরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। তাদেরকে শান্ত করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে আমাকে।'

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মি. লিম,' তটস্থ গলায় বলল হান্স। 'তবে চিন্তা করবেন না, ওই চোরকে আমরা খুঁজে বের করব।'

'খুঁজে বের করার আগে এটা বলতে পারবে, সে পালাল কী করে? আমার অফিসে ঢুকলই বা কীভাবে? এত লোক থাকতে তুমিই কিনা ঘায়েল হলে ওর হাতে?'

'ঘটনাটা দুর্ভাগ্যজনক, স্বীকার করছি,' মিনমিনে গলায় বলল হান্স।

'দুর্ভাগ্যজনক বললে কম বলা হয়।' উত্তেজনার কোনও লক্ষণ নেই লিমের গলায়। 'তোমার ভুলেই ঘটেছে এসব।

এ-দেশে তুমি আমার হেড অভ সিকিউরিটি। কাজেই তোমার উচিত ছিল পার্টিতে যত অতিথি আসছে তাদের সবার নামধাম চেক করে দেখা।'

'ইনফরমাল ইনভিটেশন দেয়া হয়েছে সবাইকে,' গোমড়ামুখে বলল হান্স। 'অতিথিরা ইচ্ছেমত সঙ্গী-সাথী নিয়ে ঢুকেছেন, কাউকে বাধা দেয়া হয়নি। তাদের পূর্ণাঙ্গ কোনও লিস্ট পাইনি আমি।'

'চাওনি কেন?' একটু ধমকের সুরে বলল লিম। 'আগেই যদি বুঝে থাকো যে, ওতে সিকিউরিটি রিস্ক আছে, আমাকে বলোনি কেন? তা হলে তো কার্ড ছাড়া একজনকেও ঢুকতে দিতাম না। তা ছাড়া ওভাবেও নিজের দায় এড়াতে পারো না তুমি। মাসুদ রানা স্বনামে এসেছিল এখানে, নাম ভাঁড়ায়নি। আমার স্পনসরেরা তাকে খুব ভাল করেই চেনে। মাসুদ রানা—বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের একজন প্রথম সারির এজেন্ট। তথ্যটা তোমার কাছ থেকে পাবার কথা ছিল আমার।'

'আমি জানতাম, সে রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির ডিরেক্টর,' হান্স বলল। 'আপনার সঙ্গে তার কোনও বিরোধ ছিল না, তাই লোকটার ব্যাপারে তলিয়ে দেখার প্রয়োজন অনুভব করিনি।'

'আর সে-কারণে এখন এত বড় সর্বনাশ ঘটে গেছে। আমার পুরো প্রজেক্ট এখন হুমকির মুখে। এর জন্যে তুমি একা দায়ী। স্রেফ একজন অ্যামেচারের মত আচরণ করেছ তুমি। বাইরে গিয়েছিলে কীসের জন্যে?'

'ইয়ে... তাজা হাওয়ার জন্যে...'

'তাজা হাওয়া, নাকি সিগারেটের ধোঁয়া? আই ডোন্ট কেয়ার। আসল কথা হলো, দায়িত্বে অবহেলা করেছ তুমি। আমি তোমাকে বলরুম থেকে বেরুবার অনুমতি দিইনি। আমার পাশে থাকার কথা ছিল তোমার, নিরাপত্তা নিশ্চিত

করার জন্যে। ওভাবে আমাকে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে গেলে কোন্ সাহসে? তোমার অনুপস্থিতিতে আমার তো আরও কোনও বিপদ হতে পারত... কেউ হামলা করতে পারত আমাকে! সেটা হয়নি ঠিকই, কিন্তু নিজে আক্রান্ত হয়েছ। পিছন থেকে তোমাকে ঘায়েল করেছে রানা, বেহুঁশ বানিয়ে ব্যবহার করেছে ডাইভারশন হিসেবে।'

'ওর চেহারা আমি দেখিনি। লোকটা যে রানা ছিল, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।'

'প্লিজ, হান্স, আমার বুদ্ধিমত্তাকে অপমান কোরো না। রানা ছাড়া আর কে হতে পারে? ও-ই তোমাকে বয়ে নিয়ে এসেছিল হলওয়েতে। আর তা দেখে সিঁড়ির সামনে থেকে ছুটে এল তোমার লোক... ফাঁকা করে দিল রানার উপরে ওঠার রাস্তা।'

'আ... আসলে...' বলার চেষ্টা করল হান্স।

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল লিম। 'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। এতক্ষণ বললাম নিচতলার দুর্বলতার কথা। ওপরতলার অবস্থা ছিল আরও খারাপ। এখানে একজন গার্ডও রাখার প্রয়োজন বোধ করোনি তুমি। অথচ এই অফিসে আমার সমস্ত কনফিডেনশিয়াল ফাইলপত্র রাখা!' মাতৃভাষায় একটা গাল দিল সে। এতক্ষণে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। 'সিকিউরিটি বলতে কিচ্ছু ছিল না এখানে... কিছুই না!'

'প্রেশার অ্যালার্ম তো অ্যাক্টিভেট করা ছিল!' মরিয়া শোনাল হান্সের কণ্ঠ।

'তাতে কতটুকু লাভ হয়েছে?' ভুরু নাচাল লিম। 'অ্যালার্ম শুনে তোমার লোকেরা যতটা সময় নিয়েছে অফিস পর্যন্ত আসতে, ততক্ষণে কেটে পড়েছে রানা। ধরতে তো পারোইনি, সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ করেছ ওকে পালাতে দিয়ে। রানা এখন কোথায়, কোনও আইডিয়া আছে তোমার?'

‘কার পার্কের গার্ডকে অজ্ঞান করে নিজের গাড়ি নিয়ে চলে গেছে,’ অস্বস্তি নিয়ে বলল হান্স। ‘এর বেশি কিছু জানা যায়নি।’

‘সাবাস! তোমাদের পিঠ চাপড়ে দিতে হয়!’ ব্যঙ্গ করল লিম। ‘লোকটা এতকিছু ঘটাবার পর নিজের গাড়ি নিয়েই বহাল তবিয়তে চলে গেল? তোমরা টা টা দিতে ভোলোনি তো?’

‘এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি, মি. লিম।’ জানে, এসব বলে লাভ নেই; তাও শেষ চেষ্টা করল হান্স। ‘আমি কথা দিচ্ছি, আর কখনও ঘটবে না।’

‘এই একটা বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে একমত,’ শান্ত গলায় বলল লিম।

কোটের পকেটে হাত দিল সে, বের করে আনল তাসের একটা প্যাকেট। সেটা দেখামাত্র ঢোক গিলল হান্স, কী ঘটতে চলেছে তা বুঝে ফেলেছে। মুখ থেকে রক্ত সরে গেল তার।

ধীরে-সুস্থে প্যাকেট থেকে তাসের বাণ্ডিল বের করল লিম। টেবিলের একটা অংশ পরিষ্কার করে সেখানে সবক'টা তাস উল্টো করে বিছাতে শুরু করল। দেখতে বেশ সুন্দর তাসগুলো, জাপানি কায়দায় পেছনে আঁকা রয়েছে ফুল, পাখি আর গাছপালার ছবি।

‘*হানাফুদা*-র কথা আমার মুখে শুনে থাকবে তুমি,’ তাস বিছাতে বিছাতে বলল লিম। যদিও তাসগুলো হান্সের চেনা, তাও আত্মতুষ্টির জন্যে বক্তৃতা দিচ্ছে। ‘কোরিয়ার খুব জনপ্রিয় একটা তাসের খেলা। ছোটবেলায় খেলতাম আমি। হানাফুদার অর্থ, ফুলের তাস। দেখতেই পাচ্ছ, এখানে আটচল্লিশটা তাস রয়েছে। বছরের বারোটা মাসের অনুসারে ডেকটা বারো ভাগে বিভক্ত। প্রতি ভাগে রয়েছে চারটা করে তাস... প্রতিটায় ভিন্ন ভিন্ন ফুলের ছবি। আমরা যেটা খেলতাম, সেটাকে বলত *হোয়াতু*... মানে, ফুলের লড়াই।

তবে হানাফুদার ডেক দিয়ে *কোই-কোই*, আর *গো-স্টপ* নামে আরও দুটো খেলা করা যায়।'

কাজ শেষ হয়েছে লিমের। সোজা হয়ে বসল। বলল, 'এবার আমরা খেলব, হান্স। তবে যে-খেলাগুলোর কথা বললাম, 'সেগুলোর কোনোটা নয়। কারণ, তুমি নিশ্চয়ই জানো, এগুলো ভিন্ন তাস... আমার নিজের তৈরি করা। এগুলোর মাধ্যমে নির্ধারিত হবে তোমার মৃত্যুর প্রক্রিয়া।'

'প্লিজ...'

'কথার মাঝখানে কথা বোলো না,' রূঢ় গলায় বলল লিম। 'আমাকে বাধা দেবারও চেষ্টা কোরো না। তোমার নিজের হাতে গড়া তিনজন যোগ্য লোক দাঁড়ানো আছে পেছনে, তেড়ি-বেড়ি করতে গেলে ওরা তোমাকে পিটিয়ে ছাতু বানাবে। ওদের প্রাক্তন বস হিসেবে ব্যাপারটা খুবই অসম্মানজনক হবে তোমার জন্যে। মরতে যেহেতু হবেই, মাথা উঁচু করে মরাই কি ভাল নয়?'

কেঁপে উঠল হান্স।

'মানুষের মৃত্যু অনিবার্য,' দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল লিম। 'এর কোনও ব্যত্যয় নেই। তুমি যেমন মরবে, তেমনি আমিও একদিন মরব। কথা হলো, কখন ও কীভাবে? কেউ জানে না। জানে না বলেই মৃত্যুকে এত ভয় পায় লোকে। সেই ভয়ের স্বরূপ আমি দেখেছি, হান্স। মৃত্যুকে আমি যতটা কাছ থেকে দেখেছি, তা খুব কম মানুষই দেখে ফিরে আসতে পারে। তাই মৃত্যুভয়ে আর ভীত নই আমি। মৃত্যু এখন আমার জন্যে এক খেলা... মৃত্যুর অনিশ্চয়তাকে আমি নিয়ে এসেছি তাসের টেবিলে। তারই নমুনা দেখছ তুমি তোমার সামনে।' ডেস্কের দিকে ইশারা করল সে। 'এখানকার পঁয়তাল্লিশটা তাসে রয়েছে পঁয়তাল্লিশ রকম মৃত্যুর প্রক্রিয়া। উল্টোপাশে লেখা রয়েছে সেগুলো। কিছু কিছু আছে, যেগুলো কার্যকর করতে তোমার সহায়তা প্রয়োজন—যেমন ধরো, বিষ

খেতে হবে, কিংবা ব্লেড দিয়ে কেটে ফেলতে হবে হাতের ধমনী। কিছু আবার খুব দ্রুত জীবন নেবে তোমার, কোনও ধরনের ব্যথা অনুভব ছাড়া। যেমন, শিরশ্ছেদ... তবে সেটা বড়ই নোংরা, রক্ত-টক্ত ছড়িয়ে একাকার হয়। মাথায় গুলির কায়দাটা সবচেয়ে ভাল। চোখের পলকে সব শেষ। কিন্তু কয়েকটা আছে দীর্ঘায়িত, কষ্টকর পদ্ধতি। মাসখানেক আগেই আমেরিকায় একজনের হাতে অমন একটা তাস উঠেছিল। মরবার আগে টানা এক সপ্তাহ নির্যাতনের শিকার হয়েছিল সে। প্রার্থনা করো, যাতে সহজ কিছু ওঠে। বৈদ্যুতিক শক বা আগুনে পোড়ানোর মত কিছু উঠলে খামোকা কষ্ট পাবে।'

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে লিমের দিকে তাকিয়ে আছে হান্স। ভয়ঙ্কর কথাগুলো এত সহজভাবে বলছে কী করে লোকটা?

'ওভাবে তাকিয়ো না,' লিম বলল। 'তোমার প্রতি কোনও বিদ্বেষ নেই আমার। শাস্তি পাওনা হয়েছে বলে শাস্তি দিচ্ছি। নইলে লোকে আমাকে দুর্বল ভাববে... ভবিষ্যতে নিত্য-নতুন ভুল করবে। আমার কাজে ভুলের কোনও স্থান নেই।'

বিছিয়ে রাখা তাসের ডেকের দিকে তাকাল হান্স। দৃষ্টিতে ঘৃণা, যেন এরচেয়ে জঘন্য কোনও বস্তু জীবনে দেখেনি সে।

'টানো একটা তাস,' থমথমে গলায় হুকুম দিল লিম।

নড়ল না হান্স। অনুনয়ের সুরে বলল, 'প্লিজ, স্যর, দয়া করুন! অনেকদিন থেকে আপনার হয়ে কাজ করছি আমি। যখন-যা চেয়েছেন, তা-ই করেছি। কোনোদিন আপনার কথার অবাধ্য হইনি...'

'তোমার হয়ে আমাকে তাস টানতে বাধ্য কোরো না, হান্স!' ধমকে উঠল লিম। 'সেক্ষেত্রে রেগে যাব আমি, খুব খারাপ কোনও তাস বেছে নেব। তা ছাড়া, রেহাই পাবার ছোট্ট একটা সুযোগ রয়েছে তোমার সামনে। কী বলেছি, শোনোনি? এখানকার পঁয়তাল্লিশটা তাসে রয়েছে মৃত্যুর

প্রক্রিয়া। তারমানে তিনটা তাস আছে ফাঁকা। যদি ওগুলোর কোনোটা তোমার হাতে উঠে আসে, তোমাকে মুক্তি দেব আমি—বেকসুর। আজকের ঘটনা ভুলে যাব বেমালুম। পঁয়তাল্লিশটায় তিনটা... মানে, পনেরোটার বিপরীতে একটা করে বাঁচার সুযোগ। হিসেবটা খুব অনুকূল দাবি করব না, কিন্তু সামান্য হলেও তো বাঁচার সুযোগ আছে তোমার! নেবে না? ত্রিশ সেকেণ্ড সময় দিচ্ছি, কী করবে ভেবে নাও।'

হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে গেছে হান্সের, ঘন ঘন ওঠানামা করছে বুক। কপালে ঘাম জমল। জিভ দিয়ে ভেজাল শুকনো ঠোঁট। যখন বুঝল, লিমের কথা না মেনে কোনও উপায় নেই, তখন সামনে ঝুঁকল, ডেকের মাঝখান থেকে একটা তাস ওল্টাল। ফাঁকা নয় ওটা। সাদা জমিনে গোটা গোটা হরফে ছোট্ট একটা শব্দ লেখা:

'ফাঁসি।'

একটা চিৎকার বেরিয়ে এল হান্সের গলা দিয়ে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। দু'হাত বাড়িয়ে খামচে ধরতে চাইল লিমকে। তৈরি ছিল পেছনের তিন গার্ড, হান্সের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা, লিমের নাগাল পাবার আগেই টেনে-হিঁচড়ে তাকে সরিয়ে আনল টেবিলের কাছ থেকে। মেঝেতে উপুড় করে ফেলে ঠেসে ধরা হলো।

চেয়ার ছেড়ে নড়েনি লিম। শান্ত গলায় বলল, 'দড়ির ব্যবস্থা করো।'

দু'জন গার্ড হান্সকে ধরে রাখল, তৃতীয়জন বেরিয়ে গেল রুম থেকে। মিনিটপাঁচেক পর ফিরে এল সে—জেটি থেকে নৌকা বাঁধার এক কয়েল মোটা দড়ি নিয়ে এসেছে। এবার উঠে দাঁড়াল লিম। বেরিয়ে এল ডেস্কের পিছন থেকে। সিলিঙের দিকে তাকাল সে। কাঠের তৈরি মোটা একটা বিম চলে গেছে রুমের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত।

'ওটাতেই ঝুলতে পারবে,' বলল সে। তৃতীয় গার্ডকে

ইশারা করল। 'একটা চেয়ার আনো।'

দড়ির কয়েল নামিয়ে রাখল গার্ড। হান্সের চেয়ারটা এনে রাখল বিমের তলায়।

দাঁড় করানো হলো হান্সকে। খেপাটে চেহারা হয়েছে তার। ছাড়া পাবার জন্যে মোচড়ামুচড়ি করছে সে। ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'আমি মানি না। পাগলামি করছেন আপনি, মি. লিম! অ্যাই, তোমরা ওঁর কথা শুনছ কেন? ছাড়ো আমাকে!'

না শোনার ভান করল গার্ডেরা। তাকে টেনে নিয়ে গেল চেয়ারের কাছে।

'কীভাবে ঝুলতে চাও?' জিজ্ঞেস করল লিম। 'নিজে ঝুলবে, নাকি আমরা ঝোলাব? আগেই বলে দিচ্ছি, আমাদেরকে ঝোলাতে হলে সেটা সুখকর হবে না তোমার জন্যে।'

স্থির হয়ে গেল হান্স। ক্রোধ নয়, এবার আকুতি ফুটল তার চেহারায়। 'প্লিজ, স্যর! আমার স্ত্রী-সন্তান আছে। ছেড়ে দিন আমাকে!'

'আমাকে দেখে কি সিদ্ধান্ত পাল্টাবার লোক বলে মনে হচ্ছে তোমার?' বিরক্ত গলায় বলল লিম। 'খামোকা সময় নষ্ট করছ, হান্স। অনেক রাত হয়েছে, আমাকে ঘুমুতে যেতে হবে। ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাও, আরও খারাপ কোনও তাস উঠতে পারত। যাক গে, শুরু করো। কীভাবে কী করতে হবে, তা তো নিশ্চয়ই জানো। দড়ি দিয়ে প্রথমে একটা ফাঁস বানাও।'

'না!'

চোয়াল শক্ত হলো লিমের। 'কথা না শুনলে তোমার বউ-বাচ্চাকে নিয়ে আসব এখানে। তোমার চোখের সামনে খুন করব ওদেরকে!'

'না, প্লিজ! ওদের কোনও ক্ষতি করবেন না।'

'তা হলে ফাঁস বানাও।'

‘কীভাবে বানাতে হয়, আমি জানি না...’

‘দড়িটা গলায় পেঁচিয়ে গিঁঠ দাও। যে-কোনও গিঁঠ হলেই চলবে। শুধু খেয়াল রেখো, ওটা যেন খুলে না যায়।’

কয়েক সেকেণ্ড স্থির হয়ে রইল হান্স, অবশেষে হার মানল। বুঝতে পেরেছে, অনিবার্য পরিণতিকে এড়াবার কোনও উপায় নেই। ঝুঁকে দড়ির একটা প্রান্ত তুলে নিল সে, হাত কাঁপছে। গলায় পেঁচিয়ে গিঁঠ দিয়ে বাঁধল। এরপর অন্যপ্রান্তটা হাতে নিয়ে উঠে পড়ল চেয়ারে। দড়িটা টান টান করে বাঁধল কড়িকাঠের সঙ্গে।

প্রস্তুতি শেষ। ছলছল চোখে লিমের দিকে তাকাল হান্স। জিজ্ঞেস করল, ‘আমার বউ-বাচ্চাকে কী বলবেন আপনি?’

‘এটুকুই যে, একটা অ্যাকসিডেন্টের শিকার হয়েছ তুমি। আর কিছু না। বাই দ্য ওয়ে, তোমার বাচ্চার বয়স কত?’

‘দশ।’

জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল লিম। ‘বাপকে হারাবার জন্যে বয়সটা বড্ড কম। কিন্তু... কী আর করা? চলো, কাজ সারো।’

শেষবারের মত সাহায্যের আশায় প্রাক্তন সহকর্মীদের দিকে তাকাল হান্স। কিন্তু তারা সবাই পিস্তল তাক করে রেখেছে তার দিকে। হতাশায় চোখ বন্ধ করে ফেলল হান্স, লাথি দিল চেয়ারে। প্রথমবার ঠিকমত লাগল না, দ্বিতীয়বারে সেটা উল্টে পড়ল পেছনে। ওজনের ভারে সবেগে নিচে নেমে এল তার দেহ, লটকে গেল ফাঁসিতে। মট্ করে ঘাড়ের হাড় ভেঙে যাবার বিশ্রী শব্দ হলো। তির তির করে একটু কেঁপে উঠল দেহটা, এরপর স্থির হয়ে গেল চিরতরে।

নির্বিকার ভঙ্গিতে ডেস্কের কাছে ফিরে গেল লিম। তাসগুলো গুছিয়ে ঢুকিয়ে ফেলল প্যাকেটে। তারপর চোখ তুলে তাকাল এক গার্ডের দিকে। বয়সে কিছুটা তরুণ সে, হান্সের পরিণতি দেখে ঘাবড়ে গেছে মনে হলো।

‘কী নাম তোমার?’ জানতে চাইল লিম।

‘লুকাস কচ, স্যর।’

‘ভেরি গুড, লুকাস। তোমার প্রমোশন হচ্ছে। হান্সের দায়িত্বগুলো আজ থেকে তোমার। ঠিক আছে?’

‘আপনার অশেষ দয়া, মি. লিম।’

‘তোমার প্রথম কাজ, লাশটা লেকে ফেলে দেয়া। ভালমত ওজন বেঁধে দিয়ো।’

‘ইয়েস, স্যর।’

‘শুভরাত্রি।’ কোটের পকেটে তাসের প্যাকেটটা ভরে ফেলল লিম। বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে।

আট

বাথরুম থেকে স্রেফ একটা তোয়ালে জড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে মিশেল। দেহের বেশিরভাগ অংশই অনাবৃত, শাওয়ার নেয়ায় অনেক বেশি কমনীয় ও আকর্ষণীয় লাগছে ওকে। এমন রূপ-যৌবন মুনি-ঋষির ধ্যান ভাঙাতে পারে, রানা তো কোন্ ছার। চোখ ফেরানো কঠিন হয়ে পড়ল ওর জন্যে।

মিশেল অবশ্য নির্বিকার। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, ‘সিগারেট আছে?’

‘না, শুধু ব্র্যাণ্ডি,’ সাইড টেবিলে রাখা বোতল আর গ্লাসের দিকে ইশারা করল রানা।

ভ্রূকুটি করল মিশেল। ‘মদ খাইয়ে আমাকে মাতাল করতে চাইছ?’

‘উঁহুঁ। চাইছি স্রেফ শরীর গরম করাতে।’ কথাটা বলেই রানা বিব্রত হলো... দু'রকম অর্থ হতে পারে এর। তাই তাড়াতাড়ি যোগ করল, ‘ঠাণ্ডা পানিতে সাঁতার কেটে এসেছ কিনা।’

ওর রুমটা একদম ওপরতলায়, এক প্রান্তে। ছাতটা ঢালু। জানালা দিয়ে তাকালে চোখে পড়ে গাছগাছালিতে ঢাকা গ্রামাঞ্চল। বেশ পুরনো হোটেল, স্কি-লজের মত একটা ভাব আছে ভেতরে। এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেটে পড়তে হবে... ব্রেকফাস্টের পরেই হোটেল ছাড়ার ইচ্ছে রানার। ইতিমধ্যে শাওয়ার নিয়ে পোশাক পাল্টেছে ও। লাগেজ গুছিয়ে রেখে দিয়েছে দরজার পাশে। মুহূর্তের নোটিশে বেরিয়ে পড়তে তৈরি। ম্যান্টেলপিসের ওপর রাখা প্রাচীন ঘড়িটা সময় দেখাচ্ছে—রাত দুটো। বাকি রাতটা ভালয় ভালয় কাটিয়ে দিতে পারলে হয়। এমনিতে অবশ্য বিপদের খুব একটা আশঙ্কা করছে না ও, আজ রাতেই অ্যাণ্ড্রি লিম কিছু করতে যাবে বলে মনে হয় না। যা ঘটেছে, তা তলিয়ে দেখতে কিছুটা সময় নেবে নিঃসন্দেহে। সকালে হয়তো লোক পাঠাবে রানার খোঁজে। তারপরেও নাইট পোর্টারকে মোটা অঙ্কের বখশিশ দিয়েছে রানা—কেউ ওকে খুঁজতে এলে বলে দেবে, মি. রানা রাতে হোটেলে ফেরেননি। এরপরেও লোকগুলো জোরাজুরি করলে একটা ভুয়া রুম নাম্বার দেবে, তারপর ফোন করে সতর্ক করে দেবে ওকে।

মিশেলের দিকে তাকাল রানা। গ্লাসে ব্র্যাণ্ডি ঢালছে মেয়েটা। ওকে হোটেলে নিয়ে আসার পেছনে দুটো কারণ রয়েছে। প্রথমটা মানবিক—বিপদে পড়েছে মেয়েটা... রাতদুপুরে যাবার জায়গা নেই, হাতে টাকা-পয়সা নেই, তাই আশ্রয় দিয়েছে ওকে। এরচেয়ে দ্বিতীয় কারণটা জোরাল। রহস্যময় এ-মেয়েটির সত্যিকার পরিচয় ও উদ্দেশ্য না জানা পর্যন্ত তাকে চোখের আড়াল করতে চায় না ও।

সোফায় বসে ব্র্যাণ্ডিতে চুমুক দিল মিশেল। রানার দিকে না তাকিয়ে বলল, 'যদি ভেবে থাকো, আজ রাতে আমি তোমার সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমাব, তা হলে ভুল করবে।'

'ও-কথা একবারও ভাবিনি,' নীরস গলায় বলল রানা।

'কেন? আমি কি যথেষ্ট সুন্দরী নই?' একটু যেন আহত হলো মিশেল।

'তা বলিনি। সমস্যাটা অন্য জায়গায়।'

'আমার সমস্যা?' এবার রেগে গেল মিশেল। 'সমস্যা তো তোমাকে নিয়ে! নির্ঘাত গোলমাল আছে তোমার মাথায়। কেন যে শুনতে গেলাম তোমার কথা! কী দৌড়ানোটাই না দৌড়ালাম... তারপর ওই টাওয়ার... ভাবলেই গা কাঁপছে আমার। আরেকটু হলে মারাই পড়তাম।'

'রাগছ কেন?' অবাক হয়ে জানতে চাইল রানা। 'আমি তো তোমাকে বাঁচালাম।'

'বাঁচানো না ছাই!' ঢক ঢক করে গ্লাস খালি করল মিশেল। ঘুরে বসল রানার দিকে। 'আমি জানি না তুমি কে, মি. মাসুদ রানা। কিন্তু এটুকু পরিষ্কার, তুমি রেসিং ড্রাইভার নও।'

'ঠিক যেমন তুমি জার্নালিস্ট নও,' মুচকি হাসল রানা।

খোঁচাটা গায়ে মাখল না মিশেল। বলল, 'আমার ধারণা, তুমি কোনও উঁচু মানের ক্রিমিনাল। ওদের সঙ্গেই তোমার আচরণ মেলে। নিশ্চয়ই অ্যাণ্ডি লিমের অফিসে কিছু চুরি করতে ঢুকেছিলে, আর আমি কিনা বোকার মত তোমার সঙ্গে পালালাম! একদম উচিত হয়নি। অ্যালার্ম বেজেছে তো কী হয়েছে, কৈফিয়ত দিয়ে ঠিকই পার পেয়ে যেতাম। কী-ই বা করত লিম? বড়জোর পুলিশ ডাকত। তাতে কী? জরিমানা বা জামিন নিয়ে বেরিয়ে আসতাম। অন্তত টাওয়ার থেকে লাফিয়ে যেভাবে ঘাড় ভাঙতে চলেছিলাম, তার চেয়ে অনেক কম ঝুঁকি ছিল তাতে।'

'ভুল,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'পুলিশ কখনোই ডাকত না লিম। ওকে তুমি চিনতে পারোনি। এ-ধরনের লোকেরা পুলিশ ডাকে না। যা করার নিজেই করে।'

'মানে? কী করত সে?'

'জানি না। তবে ভাল কিছু যে নয়, তা অনুমান করতে পারি।'

'বলেছে তোমাকে!' মুখ ঝামটে উঠল মিশেল। 'আসলে তোমার কথায় কান দেয়াই উচিত হয়নি আমার। আমার ব্যাগ, মোবাইল, টাকা-পয়সা... সব হারিয়েছি। আটকা পড়েছি এই হোটেলে।'

'কেউ তোমাকে আটকে রাখেনি,' এবার বিরক্ত হলো রানা। 'চাইলে এখুনি বেরিয়ে যেতে পারো। দেখো, বিকল্প কোনও ব্যবস্থা করতে পারো কি না। আমি বাধা দেব না।'

মিশেলের রাগে যেন পানি পড়ল। নিজের অসহায়ত্ব টের পেয়েছে। হার মানার ভঙ্গিতে হেলান দিয়ে বসল সে।

'এবার আমার কিছু কথা আছে,' রানা বলল। 'কে তুমি, মিশেল? জার্নালিস্ট যে নও, তা তো বুঝেই ফেলেছি। অন্য কোনও মতলবে গিয়েছিলে শ্লস ব্রনসার্টে। ওপরতলায় যাবার জন্যে গার্ডের সঙ্গে পীড়াপীড়ি করতে দেখেছি আমি তোমাকে। কেন? কী খুঁজছিলে তুমি লিমের অফিসে?'

'এখন আমি কোনও প্রশ্নের জবাব দেব না,' বুকের ওপর দু'হাত ভাঁজ করল মিশেল। 'ওয়াশিংটনে একটা ফোন করতে হবে আমাকে। তোমার মোবাইলটা দেবে?'

'পানিতে ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে ওটা,' এবার রানা মিথ্যে কথা বলল। চাইছে না, মেয়েটা এখুনি কারও সঙ্গে যোগাযোগ করুক। 'সকালে নতুন সেট না কেনা পর্যন্ত ওটা অচল।'

'তা হলে ল্যাণ্ডফোন ব্যবহার করি?' বিছানার পাশে রাখা টেলিফোনটা দেখাল মিশেল।

‘এত রাতে লাইন পাবে বলে মনে হয় না,’ রানা বলল। ‘সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল।’

‘তা হলে সকালের আগে তুমিও কোনও জবাব পাবে না।’

‘অপেক্ষা করতে আপত্তি নেই আমার।’

মাথা ঝাঁকাল মিশেল। আরেকটু ব্র্যাণ্ডি ঢালল গ্লাসে। জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি খুব অদ্ভুত লোক, রানা। সত্যিই কি তুমি ক্রিমিনাল?’

‘না। আমি একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। একটা কেসের তদন্ত করছি। সেটার সঙ্গে লিমের কানেকশন আছে।’

শুকাবার জন্যে ভেজা ফটোগ্রাফগুলো রেডিয়েটরের ওপর বিছিয়ে রেখেছে রানা। সৌভাগ্যক্রমে খুব বেশি ক্ষতি হয়নি কোনোটার। উঠে গিয়ে একটা তুলে নিল ও; গম্ভীর চোখে দেখল তটরেখা, সাদা বিল্ডিঙের সারি, আর গ্যান্ট্রিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা রকেটটাকে। এরপর মিশেলের দিকে ঘোরাল ছবিটা।

‘ফটোটা কীসের, বলতে পারো?’

‘দেখে তো লঞ্চসাইট বলে মনে হচ্ছে,’ বলল মিশেল।

‘সেটা আমিও বুঝেছি। কিন্তু জায়গাটা কোথায়, তা জানো?’

‘নাহ্,’ মাথা নাড়ল মিশেল।

মিথ্যে বলছে, বুঝতে পারল রানা। লিমের অফিসে আমেরিকান রকেটের ছবি, আর সেখানে চুপি চুপি হাজির হওয়া আমেরিকান একটি মেয়ে... কো-ইনসিডেন্স হতে পারে না। কে ও? সিআইএ? জানা দরকার। কিন্তু মিশেল কিছু বলতে চাইছে না। জোরাজুরি করতেও ইচ্ছে করছে না রানার। ক্লান্ত লাগছে খুব। সকালে নিয়রবর্গরিঙের রেস, আর সন্ধ্যায় লিমের দুর্গে দৌড়ঝাঁপ... ভালই ধকল গেছে ওর

ওপর দিয়ে। একটু বিশ্রাম না নিলেই নয়। সকালে নাহয় ভালমত জেরা করা যাবে মেয়েটাকে।

'আমার ঘুম পেয়েছে,' মিশেলকে বলল ও। 'বিছানাটা তুমি নিতে পারো, আমি সোফায় শোব। আর হ্যাঁ, নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারো। রাতদুপুরে আমি তোমার ওপর হামলে পড়ব না।'

'জানি,' বলল মিশেল। 'তোমাকে দেখে ও-ধরনের মানুষ বলে মনে হয় না।' এই প্রথম ওর কণ্ঠে সম্ভ্রমের সুর ফুটল।

কাবার্ড থেকে একটা স্পেয়ার ব্ল্যাঙ্কেট বের করল রানা, ঝেড়ে নিল সোফাটা। মিশেল ততক্ষণে বিছানায় উঠে পড়েছে, কম্বলের তলায় ঢুকে খুলে ফেলেছে তোয়ালে, ওটা ফেলে দিয়েছে মেঝেতে। রানাকে চোখ ফেরাতে দেখে তাড়াতাড়ি কম্বলটা আরেকটু টানল, একেবারে তুলে ফেলল গলার কাছ পর্যন্ত; শরীরের তলায় এমনভাবে গুঁজল, যেন ওখানে আর কারও ঢোকার পথ বন্ধ করে দিচ্ছে। মুচকি হাসল রানা। কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল সোফায়। যতক্ষণ জেগে রইল, মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকল মিশেলের চিন্তা। অমন সুন্দরী একটা মেয়ে নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে কয়েক ফুট দূরে... নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। ব্র্যাণ্ডির প্রভাব টের পেতে শুরু করেছে রানা—গরম হয়ে উঠছে শরীর। ধ্যাত্তেরি বলে শেষমেশ কম্বল টেনে দিল মাথার ওপর। কপাল ভাল যে ক্লান্ত ছিল... একটু পরেই ঘুমিয়ে গেল ও।

জানালা দিয়ে সকালের রোদ ঘরে ঢুকতেই জেগে উঠল রানা। মিশেল তখনও ঘুমাচ্ছে। একটা হাত ভাঁজ করে তার ওপর মাথা রেখেছে ও। অন্য হাতটা গায়ের ওপর। কম্বলটা সরে যেতে যেতেও যায়নি, বুকের গভীর উপত্যকার ঝলক দেখিয়ে থিতু হয়ে আছে। ঘুমন্ত নারীর নিখুঁত প্রতিচ্ছবি, রেনেসাঁ যুগের আর্টিস্টরা যে-ধরনের ছবি আঁকত। বাথরুমে ঢুকে

পড়ল রানা। মুখ-হাত ধুয়ে নিল, শেভ করল, শাওয়ার সারল। যখন বেরুল, তখন মিশেল উঠে বসেছে।

‘গুড মর্নিং,’ হাসিমুখে বলল রানা। ‘ঘুম কেমন হয়েছে?’

‘ভাল।’ দর্শনীয় ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভাঙল মিশেল। ‘সরি, কাল রাতে খুব দুর্ব্যবহার করেছি তোমার সঙ্গে। আসলে খুব আপসেট হয়ে পড়েছিলাম। অচেনা এক পুরুষের সঙ্গে রাত কাটাতে হবে ভেবে একটু ভয়ও পাচ্ছিলাম। ও-ধরনের পরিস্থিতির একটাই পরিণাম হয়। কিন্তু... খাঁটি ভদ্রলোকের মত আচরণ করেছ তুমি। তা ছাড়া এখন মনে হচ্ছে, লিমের হাতে ধরা না দিয়েই বরং ভাল করেছি। লোকটাকে সুবিধের মনে হয়নি।’

‘এখন কি তা হলে বলবে, কেন ওর অফিসে ঢুঁ মেরেছিলে?’

ইতস্তত করল মিশেল। ‘ইয়ে... ব্যাপারটা ব্যক্তিগত...’

‘ও তোমার পূর্ব-পরিচিত?’ আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল রানা। ‘কখনও কাজ করেছ ওর হয়ে?’

‘অনেকটা সে-রকমই,’ বলল মিশেল। ‘সব খুলে বলব তোমাকে, কিন্তু এখন নয়। আগে আমাকে হাত-মুখ ধুয়ে একটু ভদ্রস্থ হতে দাও। তারমানে, আমার নতুন পোশাক লাগবে। সঙ্গে তো কিছুই নেই। তুমি একটু এনে দিতে পারবে? খিদেও পেয়েছে। কোথাও গিয়ে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করতে করতে নাহয় কথা বলা যাবে। কী বলো?’

‘আপত্তির কিছু দেখছি না,’ রানা বলল। ‘কী ধরনের পোশাক চাও?’

‘সিম্পল। জার্সি আর জিন্স হলেই চলবে। আর স্নিকারস্। হাই হিল জাতীয় কিছু এনো না। যা খরচ হবে, আমি পরে শোধ করে দেব।’

‘টাকার কথা ভেবো না। আমি দেখছি কী পাওয়া যায়।’ ঘড়ির দিকে তাকাল রানা। সাড়ে আটটা বাজে। ‘একটু

অপেক্ষা করতে হতে পারে। দোকানপাট এখনও খোলেনি বোধহয়।'

'অসুবিধে নেই, সকালবেলায় আমি বাথরুমে একটু বেশিই সময় নিই। তোমার দেরি হলে আমি নাহয় আরেকটু ঘুমিয়ে নেব। এখন উল্টো ঘোরো, আমি বিছানা ছাড়ব।'

ঘুরল রানা। কম্বলের তলা থেকে বেরিয়ে তোয়ালেটা কুড়িয়ে নিল মিশেল, গায়ে জড়িয়ে ঢুকে গেল বাথরুমে। বলল, 'যাবার সময় রুমের দরজা বন্ধ করে যেয়ো।'

পোশাক বদলে বেরিয়ে পড়ল রানা। গাড়িটা হোটেলের সামনে না রেখে একটু দূরে পার্ক করেছে। লিম যদি ওদের খোঁজে লোক পাঠিয়ে থাকে, তা হলে যেন গাড়ি দেখে হোটেল চিনতে না পারে। রাস্তাঘাট অবশ্য ফাঁকাই পেল ও, রেস না থাকায় আলস্য ভর করেছে পুরো শহরের ওপর। লোকজন খুব একটা বেরোয়নি, দোকানগুলোও খোলেনি। গাড়ি নিয়ে শহরের মূল রাস্তা ধরে দু'দফা চক্কর দিল রানা, শেষে একটা জেনারেল স্টোর পেল—মেয়েদের পোশাক আছে ওটায়। মিশেলের চাহিদা মোতাবেক একটা উলের জার্সি আর জিন্সের প্যান্ট কিনল। তবে স্নিকারস্ পাওয়া গেল না। স্যাণ্ডেল আছে, তা-ই কিনে নিল। কাজ চলে যাবে।

কেনাকাটা সেরে হোটেলে ফিরে এল রানা। রুমের সামনে পৌঁছুতেই থমকে গেল। দরজা খোলা। অথচ যাবার সময় মিশেলের কথামত লক করে গিয়েছিল ও। হাত থেকে শপিং ব্যাগ নামিয়ে রাখল রানা, জ্যাকেটের ভেতর থেকে বের করে আনল ওর পিস্তল। সন্তর্পণে ঢুকে পড়ল কামরায়। বিছানা খালি, বাথরুমের দরজা খোলা। টেবিলের ওপর পড়ে আছে রানার সুটকেস, তালা ভাঙা অবস্থায়। মিশেলের চিহ্ন নেই।

কী ঘটেছে বুঝতে অসুবিধে হলো না। সুকৌশলে রানাকে বাইরে পাঠিয়েছে মেয়েটা, এরপর ওরই সুটকেস থেকে শার্ট-

প্যান্ট নিয়েছে... সেগুলো গায়ে দিয়ে কেটে পড়েছে। ফ্রন্ট ডেস্কে ফোন করে নিশ্চিত হলো, বেঢপ পোশাকে সত্যিই এক ভদ্রমহিলা বিশ মিনিট আগে বেরিয়ে গেছেন। ধাওয়া করে লাভ হবে বলে মনে হয় না, এতক্ষণে পগার পার হয়ে গেছে। টাকা না থাকলেও ওর মত সুন্দরী একটি মেয়ের লিফট জোগাড় করতে কষ্ট হবে না। কোথায় যেতে পারে? কোলোন? মনে হয় না। বাকি সব কথার মত কোলোনে ওঠার কথাও মিথ্যে হবারই সম্ভাবনা বেশি।

থম হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল রানা—ভালই বোকা বানিয়েছে ওকে মেয়েটা। হঠাৎ কী যেন মনে পড়তে সচকিত হলো। ঝট্ করে তাকাল রেডিয়েটরের দিকে। পরমুহূর্তে তিক্ততায় ভরে গেল হৃদয়। খালি হাতে যায়নি মিশেল।

ছবিগুলো গায়েব।

নয়

হো হো করে গলা ছেড়ে হাসছে সোহেল আহমেদ—বিসিআই-এর চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, রানার প্রিয় বন্ধু। 'কী বললি? মেয়েটা তোকে বোকা বানিয়ে পালিয়ে গেছে? তাও আবার সারা রাত তোকে সোফায় ঘুমাতে বাধ্য করার পর? হা-হা, ভালই তো করেছে!'

এক ঘুষিতে সোহেলের নাকটা ফাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে রানার, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়, কারণ সোহেলকে সেলফোনের স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছে ও—স্কাইপিতে ভিডিও

কলের মাধ্যমে কথা হচ্ছে দু'জনের মাঝে। বিরক্ত গলায় রানা বলল, 'থামবি? এমনিতেই মন-মেজাজ ভাল নেই...'

'দাঁড়া, দাঁড়া, জাহেদ আর সলীলকেও ডাক দিই। ওরাও শুনুক ঘটনাটা। রমণীমোহন রানার করুণ পরিণতি! হা হা হা! তোর খেতাবটা বদলাতে হবে এবার।'

'খবরদার! কাউকে ডাকবি না!' ধমকে উঠল রানা। 'তোকে রিপোর্ট দিতে যাওয়াই ভুল হয়েছে দেখছি।'

না দিয়ে অবশ্য উপায়ও ছিল না। হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগ করামাত্র ও জানতে পেরেছে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিঙে যোগ দিতে গেছেন রাহাত খান। নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কাছে রিপোর্ট দিতে হবে বিদেশের সব এজেন্টকে। অগত্যা সোহেলকে কল করেছে ও—মিশনের অগ্রগতি সম্পর্কে ব্রিফ করার জন্যে।

'এক শর্তে সব চেপে যেতে পারি,' সোহেল বলল। 'ফেরার পথে বিদেশ থেকে আমার জন্যে দশ কার্টন সিগারেট আনবি।'

'কাস্টমসে আটকে দেবে,' বলল রানা।

'কীভাবে ছাড়াবি সেটা তুই জানিস। কিন্তু জেনে রাখ, সিগারেট না পেলে তোর কীর্তি আমি অফিসের নোটিসবোর্ডে টাঙিয়ে দেব।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। বলল, 'আচ্ছা, যা, নিয়ে আসব তোর সিগারেট।' আসলে নেবে না। জানে তো, বদমাশটা বেঈমানী করবে নির্ঘাত। কল শেষ হওয়ামাত্র জাহেদ আর সলীলকে ডেকে রসিয়ে রসিয়ে শোনাবে রানার গল্প। দেশে ফিরে শয়তানটাকে একটা প্যাঁদানি দিতে হবে, মনে মনে ঠিক করল ও। 'এখন কাজের কথায় আয়।'

'ঠিক আছে,' হাসি থামিয়ে সিরিয়াস হলো সোহেল। চোখ বোলাল পাশে রাখা কম্পিউটারের স্ক্রিনে। 'হুম,

আমাদের ডেটাবেজে মিশেল হাণ্টার নামে কোনও সিআইএ এজেন্টের তথ্য নেই। নামটা ভুয়া হতে পারে, তা ছাড়া এই ডেটাবেজও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। আমেরিকানদের ব্যাপার... বুঝিসই তো। রেকর্ডস্ সেকশনে বলে দেব, ওরা আরেকটু ভালমত খতিয়ে দেখবে। সমস্যা হলো, নাম আর চেহারার বর্ণনা ছাড়া আর কিছুই বলতে পারছিস না তুই। মোবাইলে একটা ছবি অন্তত তুলে রাখতে পারতি।'

'হ্যাঁ, সত্যিই ভুল হয়েছে,' স্বীকার করল রানা। 'লিমের অফিসে পাওয়া ছবিগুলোরও স্ন্যাপ নিয়ে রাখা উচিত ছিল।'

'ছবিগুলো তুই কোন্ আক্কেলে রুমে রেখে বাইরে গেলি, বল তো?'

'রেডিয়েটরের ওপর শুকাতে দিয়েছিলাম, বেরুবার সময় সঙ্গে নেবার কথা মনে পড়েনি। বললাম তো, ভুল করেছি।'

'বুঝেছি। কিন্তু আমেরিকান স্পেস প্রোগ্রামের সঙ্গে একজন ম্যানপাওয়ার টাইকুনের কী সম্পর্ক, সেটাই কথা।'

'কিছু তো আছে নিশ্চয়ই। নইলে ছবিগুলো তার ডেস্কে থাকবে কেন?'

'আমাদের ফাইলে কোনও কানেকশন পাওয়া যাচ্ছে না। অন্তত এই সেক্টরের সঙ্গে তার কোনও সংশ্লিষ্টতা নেই।'

'রিক্রুটিঙের ব্যবসা আছে তার,' মনে করিয়ে দিল রানা। 'হয়তো স্পেস প্রোগ্রামের জন্যে লোক সরবরাহ করে।'

'করলেও সেটা ঝাড়ুদার বা মজুর শ্রেণীর। আমেরিকায় মূলত ওসব কাজই করে তার লোকেরা। বিশেষ করে নিউ ইয়র্কের গার্বেজ কালেকশনে রয়েছে তার একক আধিপত্য। এ ছাড়া কনস্ট্রাকশন সেক্টরেও ভাল পজিশন রয়েছে তার—প্রচুর সরকারি কণ্ট্রাক্ট পায়। বলছি না যে, এ-দুটোই সব; ইন ফ্যাক্ট, কসাই থেকে শুরু করে এলিভেটর অপারেটর পর্যন্ত সব ধরনের নিচু আয়ের কাজেই লোক আছে লিমের। কিন্তু তাদের ভেতর কোনও মহাকাশ বিজ্ঞানী বা অ্যারোস্পেস

ইঞ্জিনিয়ার নেই।'

'কিন্তু একটা ছবিতে তিনজন কোরিয়ানকে রকেট তৈরির কাজ তদারক করতে দেখেছি আমি।'

'কী দেখেছিস তুই-ই জানিস। কোরিয়ান হলেই বা কী এসে-যায়? নাসায় তো প্রচুর বিদেশি লোক কাজ করে। তাদের সবাই নিশ্চয়ই লিমের সঙ্গে কানেক্টেড নয়? তা ছাড়া স্পেস প্রোগ্রাম নিয়ে এত ঢাক ঢাক গুড় গুড় করবারও কিছু নেই। আজকাল দুনিয়ার বহু দেশই রকেট-স্যাটেলাইট ইত্যাদি লঞ্চ করছে মহাশূন্যে। ওতে বিধি-নিষেধের বালাই নেই। পঞ্চাশের দশক হলেও নাহয় একটা কথা ছিল। তখন স্পেস-রেস চলছিল আমেরিকা আর রাশার মধ্যে—কে কার আগে মহাশূন্যে রকেট পাঠাতে পারে। ওসব নিয়ে বিস্তর গল্প-উপন্যাসও লেখা হয়েছে। এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন।'

'সেজন্যেই বেশি সন্দেহ হচ্ছে,' চিন্তিত গলায় বলল রানা। 'ওই ছবিগুলো নিয়ে কী করছিল লিম? কী প্ল্যান তার?'

'যা-ই হয়ে থাকুক, আমাদের অ্যানালিসিস বলছে, আমেরিকান কোনও লঞ্চসাইটে অ্যাকসেস নেই তার,' বলল সোহেল।

'ক'টা লঞ্চসাইট আছে ওদের?'

'বারোটা,' কম্পিউটার দেখে জানাল সোহেল। 'ফ্লোরিডা, ক্যালিফোর্নিয়া, নিউ মেক্সিকো আর ভার্জিনিয়ায় দুটো করে। এ ছাড়া একটা করে আছে আলাস্কা, নেভাদা, মিশিগান আর হাওয়াইয়ে।'

'এর ভেতর ক'টা দ্বীপে?'

'দুটো। হাওয়াইয়ে বার্কিং স্যাণ্ডস্ ফ্যাসিলিটি আর ওয়ালপ্স্ আইল্যাণ্ডের নেভাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি।'

সাগর থেকে তোলা ছবিটার কথা ভাবল রানা। হাওয়াই নয়, গাছপালা বা পরিবেশ মেলে না। সোহেলকে বলল, 'ওয়ালপ্স্ আইল্যাণ্ডের কোনও ছবি আছে তোর ওখানে?'

‘দাঁড়া, দেখাচ্ছি।’ কিবোর্ডের কয়েকটা বাটন টিপে একটা ছবি বের করল সোহেল। ‘এই যে... পাঠিয়ে দিলাম তোর ইমেইলে।’

ফোনে ইমেইল অ্যাকাউন্ট খুলে ছবিটা চেক করল রানা। সঙ্গে সঙ্গে হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে গেল ওর। কোনও ভুল নেই... গাছপালা, সাদা বিল্ডিঙের সারি আর লঞ্চপ্যাড... এখানকারই ছবি ছিল লিমের কাছে। সোহেলকে জানাল কথাটা।

‘তা-ই?’ অবাক হলো চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। ‘খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো!’

‘কেন ইন্টারেস্টিং?’

‘কারণ, আজ থেকে ঠিক চারদিন পর ওখান থেকে একটা রকেট লঞ্চ হবার কথা। নতুন একটা স্যাটেলাইট পাঠাচ্ছে আমেরিকানরা।’

‘কীসের স্যাটেলাইট?’

‘অফিশিয়াল প্রেস রিলিজে ওয়েদার মনিটরিঙের কথা বলেছে। তবে ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট বলছে, ওটা আসলে লঞ্চ করা হচ্ছে শত্রু দেশগুলোর ওপর নজরদারির জন্যে। সেটা অবশ্য ভেরিফায়েড রিপোর্ট নয়। গুজব বলতে পারিস।’

দু’য়ে দু’য়ে চার মেলাল রানা। বলল, ‘আমি একে কো-ইনসিডেন্স ভাবতে পারছি না। যখন আমেরিকা একটা স্পাই স্যাটেলাইট লঞ্চ করতে যাচ্ছে, ঠিক তখনই ওটার ছবি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে অ্যাণ্ডি লিম... এর ভেতর কিছু একটা থাকতে বাধ্য।’

‘চেক করে দেখতে চাস? চিফও সম্ভবত একই কথা বলবেন। চলে যা আমেরিকায়।’

‘ওয়ালপ্স্ আইল্যাণ্ডে ঢুকব কী করে? ওরা নিশ্চয়ই আমাকে বরণডালা সাজিয়ে অভ্যর্থনা জানাবে না?’

‘অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে কথা বল।’ অ্যাডমিরাল

জর্জ হ্যামিলটনের কথা বলছে সোহেল। তিনি আমেরিকার ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সি, সংক্ষেপে নুমা-র ডিরেক্টর। অত্যন্ত প্রভাবশালী মানুষ। 'উনি নিশ্চয়ই কোনও ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন। চিফকে আমি যা বলার বলে দেব।'

'ঠিক আছে, আমি এখুনি যোগাযোগ করছি তাঁর সঙ্গে।'

'সিগারেটের কথা ভুলিস না। ভাল ব্র্যাণ্ডের জিনিস আনবি কিন্তু!'

'খাবি মার! লাইন কাটছি।'

স্কাইপি অফ করে দিল রানা। ফোনবুক থেকে অ্যাডমিরালের নাম্বার বের করে কল বাটন চাপল। আমেরিকা থেকে বিদেশি কর্মী তাড়ানো, ওয়ালপ্‌স্‌ আইল্যাণ্ডে গোপন স্যাটেলাইট লঞ্চ, আর লিমের টেবিলে রকেটের ছবি... আর কোনও সন্দেহ নেই ওর মনে।

আমেরিকায় কিছু একটা ঘটাতে চলেছে লিম।

দশ

'দুঃখিত, মি. রানা, খামোকাই আপনি নিজের সময় নষ্ট করলেন... সেই সঙ্গে আমারও।'

কথাটা শুনে অবাক হলো না রানা। টানা দু'দিনের পথভ্রমণে ক্লান্ত ও—নিয়রবর্গ থেকে বার্লিন, বার্লিন থেকে নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্ক থেকে আবার ভার্জিনিয়া। স্থানীয় একটা মোটেলে উঠে ঘুমিয়েছে স্রেফ এক ঘণ্টা, তারপরেই

আবার ছুটে এসেছে ওয়ালপ্‌স্‌ আইল্যাণ্ডে। কিন্তু কমোডর ডেভিস পি. ব্যালফোরের অফিসে ঢোকামাত্রই আঁচ করতে পেরেছিল, এতসব কষ্ট বৃথা হতে চলেছে... পাত্তা দেয়া হবে না ওকে। বাস্তবেও তা-ই ঘটল।

হালকা-পাতলা গড়নের মানুষ কমোডর ব্যালফোর, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি—বর্তমানে ওয়ালপ্‌স্‌ আইল্যাণ্ডে নেভাল লিয়াজোঁ ও প্রজেক্ট অফিসারের দায়িত্ব পালন করছেন। আগাগোড়া খাঁটি সামরিক কর্মকর্তা। পরনে সামার ইউনিফর্ম—খাকি শার্টের বুকে শোভা পাচ্ছে তিন সারি রিবন... কর্মময় ক্যারিয়ারের স্বীকৃতি। একেবারেই কাঠখোট্টা লোক। চেহারায় রুক্ষতা। রানা অনুমান করল, এ-লোক নিজের চাইতে কাউকে বড় মনে করে না, দাম দেয় না কারও মতামতের। তার কথাই শেষ কথা... তার কথাই আইন। এ-ধরনের লোককে আপন সন্তানও সম্ভবত 'স্যর' বলে সম্বোধন করে।

গেটে রানাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন অপেক্ষাকৃত কমবয়েসী এক ভদ্রলোক। নিজের পরিচয় দিয়েছেন পিটার স্টরমেয়ার, বেজ ম্যানেজার বলে। তার কাছেই জেনেছে, এখানকার কর্মকাণ্ড দু'ভাগে বিভক্ত—কমোডর ব্যালফোর আছেন সামরিক অংশের দায়িত্বে, আর স্টরমেয়ার দেখাশোনা করেন সিভিলিয়ানদের কাজ। ব্যালফোরের তুলনায় স্টর-মেয়ারের আচরণ ছিল অনেকটাই ভদ্রোচিত।

'গুড টু মিট ইউ, মি. রানা,' হাত মিলিয়ে বলেছেন তিনি। 'ওয়াল্‌প্‌সে স্বাগতম। এই প্রথম এলেন বোধহয়?'

'জী।'

'আমিও নতুনের মত। এক বছর হলো আলাস্কা থেকে এসেছি। আসুন, প্লিজ। কমোডর ব্যালফোর অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে।'

কার পার্ক থেকে সাগরের পার ঘেঁষে একটা ওয়াকওয়ে

চলে গেছে ভেতরে। বাঁয়ে কয়েকটা ব্লকহাউস, আরেকটু সামনে এগোলে লঞ্চপ্যাড। থেমে টাওয়ারের দিকে তাকাল রানা—পঁচানব্বুই ফুট উঁচু কাঠামোটার পাশে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে একটা রকেট, রূপালি শরীর ঝলমল করছে সূর্যের আলোয়। আকাশের পানে ছুটে যেতে তৈরি। রোমাঞ্চ অনুভব করল ও, গোড়ার রকেট মোটর থেকে শুরু করে তীক্ষ্ণ নাকের ডগা পর্যন্ত পুরোটাই অমিত শক্তি আর সম্ভাবনার এক অপূর্ব প্রদর্শনী—মনের ভেতর একই সঙ্গে বিস্ময় আর শ্রদ্ধা জাগায়। আর মাত্র দু'দিন পর উৎক্ষেপণ... রকেটটাকে ঘিরে তাই ব্যস্ততার সঙ্গে কাজ করছে ইঞ্জিনিয়ার আর টেকনিশিয়ানের দল, দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন পুজো করছে বিজ্ঞানের চরমতম উৎকর্ষকে।

'অসাধারণ, কী বলেন?' পাশ থেকে বললেন স্টরমেয়ার, রানার দৃষ্টিকে অনুসরণ করছেন। গলায় আন্তরিকতা। 'অনেকদিন থেকেই আছি এ-পেশায়, তারপরেও প্রতিবারই মুগ্ধ হই আমরা কতটা এগিয়ে গেছি, তা ভেবে। সেই দিন দূরে নয়, যখন দূর-দূরান্তের গ্যালাক্সিও আমাদের নাগালে চলে আসবে। লঞ্চের সময় পর্যন্ত আপনি থাকছেন তো?'

'বলতে পারছি না,' রানা বলল।

'থাকলে ভাল করবেন। আগে যদি সামনাসামনি দেখে না থাকেন, রকেট লঞ্চের দৃশ্যটা সত্যিই এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা।'

রানা অবশ্য দেখেছে... মহাকাশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও আছে ওর, তবে তা আর বলতে গেল না। ভদ্রলোকের মুগ্ধতার আবেশ নষ্ট হবে তাতে।

নীরবে ওয়াকওয়ে ধরে হাঁটতে শুরু করল দু'জনে। বেশ গরম পড়েছে, মেঘহীন আকাশ থেকে অনল বর্ষণ করছে সূর্য। এক রত্তি বাতাস নেই। লঞ্চিঙের আদর্শ পরিবেশ, ভাবল রানা।

'ইয়ে... কমোডর ব্যালফোরের ব্যাপারে আপনাকে

কয়েকটা কথা বলা দরকার,’ হঠাৎ বললেন স্টরমেয়ার, কণ্ঠে ক্ষমাপ্রার্থনার সুর। ‘এ-মুহূর্তে খুবই চাপের মধ্যে আছেন তিনি... লঞ্চের মাত্র তিনদিন বাকি কিনা। আমাদের সবারই কমবেশি একই অবস্থা। কাজেই নুমা থেকে যখন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আপনার খবর পাঠালেন, সেটা খুবই বাজে একটা সময়ে এসেছে। না, না, আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। আসলে, পরিস্থিতিটা স্রেফ বোঝাতে চাইছি আর কী। কমোডরকে একটু বিরক্ত মনে হতে পারে আপনার কাছে...’

‘সেটা কি স্বাভাবিক? আমি তো বেড়াতে আসিনি।’

‘আমি সে-কথা বলিনি। স্রেফ পরিস্থিতিটা বললাম। এমনিতে উনি বেশ ভাল মানুষ। পাক্কা প্রফেশনাল। ইরাকের যুদ্ধে ব্রোঞ্জ স্টার পেয়েছেন। আমার চেয়ে এক বছর আগে এসেছেন এখানে, তখন থেকে বেজের সিকিউরিটি, শৃঙ্খলা আর কাজের পরিবেশের অনেক উন্নতি করেছেন। আগে যে কী অবস্থা ছিল, কল্পনা করতে পারবেন না। একটা লাইট বালব বদলাতে গেলেও অন্তত পাঁচটা অফিস আর দুটো কমিটির অনুমোদন নিতে হতো। কমোডর আসার পর ওসব বাদ দিয়েছেন, এখন সব কিছু সরাসরি তাঁর কাছে যায়। তাই বলছি, যদি একটু রুক্ষ আচরণ করেন, সেটা ব্যক্তিগতভাবে নেবেন না।’

কমোডরের অফিসে ঢুকতেই সেই রুক্ষ আচরণের নমুনা পেয়েছে রানা। চেয়ার ছেড়ে সৌজন্যবশত দাঁড়াননি পর্যন্ত তিনি, প্রথম নজরেই বুঝিয়ে দিয়েছেন, রানাকে উটকো ঝামেলা ছাড়া আর কিছু ভাবছেন না। আভাসে-ইঙ্গিতে বলেও দিয়েছেন, স্রেফ অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের অনুরোধে দেখা করতে রাজি হয়েছেন, নইলে রানাকে দ্বীপের চৌহদ্দিতে পা রাখতে দিতেন না।

‘যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন,’ দায়সারা ভঙ্গিতে কুশল বিনিময় শেষে বলেছেন অ্যাডমিরাল।

সংক্ষেপে অ্যাণ্ডি লিম সম্পর্কে তাঁকে জানিয়েছে রানা। জার্মানিতে তার দুর্গে পাওয়া ছবি, আর সেগুলোর কারণে কী ধরনের আশঙ্কা জেগেছে ওর মনে, খুলে বলেছে সব। নিরাসক্ত চেহারা নিয়ে ওর কথা শুনেছেন ব্যালফোর; চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, কোনও প্রভাব পড়ছে না তাঁর মাঝে। রাগে একেকবার চিৎকার করতে ইচ্ছে হয়েছে রানার—অর্ধেক পৃথিবী পাড়ি দিয়ে এ-ধরনের প্রতিক্রিয়া পাবার জন্যে আসেনি ও। যদিও নিরেট কোনও প্রমাণ নেই, তারপরেও বিপদের আভাস পাচ্ছে রানা। তাতে কান না দিয়ে মস্ত ধোকামি করছেন ভদ্রলোক।

অবশেষে, রানার কথা শেষ হবার পর, মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ড ভেবেছেন ব্যালফোর। জানিয়ে দিয়েছেন একপেশে মতামত—ও নাকি নিজের ও তাঁর সময় বরবাদ করেছে।

'এমন ধারণা আপনার কেন হলো, জানতে পারি?' শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল রানা।

'দেখুন, আপনার কথার সারমর্ম একটাই—জার্মানির এক দুর্গে আপনি কিছু ফটো দেখতে পেয়েছেন। সেখান থেকে যে-ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, তা একেবারেই অযৌক্তিক। অনেক কারণেই ওই ছবিগুলো থাকতে পারে ওখানে। সেগুলো যে আমাদের আগামী লঞ্চেরই ছবি, তাও নিশ্চিত হবার উপায় নেই। রকেট তো সব দেখতে একই রকম, তাই না? সবচেয়ে বড় কথা, ওই অ্যাণ্ডি লিম লোকটা কেন আমাদের ক্ষতি করতে যাবে? ওর কী লাভ তাতে?'

'লাভ-ক্ষতির হিসেব পরে করলে হয় না? বিপদের সম্ভাবনা যখন দেখা দিয়েছে, আগে সেটাকে সামলানো জরুরি।'

'ঠিক কী চাইছেন আপনি আমার কাছে?' ব্যালফোর স্পষ্টতই বিরক্ত।

'আমি কিছুই চাইছি না, স্যর,' বলল রানা। 'শুধু

আপনাদেরকে সতর্ক করে দিতে এসেছি। তবে যদি পরামর্শ চান, আমি বলব লঞ্চটা কিছুদিনের জন্যে পিছিয়ে দিতে।'

'সে প্রশ্নই আসে না।'

'আমিও একমত, মি. রানা,' ব্যালফোরের কথায় সায় জানালেন স্টরমেয়ার। 'কাজটা সহজ নয়। এসব সিদ্ধান্ত অনেক ওপরের লেভেল থেকে আসে। আমরা চাইলেই একটা উৎক্ষেপণ থামিয়ে দিতে পারি না।'

'কিন্তু বিপদের কথা তো জানাতে পারেন ওঁদেরকে!'

'কীসের বিপদ? এখন পর্যন্ত তো সেটাই বুঝতে পারলাম না।' বিরক্ত গলায় বললেন ব্যালফোর। 'আপনিই বলুন, ওই কোরিয়ান টাইকুন কী করতে চাইছে?'

'নির্দিষ্টভাবে বলতে পারব না,' বলল রানা। 'হতে পারে সে আপনাদের প্রোগ্রাম স্যাবোটাজ করতে চাইছে।'

'কীভাবে তাতে সফল হবে, বলতে পারেন? একটা রকেট লঞ্চিং মুখের কথা নয়। তিন দফা অ্যাকসেপ্ট্যান্স টেস্ট করি আমরা—ইঞ্জিন, পাওয়ার প্ল্যান্ট আর সলিড প্রপেল্যান্ট কম্পোনেন্টের। এরপর আছে নানা রকম সিস্টেমস্ টেস্ট। প্রপালশন, স্ট্যাবিলাইজেশন আর সমস্ত কন্ট্রোলের জন্যে রয়েছে স্ট্যাটিক টেস্ট। বলতে চাইছেন, তারপরেও কিছু মিস করে যাব আমরা? অ্যালাইনমেন্ট টেস্ট করা হবে, সিস্টেম ফাংশানাল টেস্ট করা হবে... ফর গড'স্ সেক, ইনস্ট্রুমেন্টগুলোর ক্যালিব্রেশনের জন্যে মাইক্রোস্কোপিক টেস্ট পর্যন্ত করব আমরা!'

'আমি বলছি না আপনাদের কাজে কোনও খুঁত আছে,' শান্ত গলায় বলল রানা।

'ধন্যবাদ, মি. রানা। তারপরও ধরা যাক, ভুল করলাম আমরা। হতেই পারে, অতীতে একাধিক লঞ্চ-রিলেটেড দুর্ঘটনার উদাহরণ আছে... হাজারো সতর্কতার পরও। এবার নাহয় কেউ স্যাবোটাজ করতে এল। কিন্তু কথা হলো, কেন

করবে? নির্দোষ একটা রকেট ধ্বংস করে কী লাভ তার?'

'নির্দোষ?' বাঁকা সুরে বলল রানা। 'আমি তো শুনলাম, আপনারা একটা স্পাই স্যাটেলাইট পাঠাচ্ছেন ওই রকেটে।'

একটু থমকে গেলেন ব্যালফোর। কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, 'ওটা গুজব। কান না দিলেই ভাল করবেন। তা ছাড়া যদি স্পাই স্যাটেলাইটও হয়ে থাকে, তাতে ম্যানপাওয়ার সেক্টরের একজন টাইকুনের শঙ্কিত হবার কিছু নেই।'

'এমন হতে পারে না, যাদের ওপর নজরদারির চেষ্টা করছেন, তাদের কেউই ভাড়া করেছে তাকে?'

'আপনি অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলছেন, মি. রানা। কোনও প্রমাণ আছে আপনার হাতে?'

'তা নেই। কিন্তু তাই বলে ব্যাপারটা এত হালকাভাবে নেয়াও উচিত হচ্ছে না আপনার। রকেটটা যদি কোনও জনবহুল এলাকায় ক্র্যাশ করে, কত মানুষ মারা যাবে, তা জানেন?'

'সে-রকম কোনও সম্ভাবনাই নেই, মি. রানা। একটা মানুষও মরবে না। আনম্যানড্, মানে মনুষ্যবিহীন রকেট পাঠাচ্ছি আমরা। কোনও যাত্রী নেই। আর জনবহুল এলাকায় ক্র্যাশের কথাই যদি তোলেন... সেণ্ট্রাল কণ্ট্রোল থেকে আমাদের সেফটি অফিসার প্রতিটা মুহূর্ত মনিটর করবে রকেটকে। যদি কোনও ধরনের ত্রুটি দেখতে পায়, কিংবা রকেটের ট্র্যাজেক্টরি এদিক-ওদিক হয়... মানে, ল্যাণ্ড-বেজড ইম্প্যাক্টের যদি বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও দেখা দেয়, *ইগনিস মর্টেম*-এর সুইচ টিপে দেবে।'

'কী সেটা?'

'সেলফ-ডেস্ট্রাক্ট মেকানিজম, মি. রানা। সব রকেটেই রাখি আমরা। বিপদ দেখা দিলে অ্যাক্টিভেট করা হয়। রকেট তখন বিস্ফোরিত হয়—খণ্ডগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যায় আপার

অ্যাটমোস্ফিয়ারের সঙ্গে ঘর্ষণে। সেজন্যেই কোডনেম রেখেছি—ইগনিস মর্টেম। শব্দদুটো ল্যাটিন, সোজা অর্থ করলে অগ্নিমৃত্যু বলা যেতে পারে।' ঘড়ি দেখলেন ব্যালফোর। 'যা হোক, আশা করি সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছেন? এবার তা হলে...'

'দাঁড়ান, আমার কথা এখনও শেষ হয়নি।' কমোডরকে এত সহজে ছাড়তে রাজি নয় রানা। 'রকেটের ব্যাপারে আপনি নানা ধরনের চেকের কথা বললেন, কিন্তু এই বেজে নিশ্চয়ই শত-শত লোক কাজ করছে। তাদের যে-কাউকেই ঘুষ দিয়ে বা ব্ল্যাকমেইল করে দলে ভেড়ানো যেতে পারে। আপনার সেফটি অফিসারই যে বিক্রি হয়ে যায়নি, তার কী গ্যারাণ্টি?'

'খুবই আপত্তিকর একটা কথা বললেন আপনি, মি. রানা,' চেহারায় মেঘ জমল ব্যালফোরের। 'সেফটি অফিসার পল ফ্রিম্যান ও তার পরিবারকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। তা ছাড়া এখানে যত লোক কাজ করে, তাদের সবার ব্যাকগ্রাউণ্ড আমি নিজে চেক করে দেখেছি। কারও বিশ্বস্ততা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই।'

'তারমানে আপনাদের সব কাজ ঠিকঠাকমত এগোচ্ছে? গত কয়েক সপ্তাহ বা মাসে একটাও অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেনি?'

'না।'

খুক খুক করে কেশে উঠলেন স্টরমেয়ার। 'কিছু মনে করবেন না, স্যর,' বললেন তিনি, 'ফিনিঙ্গারের ঘটনাটা বোধহয় আপনি ভুলে গেছেন।'

'ড্যাম ইট, স্টরমেয়ার!' ডেস্কের ওপর রাগে কিল বসালেন ব্যালফোর। 'ফিনিঙ্গারের ঘটনার সঙ্গে আমাদের বেজের কোনও সম্পর্ক নেই—পুলিশ তা কনফার্ম করেছে। আর তুমি কিনা সে-প্রসঙ্গ তুলে বাইরের লোকের সামনে

আমাকে বিব্রত করছ... তাও আবার আমারই অফিসে বসে?'

'কী ঘটেছিল?' কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল রানা।

'বলার প্রয়োজন দেখছি না,' কমোডরের গলায় রুক্ষতা, 'চাইলে নিজে খোঁজ নিয়ে জানবেন। যা হোক, কাজের কথায় আসুন। আপনার সমস্ত সন্দেহের মূলে রয়েছে কিছু ফটোগ্রাফ, এই তো? কোথায় সেগুলো?'

'সঙ্গে নেই।'

'আনেননি কেন?'

'ওগুলো চুরি হয়ে গেছে,' তিক্ত গলায় বলল রানা। তবে ব্যালফোরের চেহারা দেখে মনে হলো, খবরটা তিনি আগে থেকেই জানেন।

মৃদু হাসি ফুটল তাঁর ঠোঁটের কোণে। হাত বাড়িয়ে ডেস্কের একটা ড্রয়ার খুললেন, বের করে আনলেন কিছু ফটো, মেলে ধরলেন রানার সামনে।

'দেখুন তো, এগুলো কি না?'

এক দেখাতেই চিনল রানা—সেই ছবিগুলোই। পার্থক্য এটুকু যে, ব্যালফোর যেগুলো মেলে ধরেছেন, সেগুলো অরিজিনাল নয়। শ্লস ব্রনসার্ট দুর্গ থেকে আনা ছবি থেকে কপি করা হয়েছে—পানিতে ভেজার দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওগুলোর গায়ে।

'কোথায় পেয়েছেন এগুলো?' রানা গম্ভীর হয়ে গেছে। 'মিশেল হাণ্টারের কাছ থেকে?'

'ওই নামে কাউকে চিনি না আমি।'

'তা হলে? কে দিয়েছে?'

'সেটা আপনার না জানলেও চলবে,' বললেন ব্যালফোর। 'এটুকু জানুন, ছবিগুলো আপনি আসার চব্বিশ ঘণ্টা আগেই পেয়েছি আমি। যথেষ্ট স্টাডিও করেছি। এবং বুঝতে পেরেছি—এগুলো ভুয়া। নকল।'

'নকল?' অবাক হলো রানা।

‘বেজের ছবিগুলো অথেনটিক। ওগুলো ইন্টারনেটেই পাওয়া যায়। তবে এটা...’ একটা ছবি আলাদা করলেন কমোডর, যেটায় তিন কোরিয়ান একটা নির্মাণাধীন রকেটের কাজ তদারক করছে, ‘...সম্পূর্ণ ভুয়া। জানি না আপনি কী ভাবছেন, তবে এটার সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই।’

‘কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছেন?’

‘কারণ আমাদের বেজে কোনও চাইনিজ সুপারভাইজর নেই।’

‘এরা কোরিয়ান। চেহারার বৈশিষ্ট্যগুলো কোনও বিশেষজ্ঞকে দিয়ে দেখালেই বুঝতে পারবেন।’

‘ওই হলো! আমাদের বেজে কোনও কোরিয়ান, জাপানি বা চাইনিজ... মানে ওরিয়েন্টাল লোক নেই। কিচেন বা লণ্ড্রিতে অবশ্য দু-একজন থাকলেও থাকতে পারে... কিন্তু হ্যাঙারে তাদের অ্যাকসেস নেই। তা ছাড়া, ছবির হ্যাঙারটাও আমাদের নয়।’

‘কিন্তু রকেটটা তো আমেরিকান!’

‘না, মি. রানা। আমি তা মনে করি না। দেখতে কিছুটা সে-রকম দেখাচ্ছে হয়তো, ছবিটা অস্পষ্ট বলে পার্থক্যগুলো ধরিয়ে দিতে পারছি না, কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, এটা আমাদের রকেট নয়। হলে আমি জানতাম। আমেরিকান সমস্ত স্পেস প্রোগ্রামের খবর রাখতে হয় আমাকে। সেজন্যেই একটু আগে বলছিলাম, অযথা সময় নষ্ট করছেন আপনি।’

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন কমোডর—সাক্ষাৎকার-পর্ব শেষ হবার ইঙ্গিত। ছবিগুলোর দিকে শেষবারের মত তাকাল রানা। তবে কি মিশেল এন.আর.এল.-এর হয়ে কাজ করছিল? তা হলে শুরুতেই সেটা বললেন না কেন ব্যালফোর? সরাসরি বললেই পারতেন, জার্মানির ঘটনা তিনি জানেন... খামোকা রানার মুখে সব শুনতে গেলেন কেন? বিভ্রান্ত বোধ করল ও। উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াল। কিন্তু

হ্যাণ্ডশেক করলেন না কমোডর।

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি, মি. রানা। তাই এতক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনেছি আপনার কথা,' কঠিন গলায় বললেন তিনি। 'কিন্তু জেনে রাখুন, আমার বেজে এসে আমাকেই আপনি যেভাবে জ্ঞান দেবার চেষ্টা করলেন, তা আমি মোটেই ভালভাবে নিইনি। আমরা অ্যামেচার নই, নিজেদের কাজ খুব ভালই বুঝি। অনুমানের বশে মিথ্যে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে কাজটা ভাল করলেন না। এমনিতেই দম ফেলার ফুরসত পাচ্ছি না, এ-অবস্থায় এসব কথা যদি কোনোভাবে হায়ার অথরিটির কানে পৌঁছে... কী পরিমাণ চাপ বাড়বে আমাদের, কল্পনা করতে পারেন?'

'আপনাদের কোনও অসুবিধে করে থাকলে আমি দুঃখিত,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল রানা। মেজাজ খিঁচড়ে গেছে। উপকার করতে এসে এ-ধরনের অপমান মেনে নেয়া কঠিন।

'আপনি এখন আসতে পারেন। মি. স্টরমেয়ার আপনাকে কার পার্ক পর্যন্ত এগিয়ে দেবে। আর কখনও ফিরে না আসলে খুশি হব।'

ব্যালফোরের অফিস থেকে বেরিয়ে এল রানা। ওয়াকওয়ে ধরে ফিরতে থাকল কার পার্কে। স্টরমেয়ার পাশে হাঁটছেন। খানিক পর নিচু গলায় তিনি বললেন, 'কমোডরের আচরণের জন্যে আমি দুঃখিত, মি. রানা।'

একটু হাসল রানা। 'ক্ষমা চাইছেন কেন? আপনি তো আগেই আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন।'

'তাও... আরেকটু সৌজন্য দেখাতে পারতেন তিনি।'

'বাদ দিন তো। আসল কথায় আসুন। কী যেন একটা ঘটনার কথা বললেন ওখানে... কী সেটা?'

ইতস্তত করলেন স্টরমেয়ার। 'ইয়ে... কমোডর জানতে পারলে খুব রাগ করবেন...'

'দেখুন, খোঁজ আমি এমনিতেই নেব। তাতে কমোডর

আরও খেপবেন। তারচেয়ে যদি আপনিই বলে দেন, গোপনীয়তা বজায় রাখতে সুবিধে হবে। ভয় নেই, আমি কাউকে আপনার কথা বলব না।'

এবার স্টরমেয়ারও হাসলেন। 'না, না, ব্যাপারটা অত সিরিয়াস কিছু না। জোসেফ ফিনিঙ্গার নামে আমাদের এক সুপারভাইজর ছিল, সে কয়েকদিন আগে মারা গেছে।'

'কীভাবে?'

'খুন। পুলিশ বলছে, পারিবারিক কোন্দল। তারই জের ধরে ওর বউ ওকে ছুরি মেরে খুন করে, তারপর আগুন ধরিয়ে দেয় পুরো বাড়িতে। পত্রিকায় বেশ লেখালেখি হয়েছে এ-নিয়ে। বোঝেন তো, রগরগে কাহিনী পেলে যা হয়। মেয়েটাও খুব সুন্দরী ছিল, ফিনিঙ্গারের অর্ধেক বয়সী। বুড়ো জামাইয়ের ওপর অভক্তি চলে আসায় খুন করেছে তাকে, তারপর বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে গাড়ি নিয়ে। তবে কমোড়র ব্যালফোরের কথাই ঠিক—ওই ঘটনার সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই।'

'এখানে কী কাজ করত ফিনিঙ্গার?'

'জেনারেল সুপারভাইজর।'

'রকেটে অ্যাকসেস ছিল তার?'

'তা তো থাকবেই। কিন্তু আপনি হঠাৎ ওকে নিয়ে উৎসাহী হয়ে উঠলেন কেন? বললাম তো, সাধারণ ক্রাইম। স্ত্রীর হাতে স্বামী খুনের ঘটনা। যদ্দূর জানি, মেয়েটা এখনও ধরা পড়েনি। পড়লেই কেসটা চুকে-বুকে যাবে।'

'ফিনিঙ্গারের ঠিকানা জানেন? একবার ঢুঁ মেরে আসব ভাবছি। হাতে তো আর কোনও কাজ নেই।'

'রেইনবো লেইন, স্যালিসবারি। বাড়ির নম্বর মনে নেই, তবে গেলেই দেখতে পাবেন। পুরোটাই পুড়ে গেছে কিনা। আপনি কি আশপাশেই থাকবেন আগামী কয়েকদিন?'

'এখনও জানি না,' বলল রানা। চিন্তিত। কী করবে

ভাবছে। কমোডর ব্যালফোরের কাছে যে চিড়ে ভিজবে না, তা বোঝা হয়ে গেছে। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের মাধ্যমে আরও ওপরের লেভেলের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে। কিন্তু তার আগে জোসেফ ফিনিঙ্গারের কেসটা একটু নেড়ে-চেড়ে দেখা দরকার। কেন যেন মন খুঁতখুঁত করছে ওর।

গাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। স্টরমেয়ার বললেন, 'লঞ্চ পর্যন্ত যদি থাকেন তো বলবেন। আমি আপনার জন্যে একটা পাস জোগাড় করে দেব।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, মি. স্টরমেয়ার,' হাত বাড়িয়ে দিল রানা।

'আপনাকেও ধন্যবাদ,' স্টরমেয়ার হাত মেলালেন। 'সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন, তা বুঝতে পেরেছি। কমোডর আপনার কথা আরেকটু মনোযোগ দিয়ে শুনলে হয়তো ভাল করতেন।'

'সাবধানে থাকবেন। বিদায়।'

'বিদায়, মি. রানা।'

আধ মাইল দূরে, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে একটা সাদামাঠা চেহারার টয়োটা সেডান। সেটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুট-পরিহিত এক লোক। এন.আর.এল.-এর গেট দিয়ে রানার গাড়িটা বের হতেই হাতের পত্রিকাটা বনেটের ওপর নামিয়ে রাখল—এতক্ষণ ওটার পাতায় ছাপা ক্রসওয়ার্ড পাযল মেলাচ্ছিল সে। এবার গলায় ঝোলানো শক্তিশালী বিনোকিউলারটা চোখে তুলল, ফোকাস করল রানার গাড়ির দিকে।

না, কোনও ভুল নেই... যার ছবি পাঠানো হয়েছে তাকে, সে-ই চালাচ্ছে গাড়ি। মাসুদ রানা—বাংলাদেশ কাউণ্টার ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট। জার্মানিতে পাওয়া ছবির গন্ধ শুঁকে

সত্যি সত্যি পৌঁছে গেছে ওয়ালপ্‌স্‌ আইল্যাণ্ডে। তাড়াতাড়ি নিজের গাড়িতে উঠে বসল স্মিথ। একটু পরেই রানা পেরিয়ে গেল তাকে।

স্মিথও তার গাড়ির ইঞ্জিন চালু করল। গিয়ার দিয়ে উঠে এল রাস্তায়। পিছু নিল রানার।

এগারো

ওয়ালপ্‌স্‌ আইল্যাণ্ড থেকে মোটেলে ফিরল রানা। কামরায় ঢুকে ফোন করল স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে, ফিনিঙ্গারের কেস সম্পর্কে আরেকটু খোঁজখবর নেবে। নিজের পরিচয় দিল প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর বলে। দেখা গেল স্টেশনের ইনচার্জ রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির সুনাম সম্পর্কে অবগত, সাহায্য করতে আপত্তি করলেন না। বলে দিলেন, রানা যখন স্যালিসবারিতে যাবে, কেসের ইনভেস্টিগেটিং অফিসারকে পাঠিয়ে দেবেন ওখানে।

বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে বেরুল রানা। কাছের একটা ডাইনারে গিয়ে ঢুকল। ডাইনারের কফিটা জঘন্য, তবে খাবারের মান একেবারে মন্দ নয়। ক্ষুধা নিবারণের পর বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এল ও। উঠে পড়ল গাড়িতে। ফোনের ম্যাপ থেকে স্যালিসবারির অবস্থান দেখে নিল, তারপর রওনা হলো ওদিকে।

ফিনিঙ্গারের বাড়িটা আগুনে পুড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বাড়ি বলে চেনা যায় না আর, প্রথম দেখায় মনে

হলো, কয়েক ট্রাক ছাই আর পোড়া জঞ্জাল যেন ঢেলে দিয়ে গেছে কেউ। আশপাশের বাড়িগুলোর সামনে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে এল রানা—প্রত্যেকটাই ছিমছাম, পরিপাটি। সামনে সবুজ লন, পিকেট ফেন্স দিয়ে ঘেরা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে বলে বাইরে তেমন মানুষ নেই, তবে কল্পনার চোখে দেখল—বাড়িগুলোর আঙিনায় খেলাধুলা করে বাচ্চারা, বয়স্করা বারান্দায় বসে বিশ্রাম করে। একেবারে আদর্শ আবাসিক এলাকা বোধহয় এগুলোকেই বলে। এখানে মিলেমিশে থাকে সবাই; ঝগড়াঝাঁটি বা অশান্তি যা হয়, সবই বাড়ির ভেতরে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। ফিনিঙ্গারের পোড়া বাড়ি তার ব্যতিক্রম। এলাকার শান্ত-সৌম্য রূপটাকে যেন কাঁচের আয়নার মত চুরমার করে দিয়েছে ওটা।

গাড়ি থামিয়ে নেমে এল রানা। বাতাসে আবছা একটা পোড়া গন্ধ ভাসছে, বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ডের পর যেমনটা ভাসে। লনের ঘাস অবশ্য আবার বেড়ে উঠতে শুরু করেছে, যেন চেষ্টা করছে বাড়ির ধ্বংসাবশেষকে গিলে খেতে। পুলিশের হলুদ টেপ দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে জায়গাটা, সেটা পার হলো না ও। এগিয়ে গিয়ে লাভও নেই। দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছে, ধ্বংসস্তূপের ভেতর ফার্নিচার বা অন্যান্য যত মূল্যবান জিনিস ছিল, সবই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। খুব শীঘ্রি বুলডোজার এনে বাকিটাও মিশিয়ে দেয়া হবে মাটিতে। এরপর সবাই ভুলে যাবে ফিনিঙ্গার ও তার স্ত্রীর কথা।

পেছনে একটা গাড়ি এসে থামল। ঘাড় ফেরাতেই একটা শেভ্রোলে ক্রুজার দেখতে পেল রানা, গায়ে বড় বড় হরফে স্যালিসবারি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের নাম লেখা রয়েছে। স্থূলদেহী এক অফিসার নেমে এল ওটা থেকে—গায়ে ইউনিফর্ম, বুকে পুলিশের ব্যাজ। বন্ধুত্বপূর্ণ চেহারা... ছোটখাট এলাকার পুলিশের যেমন হয়।

'মি. মাসুদ রানা?' কাছে এসে জিজ্ঞেস করল অফিসার।

'জী। আপনি?'

'সার্জেন্ট টেনিসন।' হাত বাড়িয়ে দিল লোকটা। 'নাইস টু মিট ইউ।'

'ধন্যবাদ,' করমর্দন করল রানা। 'আপনি কি ফিনিঙ্গার কেসের ইনভেস্টিগেটিং অফিসার?'

'হ্যাঁ। বলুন, কীভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'এখন পর্যন্ত যা যা জেনেছেন, সেগুলো বললে কৃতজ্ঞ বোধ করব।'

'বেশ,' কাঁধ ঝাঁকাল টেনিসন, 'ফিনিঙ্গার নামে এক দম্পতি থাকত এখানে—জোসেফ ফিনিঙ্গার ও তার স্ত্রী জুলিয়া। দু'জনেই সাদাসিধে, খুব একটা মেলামেশা করত না প্রতিবেশীদের সঙ্গে। তবে বেশ কয়েক বছর ধরে ছিল তো, সবাই কমবেশি চিনত তাদের—চার্চ বা বাজারে দেখা-সাক্ষাতের সূত্র থেকে। সুখী দম্পতি বলেই তাদেরকে জানত সবাই। টাকা-পয়সার টানাটানিও ছিল না। ওদের সম্পর্কে কোনও খারাপ কথা বলেনি কেউ।' প্রাণহীন গলায় কথা বলছে সার্জেন্ট... বোঝা মুশকিল, খুনের কেসের বিবরণ দিচ্ছে, নাকি কোনও পার্কিং অফেন্সের। 'মিসেস ফিনিঙ্গার টেক্সাসের মেয়ে, তবে শুনেছি জোসেফের সঙ্গে নিউ মেক্সিকোতে পরিচয় হয়েছিল তার। ওখানে একটা ককটেল বারে ওয়েইট্রেসের কাজ করত। জোসেফ ফিনিঙ্গার আসলে জার্মান, আমেরিকায় এসেছে বিশ বছর আগে। নাগরিকত্বও পেয়েছিল। ওয়ালপ্‌স্‌ আইল্যাণ্ডে কাজ করত সে।'

'আপনারা নিশ্চিত, খুনটা মিসেস ফিনিঙ্গার করেছে?'

'আর কে? ফরেনসিক এভিডেন্স বলছে, কিচেনে ছুরি মারা হয়েছে তাকে, আত্মরক্ষার কোনও চেষ্টা করেনি সে। তারমানে খুনি তার পরিচিত। সে-সময় বাড়িতে মিসেস ফিনিঙ্গার ছাড়া আর কেউ ছিল না। তা ছাড়া, খুন যদি না-ই করে থাকে তো পালিয়ে যাবে কেন?'

‘পালাবার ব্যাপারটা জেনেছেন কী করে?’

‘পড়শিদের একজন তাকে গাড়ি চালিয়ে চলে যেতে দেখেছে। সঙ্গে সুটকেস ছিল। ততক্ষণে বাড়িতে আগুন ধরে গেছে, অথচ মিসেস ফিনিঙ্গার পুলিশ বা ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয়নি। এরপর তো আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আমরা ওদের ফিনানশিয়াল ডিটেইলস্ চেক করেছি। বাড়িটা দ্বিতীয়বারের মত মর্টগেজ দেয়া হয়েছে, আর সে-টাকা রিসিভ করেছে মিসেস ফিনিঙ্গার। ব্যাঙ্কে একটা জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট ছিল ওদের; ঘটনার দিন সকালে ওখান থেকে সব টাকাও তুলে নিয়েছে সে। পালাবার প্রস্তুতি আর কী। একেবারে প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে কাণ্ডটা ঘটিয়েছে।’

‘খুবই ঠাণ্ডা মাথায়,’ মন্তব্য করল রানা।

‘এগয্যাক্টলি। তবে একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, ঘটনাটা এখন ঘটাতে গেল কেন? বিয়ে হয়েছে তো বেশ কয়েক বছর... আরও আগেই ঘটাল না কেন?’

খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, মনে মনে স্বীকার করল রানা। টেনিসনের সঙ্গে কথা শেষ করে মোটেলে ফেরার পথে ভাবল বিষয়টা নিয়ে। খুনটা রকেট লঞ্চের ঠিক আগেভাগে ঘটল কেন? দুটোর মধ্যে কি কোনও যোগসূত্র আছে? ফিনিঙ্গার আর লিমের মধ্যে কার্যত কোনও কানেকশন নেই, ওয়ালপ্স্ আইল্যাণ্ডে স্যাবোটাজের আশঙ্কাটা পুরোপুরিই অনুমান-নির্ভর। তারপরও অস্বস্তি কাটাতে পারছে না রানা। কেন যেন মনে হচ্ছে, খুনের সময়টা গুরুত্বপূর্ণ। জুলিয়া ফিনিঙ্গার কেন তার স্বামীকে খুন করল, সেটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। মনের ভেতর চাপা ক্ষোভ জমতে জমতে কখনও বিস্ফোরিত হয়... আর সেটা ভয়ঙ্কর রূপ নিতেই পারে। কিন্তু ফিনিঙ্গারের বেলায় বিস্ফোরণটা কোনও বিশেষ কারণে ঘটেছিল কি না, জানা দরকার। কিছু কি বদলে গিয়েছিল ওদের মাঝে? কী সেই পরিবর্তন?

পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে ভাবতে শুরু করল রানা। স্যালিসবারি থেকে আর কোনও তথ্য পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। ভার্জিনিয়ার সীমান্ত পেরিয়ে চলে গেছে জুলিয়া ফিনিঙ্গার, তাই কেসটা চলে গেছে এফবিআইয়ের কাছে। ওরা কদ্দূর এগোল কে জানে। এফবিআইয়ের স্পেশাল এজেন্ট এরিক স্টার্ন রানার পুরনো বন্ধু। তাকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। তা ছাড়া অ্যাণ্ডি লিম আমেরিকায় ফিরে এসেছে কি না, তাও জানা যাবে ওর কাছ থেকে। তবে ওসব খবর ফোন করেই নেয়া সম্ভব। আপাতত ওয়ালপ্স্ আইল্যাণ্ডের আশপাশে থাকাই ভাল। রানার স্থির বিশ্বাস, যা-ই ঘটাতে চলেছে লিম, তা রকেট উৎক্ষেপণকে কেন্দ্র করে। রানার উপস্থিতি যে ওতে ব্যাঘাত ঘটাবে, তাতে সন্দেহ নেই। এরই মধ্যে তার প্রমাণ পেয়েছে ও। আপাতত মোটেলে ফিরবে বলে সিদ্ধান্ত নিল।

রুট থার্টিনের পাশে স্টারলাইট মোটেলে উঠেছে রানা। বেশ শান্ত, ছিমছাম। চারপাশে সিডার আর পাইনের বনভূমি। মোটেলটা বহু পুরনো, ওয়ালপ্স্ আইল্যাণ্ডের নিকটবর্তী হিসেবে মহাকাশ-বিষয়ক থিমে নির্মিত। আজও সে-ঐতিহ্য ধরে রাখা হয়েছে। মোটেলের নিয়ন-সাইনে রয়েছে রকেটের ব্লাস্ট-অফের প্রতীক; তিনটে দোতলা বিল্ডিঙে থাকে বোর্ডাররা—একেকটার একেক রঙ, নামও রাখা হয়েছে তিনটা গ্রহ... জুপিটার, ভিনাস আর মার্স-এর নামে। মোটেলের সুইমিং পুলের তলায় টাইল বসিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে শনি গ্রহের একটা ছবি। এমন রঙচঙা মোটেলে সাধারণত ওঠে না রানা, তবে জায়গাটা ওয়ালপ্সের কাছাকাছি... মোটেলটাও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখে আর দ্বিধা করেনি। কম্পাউণ্ডের এক প্রান্তে, জুপিটার বিল্ডিঙের দোতলায় একটা কামরা নিয়েছে ও—রুম নাম্বার ২০৫। রুমের জানালা থেকে মোটেলের গেট আর মেইন রোড

পরিষ্কার দেখা যায়।

পার্কিং লটে গাড়ি রেখে ম্যানেজারের অফিসে ঢুকল রানা—রুমের চাবি নিতে। কাউন্টারের পেছনে নতুন একজনকে দেখা গেল... ম্যানেজারের বউ সম্ভবত... মোটাসোটা এক মহিলা, চেহারায় রাজ্যের ক্লান্তি। শুধু নাম বলে কাজ হলো না, রেজিস্টারের সঙ্গে মিলিয়ে তবেই উঠে দাঁড়াল সে, কামরার চাবি তুলে দিল রানার হাতে। অথচ বোর্ডটা কাউন্টারের ঠিক পেছনে, বললে রানাই হাত বাড়িয়ে হুক থেকে নিয়ে নিতে পারত চাবিটা।

'ফ্রেশ টাওয়েল দরকার আমার,' মহিলাকে বলল রানা। 'রুমে যেটা ছিল, সেটা ভিজিয়ে ফেলেছি শাওয়ারের সময়।'

'এখন না হলে হয় না?' বিরক্ত গলায় বলল মহিলা। 'অ্যাটেনডেন্টদের কেউ নেই। আমাকেই যেতে হবে আনার জন্যে।'

'আমি অপেক্ষা করছি।'

গজ গজ করল মহিলা। বেরিয়ে গেল অফিস থেকে। দু'মিনিট পর ফিরে এল ভাঁজ করা একটা তোয়ালে নিয়ে।

'এই নিন। আর কিছু লাগবে?'

'না, ধন্যবাদ।' হাসল রানা। চলে এল ওখান থেকে।

ঠিক রাত দুটোয় মোটেলের কম্পাউণ্ডে ঢুকল টয়োটা সেডানটা। হেডলাইট নিভিয়ে রেখেছে, অন্ধকারে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এসেছে শিকারি পশুর মত। শব্দ করেনি। নিশুতি রাত বলতে যা বোঝায়, সময়টা ঠিক তেমন। আঁধার জেঁকে বসেছে ধরণীর বুকে—মানুষ ও পশুপাখি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আরোহীরা যে-কাজে এসেছে, তার জন্যে আদর্শ প্রহর।

পরনে নাইট ক্যামোফ্লাজ ও আর্মি বুট, স্মিথ নামধারী লোকটা গাড়ি থামিয়ে সন্তর্পণে নেমে এল ড্রাইভিং সিট থেকে। গাড়ির পেছনে গিয়ে ট্রাঙ্ক খুলল, বের করে আনল

তারপুলিনে ঢাকা একটা ভারী জিনিস। স্মিথের পিছু পিছু একটা ভ্যানও এসে পৌঁছেছে—রাস্তার ধারে থেমেছে ওটা। ঝটপট সেখান থেকে নেমে এল ছ'জন সশস্ত্র মানুষ—সবাই স্মিথের মত সাজ নিয়েছে, মুখ ঢেকে রেখেছে বালাক্লাভায়। উজি সাবমেশিনগান রয়েছে সবার সঙ্গে, স্লিং দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে বুকের সামনে... উন্মুক্ত অবস্থায়। গভীর রাতে লুকোচুরির প্রয়োজন নেই। দ্রুত গাড়ির দরজা বন্ধ করে ছায়ায় মিশে গেল তারা—পূর্বনির্ধারিত পজিশনে চলে যাচ্ছে।

তারপুলিনের আবরণ সরাল স্মিথ, বেরিয়ে এল একটা এম-৬০ হেভি মেশিনগান। সুবিধেজনক একটা জায়গা বেছে সেটা মাটিতে বসাল সে, নিজেও শুয়ে পড়ল তার পেছনে। প্লাস্টিকের বাট-স্টক কাঁধে ঠেকিয়ে চোখ রাখল স্কোপে, অ্যাডজাস্ট করে নিল রিয়ার সাইট। জুপিটার বিল্ডিঙের ২০৫ নম্বর কামরা এখন তার চোখের সামনে—কালচে জানালাটা যেন হাঁ করে আছে রাতের অন্ধকারে। ভেতরে কারও সাড়াশব্দ নেই। শিকার নিঃসন্দেহে ঘুমোচ্ছে।

মুচকি হাসল স্মিথ। হাঁড়ির ভেতর মাছ মারার মত একটা ব্যাপার ঘটতে চলেছে। হাতের অস্ত্রটার ওপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে তার। দ্রুত বদলে নেবার মত একটা স্পেয়ার ব্যারেল সিস্টেম রয়েছে মেশিনগানটার, তবে সেটার প্রয়োজন পড়বে না। নিজ হাতে অস্ত্রটা পরিষ্কার করেছে সে, তেল মাখিয়েছে প্রতিটা মুভিং পার্টসে। ট্রিগারে চাপ দেয়ামাত্র শুরু হবে আগুনের বৃষ্টি—মিনিটে ছ'শো বুলেট ছুটবে লক্ষ্যের দিকে, ২৮০০ ফুট মাযল ভেলোসিটি নিয়ে! ওর টার্গেট মাত্র পাঁচশো ফুট দূরে। সন্দেহ নেই, রুম ও তার ভেতরের সবকিছু নিমেষে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। মশা মারতে কামান দাগা বোধহয় একেই বলে। তবে ওর নিয়োগকর্তা কোনও ধরনের ঝুঁকি নিতে চায় না। নির্দেশটা স্পষ্ট—যে-কোনও মূল্যে হত্যা করতে হবে ওই বাঙালি স্পাইটাকে। কৌশলে যদি কয়েক

হাজার আর্মার-পিয়ার্সিং বুলেটকে সে ফাঁকিও দেয়, তাকে খতম করার দায়িত্ব নেবে স্মিথের সঙ্গে আসা ছ'জন খুনি।

অবশ্য সে-ধরনের কোনও পরিস্থিতি দেখা দেবে বলে বিশ্বাস করে না স্মিথ। তার হিসেবে নব্বুই সেকেণ্ডের ভেতর শেষ হবে অপারেশনটা। খবর পেয়ে পুলিশের ছুটে আসতে লাগবে সাত মিনিট। তার আগেই নির্বিঘ্নে কেটে পড়বে ওরা। বাড়তি সতর্কতা হিসেবে খানিক আগে কয়েকটা ভুয়া কল করে পুলিশকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা হয়েছে—তারা শহরের আরেক দিকে মিথ্যে দুর্ঘটনা আর চুরি-ডাকাতির তদন্ত করতে গেছে। এরপরেও ভ্যানের ভেতরে রাখা হয়েছে বাড়তি একজন লোককে—সে পুলিশের ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন মনিটর করছে। বিপদের সম্ভাবনা দেখলে সতর্ক করে দেবে সঙ্গীদের। একেবারে নিখুঁত প্ল্যানিং বোধহয় একেই বলে।

মানসিক প্রস্তুতির জন্যে দু'মিনিট সময় নিল স্মিথ। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিল নিজেকে। ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে, কোথায় যেন একটা পেঁচা ডেকে উঠল, বাতাসে গুঞ্জন করে উঠল গাছের পাতা। তারপর সব সুনসান। মুহূর্তটা চিনতে অসুবিধে হলো না তার। বড় করে শ্বাস নিল সে, তারপর চেপে ধরল ট্রিগার।

রাতের নিস্তব্ধতাকে চৌচির করে দিয়ে গর্জে উঠল এম-৬০। মাযলের সামনে দেখা দিল আলোর ঝলকানি। শক্তিশালী বুলেটের ধারা ছুটে গেল অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে। চোখের পলকে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল ২০৫ নম্বর রুম। দরজা, জানালা, আসবাবপত্র-সহ যা কিছু ছিল, সব এমনভাবে গুঁড়িয়ে গেল, যেন কোনও বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। কল্পনার চোখে ভেতরের দৃশ্যটা দেখল স্মিথ—দেয়াল থেকে খসে পড়ছে পলেস্তারা, সমস্ত কাঁচ ভেঙে চৌচির হয়ে চলেছে, টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছে খাট-পালঙ্ক, সোফা, ইত্যাদি। আর রুমের মানুষটা? হয়তো সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্যে ঘুম

ভেঙেছিল বেচারার, কিন্তু পরক্ষণেই বুলেটবৃষ্টির তোড়ে নেচে উঠেছে তার দেহ... পরিণত হয়েছে রক্তমাংসের তালে। ভয়াবহ মৃত্যু... তবে সেটাই প্রাপ্য ওই বাঙালি যুবকের।

টানা এক মিনিট ফায়ার করার পর থামল স্মিথ। ততক্ষণে অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে ২০৫ নম্বর রুমের। আচমকা নেমে আসা নীরবতা বড্ড অস্বস্তিকর ঠেকল। নড়ল না সে। কোনও তাড়া নেই, হাতে প্রচুর সময় রয়েছে। শান্ত ভঙ্গিতে একে একে মোটেলের কয়েকটা রুমের বাতি জ্বলে উঠতে দেখল। নারীকণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল একটা রুম থেকে। আরেকটা রুমে কেঁদে উঠল একটা বাচ্চা। হাত নেড়ে ইশারা দিল সে। আড়াল থেকে বেরিয়ে এল খুনিরা। ছুটে গেল বিল্ডিঙের দিকে, ওপরতলায় গিয়ে নিশ্চিত হবে, শিকার সত্যিই খতম হয়েছে কি না।

রানাও দেখতে পাচ্ছে ওদেরকে।

ফিল্ডে কাজ করার সময় সারাক্ষণই পেছনে একটা চোখ রাখতে হয় এসপিয়োনাজ এজেন্টকে। তাই ওয়ালপ্স্ আইল্যাণ্ড থেকে বেরুবার পর থেকেই যে ওকে ছায়ার মত অনুসরণ করা হচ্ছে, তা টের পেতে অসুবিধে হয়নি রানার। অনেক সতর্কতা অবলম্বন করেছে অনুসরণকারী, কিন্তু ওকে বোকা বানাবার জন্যে তা যথেষ্ট ছিল না। আর এই পিছু নেয়া দেখেই রানা বুঝতে পেরেছে, ঠিক পথেই এগোচ্ছে ও। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে ওকে কাঁটা বলে ধরে নিয়েছে প্রতিপক্ষ, অতএব ব্যাপারটা স্রেফ নজরদারির মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে না। নিঃসন্দেহে আঘাত হানা হবে। মোটেলে ফিরে তাই ফাঁদ পেতেছে ও। ওর কামরার ঠিক নিচে, একতলার ১০৫ নম্বর রুমটা যে ফাঁকা, তা আগেই খেয়াল করেছিল। তাই ম্যানেজারের বউকে তোয়ালে আনতে পাঠিয়ে বোর্ড থেকে চাবিটা আলগোছে তুলে নিয়েছে, রুমে ফিরে গোপনে নিজের ব্যাগ নিয়ে নেমে এসেছে নিচের কামরায়। অপেক্ষায়

থেকেছে শত্রুর।

ঘুমোয়নি রানা। পুরোপুরি তৈরি অবস্থায় বিছানায় শুয়ে চোখ মুদে বিশ্রাম নিয়েছে কেবল। বাইরে গাড়ির মৃদু আওয়াজ শোনামাত্র ঝট করে উঠে বসেছে, জানালার কাছে গিয়ে পর্দা সরিয়ে উঁকি দিয়েছে বাইরে। চুপচাপ দেখেছে হেভি মেশিনগানের তাণ্ডব। মাথার উপরে ওর কামরা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, কিন্তু নড়েনি একচুল। হাতে নিজের সিগ-সাওয়ার পিস্তল নিয়ে অপেক্ষায় থেকেছে। এই হামলা প্রত্যাশিত, তবে এড়ানোর উপায় ছিল না। হাতে কোনও সূত্র নেই, এ-অবস্থায় অ্যাণ্ডি লিমের কাছে পৌঁছুবার জন্যে তার দলের কাউকে আটক করা প্রয়োজন। হামলাকারীকে ফাঁদে ফেলে সে-কাজ করতে চেয়েছে রানা।

তবে হিসেবে সামান্য ভুল হয়েছে ওর। শত্রুকে আণ্ডার-এস্টিমেট করে বসেছে। এতটা প্রস্তুতি নিয়ে ওরা আসবে, ভাবতে পারেনি। হেভি ক্যালিবারের মেশিনগানটাই যা বোঝাবার বুঝিয়ে দিয়েছে... তার ওপর রয়েছে সশস্ত্র আরও ছ'জন লোক। এরা কোনও সুযোগ দিতে রাজি নয়। কপালে খারাবি আছে ওর। কাউকে আটকানো তো দূরের কথা, প্রাণ বাঁচাতে পারলেই সেটাকে সৌভাগ্য ভাবতে হবে।

মেশিনগানের আওয়াজে কানে তালা লেগে গিয়েছিল, শ্রবণশক্তি ফিরতে সামান্য সময় লাগল। এবার নারীকণ্ঠের চিৎকার আর বাচ্চার কান্না শুনতে পেল রানা। বাইরে আবার নজর বোলাল ও। হেভি মেশিনগানের অপারেটর নড়েনি, তবে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে তার সঙ্গীরা। আঙিনার দু'পাশে পজিশন নিল দু'জন, একজন চলে গেল বিল্ডিঙের পেছনে, বাকি তিনজন বাইরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ওপরে। পাক্কা প্রফেশনাল আচরণ।

প্রমাদ গুনল রানা। ধ্বংসস্তূপের ভেতর ওর লাশ না পেয়ে যা বোঝার বুঝে নেবে লোকগুলো। এরপর একে একে হানা

দেবে বিল্ডিঙের সবক'টা রুমে। কোণঠাসা হবার আগেই যা করার করতে হবে ওকে। এক ছুটে পেছনের জানালায় চলে গেল ও, পাল্লা খুলে সন্তর্পণে বেরিয়ে এল বাইরে। বিল্ডিঙের পেছনে পজিশন নেয়া নিঃসঙ্গ খুনিকে দেখতে পেল কয়েক সেকেণ্ড পরেই। আরেক দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে আছে সে।

বিদ্যুৎবেগে ছুট লাগাল রানা। চোখের পলকে পৌঁছে গেল লোকটার কাছে। শেষ মুহূর্তে বিপদ টের পেল সে, পাঁই করে ঘুরল, কিন্তু ততক্ষণে দেরি করে ফেলেছে। অস্ত্র ঘোরাবার চেষ্টা করল, একই সঙ্গে চাইল চেঁচিয়ে উঠতে... কোনোটারই সুযোগ পেল না। সিগ-সাওয়ারের নল দিয়ে সর্বশক্তিতে লোকটার কণ্ঠায় গুঁতো মারল রানা। ওই এক আঘাতে ভেঙে গেল কণ্ঠনালী, ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরুল লোকটার মুখ দিয়ে। গলা চেপে ধরল সে দু'হাতে, এরপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। এবার পিস্তলের বাট দিয়ে সজোরে তার ঘাড়ে মারল রানা। তালগোল পাকিয়ে পড়ে গেল লোকটা।

বড়জোর দশ সেকেণ্ড পেরিয়েছে ইতিমধ্যে, কিংবা তারও কম। কিন্তু সময় নেই রানার হাতে। টান দিয়ে বালাক্লাভাটা খুলে নিল ও। অজ্ঞান মুখটার দিকে ফিরে তাকাল না, ঝটপট মুখোশটা পরে ফেলল নিজে। খুনিদের মত ওর পরনেও কালো পোশাক। কপাল ভাল হলে হয়তো দূর থেকে ওকে চিনতে পারবে না ওরা, নিজেদের দলের লোক ভাববে। সেই সুযোগে কেটে পড়া যাবে।

হঠাৎ ওপর থেকে ভেসে এল চিৎকার। 'ও এখানে নেই!'

চারদিকে চঞ্চল দৃষ্টি বোলাল রানা। মোটেলের পেছনের জঙ্গলে ঢুকে পড়বে ভেবেছিল, কিন্তু সেদিকটা উঁচু কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা। বেড়া টপকাতে গেলেই চোখে পড়ে যাবে। পেছনে বসেও থাকা যায় না। যাবার রাস্তা একটাই—সামনে। বিল্ডিঙের পাশ ঘুরে সেদিকেই ছুটল ও। মাথায় চিন্তার ঝড়।

একজনকে মাত্র ঘায়েল করতে পেরেছে, রয়ে গেছে ছয়জন। সেটা সমস্যা না। পাঁচজনের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে ও। কিন্তু আঙিনায় বসানো হেভি মেশিনগানটাই সব গোলমাল করে দিচ্ছে—মোটেলের চৌহদ্দি থেকে বেরুবার চেষ্টা করলেই ওকে কচুকাটা করবে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো জানালায় আলো জ্বলে উঠেছে, আঙিনায় বেরুলেই ওকে দেখতে পাবে মেশিনগান অপারেটর। মুখোশপরা অবস্থায় চিনতে পারবে কি?

জবাবটা কয়েক মুহূর্ত পরেই পেয়ে গেল ও। বিল্ডিঙের সামনে পৌঁছুতেই আঙিনার দু'পাশে পজিশন নেয়া দুই খুনি ছুটে এল ওর দিকে। বুঝতে অসুবিধে হলো না, ওর পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে। কী করে চিনল, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই—হয়তো বা ওর পোশাক, অবয়ব, বা চলাফেরায় পার্থক্য খুঁজে পেয়েছে ওরা। লোকদুটোকে উজি উঁচু করতে দেখল ও, সঙ্গে সঙ্গে ডাইভ দিয়ে পড়ল মাটিতে। শরীরের ওপর দিয়ে চলে গেল এক ঝাঁক গুলি। শোয়া অবস্থাতেই সিগ-সাওয়ার তুলল রানা, যান্ত্রিক দক্ষতায় দুটো গুলি ছুঁড়ল দুই শত্রুকে লক্ষ্য করে। নিখুঁত নিশানা... কপালে তৃতীয় নয়ন ফুটল ওদের, দু'জনেই উল্টে পড়ল মাটিতে।

পরক্ষণেই জ্যান্ত হয়ে উঠল স্মিথের এম-৬০। ভারী বুলেট ছুটে এল রানার উদ্দেশে। তার আগেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ও, প্রাণপণে দৌড়াতে শুরু করেছে পার্ক করা গাড়িগুলোর দিকে। ওর পেছনে বাতাস কাটল ব্যর্থ বুলেটের ধারা... অনুসরণ করে চলেছে ওকে।

প্রথম গাড়িটা পনেরো ফুট দূরে থাকতেই ঝাঁপ দিল রানা, একটা ডিগবাজি খেয়ে পৌঁছে গেল ওটার পেছনে। গাড়িটাকে সরোষে আক্রমণ করল হেভি মেশিনগানের বুলেট। যেন গজব নেমে এল। জ্যান্ত প্রাণীর মত কাঁপছে গোটা গাড়িটা, ভেঙে পড়ছে উইণ্ডশিল্ড-সহ সব কাঁচ, ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে

চেসিস।

হঠাৎ থেমে গেল মেশিনগান। কেন থেমেছে সেটা বোঝা গেল দু'সেকেণ্ড পর। চোখের কোণে নড়াচড়ার আভাস পেল রানা। ওদিকে তাকাতেই সশস্ত্র এক খুনিকে উজি তুলে ওর দিকে ছুটে আসতে দেখল। তাকে সুযোগ দেবার জন্যে গুলি থামিয়েছে মেশিনগানধারী। সিগ-সাওয়ার তুলে গুলি করল রানা, তবে আচমকা লোকটা একপাশে সরে যাওয়ায় জায়গামত লাগল না সেটা। বাম কাঁধে আঘাত নিয়ে আধপাক ঘুরে গেল সে, ঝাঁপ দিয়ে সরে গেল লাইন অভ ফায়ার থেকে।

আবারও গর্জে উঠল এম-৬০। ক্ষত-বিক্ষত গাড়িটাকে তীব্র আক্রোশে আঘাত করছে ভারী বুলেট। দাঁতে দাঁত পিষল রানা। পুরোপুরি ফাঁদে পড়ে গেছে। নড়বার উপায় নেই, ওকে গাড়ির পেছনে থাকতে বাধ্য করছে মেশিনগানধারী। সেই সুযোগে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে বাকি খুনিরা। অলৌকিক কোনও উপায়ে যদি তাদেরকে ঘায়েলও করে, লাভ হবে না। গাড়িটা বেশি সময় রক্ষা করতে পারবে না ওকে। চেসিস ভেদ করে যে-কোনও মুহূর্তে ওকে খুঁজে নেবে মেশিনগানের বুলেট।

কী করা যায়, তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে রানা, আচমকা সচকিত হলো ইঞ্জিনের ভারী আওয়াজে। মোটেলের আঙিনা আলোকিত হয়ে উঠল এক জোড়া হেডলাইটের আলোয়। মেশিনগানের গোলাবর্ষণ থেমে গেল। আড়াল থেকে ওদিকে উঁকি দিল রানা। নতুন একটা গাড়ি উদয় হয়েছে দৃশ্যপটে—একটা ফোর্ড এস.ইউ.ভি। সবেগে মোটেলের কম্পাউণ্ডে ঢুকল ওটা, চাকার তলায় ফেলল হেভি মেশিনগানটাকে। স্মিথেরও একই দশা হতো, যদি না শেষ মুহূর্তে লাফিয়ে সরে যেত সে।

মেশিনগানের দফারফা করে রানার দিকে ছুটে এল

গাড়িটা। ব্রেক কষে থমকে দাঁড়াল ওর কয়েক হাত দূরে। প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজা খুলে গেল। ভেতর থেকে চেঁচিয়ে একটা নারীকণ্ঠ বলল, 'রানা! চলে এসো!'

ডাকটা শুনতেই যা দেরি, আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা। এক লাফে উঠে বসল এস.ইউ.ভি-তে। সঙ্গে সঙ্গে আবারও গিয়ার দিল ড্রাইভার। মুখ ঘুরিয়ে ছুটল পাগলের মত। পেছনে গর্জে উঠল খুনিদের উজি। ঠক ঠক করে রিয়ার-এণ্ডে বিঁধল গুলি, চিড় ধরল পেছনের উইণ্ডশিল্ডে। তাই বলে থামল না গাড়িটা। যেভাবে ঢুকেছিল, সেভাবেই ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এল কম্পাউণ্ড থেকে। মেইন রোডে উঠে ছুটতে লাগল উল্কার বেগে।

সোজা হয়ে সিটে বসল রানা। বিস্ময় নিয়ে তাকাল ড্রাইভারের দিকে। সে আর কেউ নয়... রহস্যময়ী সেই মিশেল হাণ্টার!

'হাই!' হাসিমুখে বলল মেয়েটা। 'অবাক হয়েছ?'

'হওয়াটাই কি স্বাভাবিক নয়?' বলল রানা। 'তুমি কোত্থেকে এলে?'

'সেটা পরে শুনবে। বিপদ এখনও কাটেনি।'

পেছনে তাকিয়ে কথাটার সত্যতা টের পেল রানা। দু'জোড়া হেডলাইট উদয় হয়েছে—ওদের পিছু নিয়েছে খুনিরা।

'হেডলাইট নেভাও,' সামনে একটা চৌরাস্তা দেখতে পেয়ে মিশেলকে বলল ও। 'তারপর ঢুকে পড়ো সাইড রোডে। ওরা এখনও বেশ খানিকটা পেছনে। হয়তো দেখতে পাবে না আমরা কোন্‌দিকে গেছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হেডলাইটের সুইচ অফ করে দিল মিশেল। স্পিড বাড়িয়ে চৌরাস্তাটা পার হবার ভান করল, একেবারে শেষ মুহূর্তে বন বন করে ঘোরাল স্টিয়ারিং। প্যাসেঞ্জার সিটে কাত হয়ে পড়ল রানা, নাকে ভেসে এল মিশেলের মাথা

পারফিউমের সুবাস। তীক্ষ্ণ এক বাঁক নিয়ে বাঁয়ের রাস্তায় ঢুকে পড়ল ওদের এস.ইউ.ভি।

পাকা হলেও এদিকের রাস্তা সরু আর অন্ধকার, গতি সামান্য কমিয়ে আনল মিশেল। চাঁদের আলোয় দু'পাশে গাছপালা আর ঝোপঝাড় দেখা গেল।

'খসাতে পেরেছি?' তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নেয়ার সময় জিজ্ঞেস করল মিশেল।

'বলতে পারছি না,' ঘাড় ফিরিয়ে অন্ধকার পিছন দিকে তাকাল রানা। 'কোনও আলো দেখছি না। তাতে অবশ্য কিছু প্রমাণ হয় না।' পেছনের লোকগুলোর কাছে নাইট গগলস্ আছে কি না কে জানে, সেক্ষেত্রে কৌশলটা কোনও কাজে আসবে না। উদ্বেগটা রয়েই গেল।

এভাবে ছয় কি সাত মাইল পেরিয়ে এল ওরা, পেছনে কেউ লেগে থাকলে এতক্ষণে কিছু না কিছু আলামত দেখা যেত। ছোট একটা গ্রামের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে গাড়ি। রাস্তার দু'ধারে নানা ধরনের বাড়িঘর দেখতে পেল রানা, চোখের পাতা ফেলার আগেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। একটা পাব দেখতে পেল। তারপর একটা চার্চ। ডানদিকে বাঁক নিল এস.ইউ.ভি। বাঁক নেয়ার পর রাস্তাটা দেখা গেল একেবারে সরল, ঢাল বেয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে। রাস্তা ধরে তীরবেগে নামছে ওরা। হঠাৎ গাল দিয়ে উঠল মিশেল। চাপ দিল ব্রেকে।

সামনে একটা নয়, এক জোড়া হেডলাইট—ওদের দিকে আসছে না, দু'পাশ থেকে পরস্পরের দিকে এগোচ্ছে।

প্রচণ্ড ঝাঁকি আর বিপুল গতির মধ্যে প্রায় দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ল রানা, তবু চট্ করে কয়েকটা ব্যাপার উপলব্ধি করতে পারল। ত্রিশ গজ দূরে একটা ক্রসরোড, ক্রসরোডের ডান ও বাম দিক থেকে পরস্পরের দিকে ছুটে আসছে দু'জোড়া হেডলাইট। ব্যাপারটা ভাল করে উপলব্ধি করার আগেই ত্রিশ

গজ দূরত্ব আর প্রায় কোনও দূরত্বই থাকল না। দু'জোড়া হেডলাইটের পেছনে দুটো গাড়িকে দেখা গেল। বোতামে চাপ দিয়ে এস.ইউ.ভি-র হেডলাইট জ্বালল মিশেল, তীব্র আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সামনের গাড়িদুটো, পরস্পরের দিকে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল, দুটো ধাতব নাক পরস্পরের সাথে প্রায় ঠেকে গেছে, রোডব্লকের আদর্শ ভঙ্গিতে—খুনিদের গাড়িদুটোই। একটা সেডান, অন্যটা ভ্যান।

এখনও ব্রেক করছে মিশেল, হুইল ঘুরিয়ে বাম দিকে সরে যাবার চেষ্টা করছে, প্রতি মুহূর্তে আকারে বড় হয়ে উইণ্ডস্ক্রিন ঢেকে ফেলছে গাড়িদুটো। রাস্তা ছেড়ে ঘাসের ওপর পড়ল এস.ইউ.ভি-র চাকা, সামান্য ঝাঁকি খেল, পরমুহূর্তে সামনের জোড়া গাড়িদুটোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম করল।

নিজের জায়গা থেকে রানা দেখল, রোডব্লক আর বাম দিকের নব্বুই ডিগ্রি বাঁকের মাঝখানে জায়গা অত্যন্ত কম, তবে বিরাট গাড়িটাকে নিয়ন্ত্রণ করল মিশেল একজন র‍্যালি ড্রাইভারের মত, প্রয়োজনে ঝুঁকে পড়ছে হ্যাণ্ডব্রেকের দিকে, পাদুটো নাচানাচি করছে ফুটব্রেক আর অ্যাকসেলারেটরের ওপর।

তীব্র কর্কশ প্রতিবাদ করল এস.ইউ.ভি-র টায়ার, হড়কাতে শুরু করল চাকা, একদিকে কাত হয়ে পড়ল গাড়ি, তারপর সিধে হলো, গতি বাড়ছে, বাম দিকের ঝোপগুলোকে ছুঁয়ে দিল, তবে সেডানের বুটের সঙ্গে ধাক্কা খেল না সম্ভবত এক ইঞ্চির জন্যে।

বাঁক নিয়ে নতুন রাস্তায় পড়ল ওরা, মাথার ওপরটা ডালপালা দিয়ে ছাওয়া। মনে হলো, ওরা যেন একটা টানেলের ভেতর দিয়ে ছুটছে। রাস্তাটা এতই সরু যে চেষ্টা করলে হয়তো কোনও রকমে দুটো গাড়ি পরস্পরকে পাশ কাটাতে পারবে।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনদিকে তাকাল রানা, দেখল সেডানের

পেছনের লাল আলো ক্রমশ ম্লান হয়ে যাচ্ছে। তবে অডির হেডলাইটের আলো উজ্জ্বল লাগল চোখে। ঝট্ করে মাথা নিচু করল ও। অন্ধকারে খুদে নীল আলোর ঝলক দেখা গেল কয়েকটা। এস.ইউ.ভি-র গুঞ্জনকে ছাপিয়ে, যতটা না শুনতে পেল তারচেয়ে বেশি অনুভব করল, ওদের চারদিকে বুলেট বৃষ্টি হচ্ছে।

'ক্রাইস্ট!' বিড়বিড় করল মিশেল, গতি না কমিয়ে ডান দিকে বাঁক নেয়ার জন্যে হুইল ঘোরাল, দৃষ্টিসীমার বাইরে ফেলে এল রোডব্লকের গাড়িদুটোকে। 'আমাদের ওভারটেক করল কীভাবে ওরা?'

'নিশ্চয়ই কোনও শর্টকাট রাস্তা চেনে,' বলল রানা। 'ওরা আবার পিছু নেবে, মিশেল। সময় থাকতে এগিয়ে থাকো।'

'ঠিক আছে।'

খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল এস.ইউ.ভি, যে-কোনও মুহূর্তে পেছনে আলো দেখতে পাবে বলে আশঙ্কা করছে রানা। এক হাতে সিগ-সাওয়ার, অপর হাতটা জানালার বোতামে... তৈরি হলো প্রতিরোধ গড়ার জন্যে। দ্বিতীয়বার সুযোগ দেবে না শত্রুদের। হেডলাইটের চোখ ধাঁধানো আলো নিয়ে ভ্যানটা যেন আকাশ থেকে পড়ল, ঠিক ওদের পেছনে।

'স্পিড বাড়াও!' হাঁক ছাড়ল ও, দরজার গায়ে সেঁটে আছে শরীরটা, পিস্তল তুলল জানালার কিনারায়, ঠাণ্ডা বাতাসের ধাক্কা অনুভব করল মুখে আর হাতে।

এখনও পেছনে লেগে রয়েছে ভ্যান, পর পর দুটো গুলি করল ও—ক্ষিপ্রতার সঙ্গে, নিচের দিকে... আশা, গাড়ির একটা চাকা ফুটো করে দিতে পারবে। সরু রাস্তা, ফাঁকা হলেও ঘণ্টায় আশি মাইল স্পিডই অনেক বেশি, বাধ্য হয়ে বিপজ্জনক নব্বুইয়ে উঠে যাচ্ছে মিশেল। সিটের ওপর ঘন ঘন এদিক-ওদিক কাত হয়ে পড়ছে রানা, এখনও দরজা ধরে ঝুলে আছে ও, টার্গেটে নিশানা করার চেষ্টা করছে, তীব্র

আলোর ঝলকে কুঁচকে আছে চোখদুটো।

আবার গুলি করল রানা, ভ্যানের একটা হেডলাইট নিভে গেল। গুলিটা মাত্র করেছে, আচমকা একদিকে কাত হয়ে পড়ল এস.ইউ.ভি, যেন গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে ড্রাইভার—একবার ডানদিকে, পরমুহূর্তে বামদিকে ছুটল ওরা। এভাবে ঘন ঘন এদিক-ওদিক করায়, পেছনের ভ্যানকে অন্তত দু'বার প্রায় আড়াআড়ি টার্গেট হিসেবে দেখতে পেল রানা। প্রথমবারেই সুযোগটা কাজে লাগাতে চেষ্টা করল ও, এত দ্রুত গুলি করল যে বিস্ফোরণের দুটো শব্দকে আলাদাভাবে প্রায় চেনাই গেল না। ভ্যানের উইণ্ডস্ক্রিনটাকে মাকড়সার জাল হয়ে যেতে দেখল ও। মনে হলো, অস্পষ্ট একটা আর্তনাদও যেন শুনতে পেয়েছে।

এস.ইউ.ভি-র পেছনের বাম্পারে যেন ঝুলে থাকল ভ্যান, তারপর পিছিয়ে পড়ল। পিছাবার সময় বাঁ দিকে সরে গিয়ে ভয়ানক একটা ঝাঁকি খেল। তারপর সরাসরি গিয়ে আঘাত হানল একটা মোটা গাছের গায়ে। চোখের পলকে থেঁতলে গেল ভ্যানের নাক থেকে শুরু করে সামনের অনেকখানি অংশ। সন্দেহ নেই, ড্রাইভার ও তার পাশে বসে থাকা সঙ্গী তৎক্ষণাৎ মারা পড়েছে।

ভ্যান সরে যাওয়ায় এবার সেডানটা উদয় হলো দৃষ্টিসীমায়—পিছু পিছু ছুটে এসেছে ওটাও। ভ্যানের পরিণতি দেখে শিক্ষা হয়ে গেছে তাদের, রানাকে আগের কৌশল খাটাবার সুযোগ দিল না। গতি বাড়িয়ে চলে এল একেবারে পেছনে। ডানে-বাঁয়ে আবারও কাটার চেষ্টা করল মিশেল, কিন্তু লাভ হলো না, আঠার মত লেগে রয়েছে সেডান, আড়াআড়িভাবে আর ওটাকে টার্গেট হিসেবে পাচ্ছে না রানা।

'আমাকে ড্রাইভ করতে দাও,' মিশেলকে বলল ও।

'কী!' চমকে উঠল মিশেল।

'ঠিকই শুনেছ,' বলল রানা। পাশ থেকে এক পা বাড়িয়ে

অ্যাকসেলারেটরে রাখল ও, হাতদুটো ব্যবহার করল স্টিয়ারিং আর ড্যাশবোর্ড আঁকড়ে ধরে শরীর জাগাতে। 'মুভ!'

পিছলে রানার নিচ দিয়ে প্যাসেঞ্জার সিটে চলে এল মিশেল, রানা নিল ওর জায়গা। ক্ষণিকের জন্যে গতি কমল এস.ইউ.ভি-র, সেই সুযোগে পিছন থেকে বাম্পারে গুঁতো মারল সেডান। মাতালের মত এদিক-ওদিক দুলল এস.ইউ.ভি, রাস্তা থেকে আরেকটু হলেই ছিটকে বেরিয়ে যেত। ডানে-বামে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে আর ব্রেক ব্যবহার করে স্থির রইল রানা। আবার ধাক্কা দেয়া হলো পিছন থেকে, মিশেল গড়িয়ে পড়ল সিটের ওপর।

'হোল্ড অন,' ওকে বলল রানা। 'ওভাবে কিছুই করতে পারবে না ওরা।'

'ওরা না, ও।' পেছনে তাকিয়ে বলল মিশেল। 'ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ নেই গাড়িতে। ওই ব্যাটাই মোটেলে মেশিনগান চালাচ্ছিল। তোমার পিস্তলটা দাও, ওকে মজা দেখাচ্ছি।'

'গুলি খরচের প্রয়োজন নেই, ওকে এমনিতেই ঘায়েল করতে পারব।'

লোকটা কার-ফাইটিঙে আনাড়ি—বুঝতে পারছে রানা। নইলে পিছন থেকে গুঁতো মারত না। এই আক্রমণে সামনের গাড়ির তেমন কোনও ক্ষতি হয় না, দক্ষ ড্রাইভার নিয়ন্ত্রণও হারায় না সহজে। ওর উচিত ছিল পাশে এসে ধাক্কা দেয়া, তবে গুলি খাবার ভয়ে সাহস পাচ্ছে না বোধহয়। লোকটার এই দুর্বলতাকেই কাজে লাগাবার সিদ্ধান্ত নিল ও।

পিছন থেকে আবার ধাক্কা খাবার আগেই স্পিড বাড়াল রানা, তারপর আচমকা ডানে কেটে চেপে ধরল ব্রেক। রাস্তায় টায়ার পিছলানোর শব্দ হলো, অকস্মাৎ থেমে যাচ্ছে সেডানটা। ব্যাপারটা আগে আঁচ করতে পারেনি স্মিথ, প্রতিক্রিয়ার সময় পেল না... এস.ইউ.ভি-কে পেছনে ফেলে

পাশ দিয়ে ছুটে সামনে চলে গেল। এবার আবার অ্যাকসেলারেটর চাপল রানা, সেডানের রিয়ার-এণ্ডের ডান কোনায় নিয়ে এল নিজের গাড়িকে। কয়েক সেকেণ্ডের ব্যবধানে দুই গাড়ির জায়গা বদলে গেছে।

মুখে হাসি ফুটল রানার, কায়দামত পাওয়া গেছে ব্যাটাকে! স্পিড বাড়িয়ে এগোল ও, ফ্রন্ট বাম্পারের বাম প্রান্ত দিয়ে মৃদু ধাক্কা দিল সেডানের রিয়ার-এণ্ডের ডান কোনায়। হিসেব করা আঘাত—ব্যালান্স পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেল গাড়িটার, লাটিমের মত ঘুরতে শুরু করল। একশো আশি ডিগ্রি ঘুরতেই ড্রাইভারের হতবিহ্বল চেহারা চোখে পড়ল ওর। গাড়িটা তখনও ঘুরছে... একই সঙ্গে পিছলে যাচ্ছে রাস্তা ছেড়ে। এবড়ো-খেবড়ো জমিনে পৌঁছেই ঝাঁকি খেল, উল্টে গেল নিমেষে। ছাতের ওপর ভর দিয়ে পিছলাতে পিছলাতে ধাম করে বাড়ি খেল গাছের সারিতে।

ব্রেক চেপে গাড়ি থামাল রানা। সিগ-সাওয়ার হাতে এক লাফে নামল, ছুটে গেল উল্টে থাকা গাড়িটার দিকে। কাছে গিয়ে পিস্তল তাক করল, পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ড্রাইভারের খোঁজে। অবশেষে একজনকে বাগে পেয়েছে... এর মাধ্যমেই অ্যাণ্ডি লিম পর্যন্ত পৌঁছুবে ও।

রক্তাক্ত শরীরে উল্টানো গাড়ির ভেতর পড়ে আছে স্মিথ, আচ্ছন্ন দশা। আবছাভাবে রানাকে এগিয়ে আসতে দেখল। কষ্টে-সৃষ্টে জ্যাকেটের ভেতর থেকে বের করে আনল নিজের পিস্তল, কিন্তু পরক্ষণে বুঝল, নিশানা তাক করে গুলি ছোঁড়ার ক্ষমতা তার নেই।

'ডোন্ট মুভ!' থমথমে গলায় বলল রানা। 'অস্ত্র ফেলে দাও।'

'তাতে লাভ?' জিজ্ঞেস করল স্মিথ।

'তোমাকে উদ্ধার করব আমি। হাসপাতালে নিয়ে যাব।'

'যাতে সুস্থ করে ইন্টারোগেট করতে পারো?' দুর্বল

ভঙ্গিতে হাসল স্মিথ। 'দুঃখিত, আমার বস তোমাকে সে-সুযোগ দেবেন না। তার আগেই খতম করবেন আমাকে। ব্যর্থতা সহ্য করেন না তিনি... গোমর ফাঁস করা তো অনেক দূরের ব্যাপার। ভয়াবহ শাস্তি অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। সেটার মুখোমুখি হবার মত সাহস নেই আমার।'

'আবার বলছি, অস্ত্র ফেলে দাও।'

'এটা?' পিস্তলটা নড়াল স্মিথ। 'এটা তোমার জন্যে বের করিনি। নিজের জন্যে করেছি... আমার বসের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে করেছি...'

বলতে বলতেই কপালের পাশে মাযল ঠেকাল সে। টিপে দিল ট্রিগার। খুলির একপাশ দিয়ে ঢুকে আরেক পাশ দিয়ে বেরুল বুলেট। ফুলঝুরির মত রক্ত আর মগজ ছিটাল খানিকটা। নিথর হয়ে গেল স্মিথ।

মিশেল এগিয়ে আসছিল রানার পিছু পিছু। হাতের ইশারায় ওকে থামাল রানা। বলল, 'এসে কাজ নেই। চলো, পুলিশ আসার আগেই সরে যাই এখান থেকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উল্টো ঘুরল মিশেল।

বারো

'আর ভণিতা নয়, মিশেল,' কফিতে চুমুক দিয়ে বলল রানা। 'এবার আসল কথায় এসো। কে তুমি? পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে তুমি কীভাবে জড়িত?'

সকাল চারটে বাজে, রাস্তার ধারের একটা ডাইনারে বসে

আছে ওরা। ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিয়েছে। খিদে অবশ্য নেই রানার, খাবারের অর্ডার দিয়েছে স্রেফ ডাইনারে বসার অজুহাত হিসেবে। ওদেরকে কফি পরিবেশন করে খাবার আনতে চলে গেছে ওয়েইট্রেস। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে রানার মুখোমুখি বসে আছে মিশেল। কফি ছুঁয়েও দেখেনি। ভয়াবহ যে-অভিজ্ঞতা হয়েছে, চুপচাপ বসে থেকে তার রেশ কাটাতে চাইছে বোধহয়।

'কী হলো? কথার জবাব দাও!' তাড়া দিল রানা।

ক্লান্ত চোখে ওর দিকে তাকাল মিশেল। 'আমি টায়ার্ড,' বলল সে। 'সকালে কথা বললে হয় না?'

'সকাল হয়েই গেছে প্রায়। সূর্য উঠতে খুব বেশি দেরি নেই। তা ছাড়া সকাল হলেই আবারও যে তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাবে না, তার কী গ্যারান্টি?'

'সেদিনের জন্যে আমি দুঃখিত, রানা। কিন্তু আমার দিকটাও একটু চিন্তা করো। তোমাকে চিনি না, জানি না... কী করে বিশ্বাস করতাম, বলো? তা ছাড়া আমার কাজের জন্যে ছবিগুলোর দরকার হয়ে পড়েছিল। তুমি তো আর এমনি এমনি দিতে না ওগুলো।'

'কার হয়ে কাজ করছ তুমি?' জানতে চাইল রানা। 'সিআইএ?'

একটু দ্বিধা করল মিশেল। তারপর বলল, 'বেশ, গোপন করে আর লাভ নেই। সিআইএ নয়, আমি আসলে ডিপার্টমেন্ট অভ ট্রেজারির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এক ধরনের ফিল্ড এজেন্ট বলতে পারো। আমার কাজ, ফাইনানশিয়াল ক্রাইমের তদন্ত করা।'

'কী ধরনের ফাইনানশিয়াল ক্রাইম?'

'সব ধরনের তদন্তই করি, তবে তার বেশিরভাগই জাল নোট সংক্রান্ত।'

বিভ্রান্ত বোধ করল রানা। জাল নোটের সঙ্গে অ্যাণ্ডি লিম

বা স্যাটেলাইট লঞ্চের কী সম্পর্ক? 'বলতে থাকো,' বলল ও।

'এখুনি কি সব শোনা জরুরি?'

'পুরোটা না জানা পর্যন্ত আমি তোমাকে চোখের আড়াল হতে দিচ্ছি না।'

শ্রাগ করল মিশেল। পার্স খুলে একটা চকচকে একশো ডলারের নোট বের করল, সেটা রাখল টেবিলের উপরে।

'ভাল করে দেখো,' বলল সে। 'বলো তো, এটা আসল, নাকি নকল?'

নোটটা তুলে নিল রানা। প্রশ্নটা ওর জন্যে একটু কঠিনই। আমেরিকান কারেন্সির সঙ্গে পরিচিত হলেও নোটের খুঁটিনাটি জানা নেই ওর। তারপরেও আঙুল দিয়ে পরখ করল ওটা, আলোতে তুলে সিকিউরিটি ব্যাণ্ড আছে কি না দেখল। বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন ড্যাবড্যাবে চোখে চেয়ে আছেন ওর দিকে, চেহারায় কোনও গড়বড় নেই। পেছনে রয়েছে ইনডিপেণ্ডেন্স হলের ছবি। নোটটা একেবারে ব্র্যাণ্ড নিউ, এর বাইরে আর কিছু আঁচ করা গেল না। ওটা আবার নামিয়ে রাখল ও। বলল, 'দেখে তো আসল মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার ধারণা, জাল বলেই তুমি এটা আমাকে দেখতে দিয়েছ।'

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল মিশেল। 'জাল... তবে প্রায়-নিখুঁতই বলা চলে। কাগজটা আসল নোটের মত কটন ফাইবার পেপার, ছাপা হয়েছে ইনটাগ্লিয়ো প্রিণ্টারে। কালিটা হাই প্রেশারে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে কাগজের গায়ে। ছবিগুলোও নিখুঁত। ঠিক এ-ধরনের পাঁচ হাজার নোট পাওয়া গেছে সপ্তাহখানেক আগে—এটা তারই একটা। দেখামাত্র সন্দিহান হয়ে পড়ি আমরা। দেখতেই পাচ্ছ, নোটটা একেবারে নতুন। সবচেয়ে বড় কথা, ফরেনসিক টেস্টে প্রমাণিত হয়েছে যে, এগুলো মাত্র দু'বছর আগে ছাপা!'

'তাতে সমস্যা কোথায়?'

'এটা পুরনো ডিজাইনের নোট। অথচ ২০১৩ সালের

অক্টোবর থেকে একশো ডলারের নোটের ডিজাইনে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছি আমরা। গত চার বছর ধরে সেগুলোই ছাপা হচ্ছে। তা হলে এই পুরনো ডিজাইনের নোট দু'বছর আগে ছাপা হয় কী করে? ফরেনসিক রিপোর্ট পেয়ে নোটগুলো খুঁটিয়ে চেক করেছি আমরা। মাইক্রোস্কোপিক লেভেলে বেশ কিছু ত্রুটি পেয়েছি। আর তা থেকেই নিশ্চিত হয়েছি, এগুলো জাল। খুবই উন্নত মানের জাল... তবে জালই।'

মিশেলের একটা নতুন রূপ দেখতে পাচ্ছে রানা। চোখ চকচক করছে উত্তেজনায়, গালে লেগেছে রঙের ছটা... সন্দেহ নেই, কাজের প্রতি ভীষণ রকম প্যাশন রয়েছে মেয়েটার।

'কোথায় পাওয়া গেছে নোটগুলো?' জিজ্ঞেস করল ও।

'নেভাদায়। লাস ভেগাসের সবচেয়ে দামি হোটেলের হাই রোলার স্যুইটে অচেনা এক মেয়ে উঠেছিল। পাগলাটে ধরনের মেয়ে—মদ আর জুয়ায় উজাড় করে দিচ্ছিল নিজেকে। রুলেতের টেবিলে এক সেশনেই প্রায় বিশ হাজার ডলার উড়িয়ে দেয় সে, আর তা দেখেই সন্দেহ হয় ক্যাসিনো কর্তৃপক্ষের। খবর দেয় পুলিশে। বেশ মজার লোক এরা—এমনিতে ছলে-বলে-কৌশলে তোমাকে সর্বস্বান্ত করবে, আবার কাউকে বাড়াবাড়ি রকমের টাকা খরচ করতে দেখলে পুলিশ ডাকবে! কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না আর কী। যা হোক, খবর পেয়ে দু'জন পুলিশ অফিসার দেখা করতে যায় মেয়েটির সঙ্গে। কিন্তু দরজায় তাদের টোকা শুনে ঘাবড়ে যায় সে, মদের নেশায় বেরিয়ে পড়ে ব্যালকনিতে, সেখান থেকে লাফ দেয় নিচে। বেচারি... ওর কামরা যে একুশ তলায়, সেটা মনে ছিল না।'

'মেয়েটির নাম কি জুলিয়া ফিনিঙ্গার?' অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ল রানা।

'তুমি জানলে কী করে?' একটু অবাক হলো মিশেল। 'কমোডর ব্যালফোর বলেছেন?'

'উনি আমাকে কিছুই বলেননি, আমি নিজেই খোঁজখবর নিয়েছি,' বলল রানা। 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, পুলিশকে ভুল বুঝেছিল জুলিয়া। ভেবেছিল, স্বামী-হত্যার অভিযোগে ওকে গ্রেফতার করতে এসেছে ওরা।'

'হ্যাঁ, আমাদেরও তা-ই ধারণা,' একমত হলো মিশেল। 'মেয়েটি মারা যাবার পর তার কামরা তল্লাশি করে পুলিশ। ওর সুটকেস থেকে বেরোয় প্রায় পাঁচ লাখ ডলার। সেগুলো পাঠিয়ে দেয়া হয় ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জালিয়াতির ব্যাপারটা বুঝতে পারি আমরা। নেভাদা পুলিশের কাছ থেকে টেকওভার করি কেসটা। আমি সেই কেসের কেস-অফিসার।'

'বুঝলাম। কিন্তু জুলিয়া ফিনিঙ্গারের মৃত্যুর খবর কেউ জানে না কেন?'

'আমরাই ধামাচাপা দিয়েছি। কেসটা খুব সিরিয়াস, রানা। জুলিয়ার ডলারগুলো যে ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের হাতে পৌঁছেছে, সেটা জানাতে চাইছি না কাউকে।'

'সিরিয়াস বলছ কেন? ডলার-জালিয়াতি তো হরহামেশাই হচ্ছে।'

'এবারের মত নয়। কী বলেছি, খেয়াল করো। ডলারগুলো প্রায় নিখুঁত—ইনটাগ্লিয়ো প্রেসে ছাপা। প্রাইভেট লেভেলে কারও পক্ষে এত নিখুঁত কারেন্সি তৈরি করা সম্ভব নয়। এমন উচ্চ মানের নোট শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় লেভেলের প্রেসে তৈরি হয়।'

'কী বলতে চাইছ... আমেরিকার কোনও শত্রু-রাষ্ট্র তাদের জাতীয় প্রেসে নকল ডলার তৈরি করছে?'

'হ্যাঁ। অপারেশন বার্নহার্ডের কথা শুনেছ?'

ইতিহাসের জ্ঞান হাতড়াতে হলো রানাকে। দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধের সময়কার এক ষড়যন্ত্রের নাম অপারেশন বার্নহার্ড—নকল ব্রিটিশ পাউণ্ড তৈরির এক জার্মান প্রজেক্ট। মেজর বার্নহার্ড ক্রুগার নামে এক এসএস অফিসার ছিল প্রজেক্টের দায়িত্বে... তার নামেই পরিচিত অপারেশনটা। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের বন্দিদের কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হতো জাল নোট, ছড়িয়ে দেয়া হতো বাজারে। হিটলার চেয়েছিল, জাল নোটের বন্যা বইয়ে দিয়ে ধস নামাবে ব্রিটেনের অর্থনীতিতে। একটা হিসাব অনুসারে প্রায় একশো ত্রিশ মিলিয়ন পাউণ্ডের জাল নোট তৈরি করা হয়েছিল ওই প্রজেক্টে।

'মনে পড়েছে,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল রানা। 'এটা তা হলে সে-রকম আরেকটা ষড়যন্ত্র?'

'আমাদের তা-ই বিশ্বাস,' বলল মিশেল। 'তার ওপর যখন জানলাম, জুলিয়া আসলে ওয়ালপ্‌স্‌ আইল্যাণ্ডের একজন জেনারেল সুপারভাইজরের স্ত্রী, স্বভাবতই চিন্তায় পড়ে গেলাম আমরা।'

একটু একটু করে ছিন্ন সূত্রগুলো জোড়া লাগতে শুরু করেছে রানার মাথায়। রকেট লঞ্চ বানচাল করতে চাইছে কেউ, আর সে-কাজের জন্যে বেছে নেয়া হয়েছিল জোসেফ ফিনিঙ্গারকে। পাঁচ লাখ ডলার ঘুষ দেয়া হয়েছিল স্যাবোটাজ করার জন্যে। একই সঙ্গে তাকে ঠকাবার মতলবও ফাঁদা হয়েছিল—আসল ডলারের বদলে ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল জাল নোট। জুলিয়ার সে-খবর জানার কথা নয়, স্বামীকে ঘৃণা করত সে, জোসেফ যখন টাকা নিয়ে বাড়িতে ফিরল, সেটাই সুবর্ণ সুযোগ হয়ে দেখা দিল তার সামনে। স্বামীকে খুন করে টাকা নিয়ে লাস ভেগাসে পালিয়ে গেল সে। হোটেলে পুলিশ উদয় হওয়ায় ভাবল, খুনের অভিযোগে তাকে অ্যারেস্ট করতে এসেছে তারা। মদের নেশায় ব্যালকনি থেকে লাফ দিয়ে বসল... বলতে গেলে পুরোটাই বসে যাচ্ছে খাপে

খাপে। খটকা রয়ে গেছে কেবল একটা জায়গায়।

'ঠিক কী কাজের জন্যে টাকা পেয়েছিল ফিনিঙ্গার, তা কি জানতে পেরেছ?' মিশেলকে জিজ্ঞেস করল ও।

'না।'

'কিন্তু সেটার সঙ্গে নিশ্চয়ই ওয়ালপ্স্ আইল্যাণ্ডের রকেট লঞ্চের সম্পর্ক আছে।'

'এন.আর.এল. তা মানতে রাজি নয়। এ-ধরনের স্যাবোটাজ করে নাকি কারও কোনও লাভ হবে না। আমেরিকারও কোনও ক্ষতি হবে না আনম্যানড্ একটা রকেট ধ্বংস হলে। ক্ষতি করতে চাইলে আমেরিকান স্পেস প্রোগ্রামে বড় বড় আরও বহু টার্গেট রয়েছে।'

কথাগুলো নতুন নয়, কমোডর ব্যালফোরের মুখে শুনে এসেছে রানা। তাই আর আলোচনায় গেল না। প্রশ্ন করল, 'নিয়রবর্গে কেন গিয়েছিলে তুমি? জাল নোটের সঙ্গে ওখানকার কী সম্পর্ক?'

'কপালজোরে একটা লিড পেয়ে গিয়েছিলাম, বুঝলে?' বলল মিশেল। 'গত বছরের একটা ঘটনা মনে পড়ে গিয়েছিল। নিউ ইয়র্কের এক গাড়ির শো-রুমে একটা নতুন গাড়ির জন্যে কয়েক হাজার ডলার নগদ অ্যাডভান্স দিয়েছিল এক লোক। পুরনো ডিজাইনের নতুন নোট দেখে সন্দেহ হয় ম্যানেজারের, পুলিশে খবর দেয় সে। পুলিশ আবার কেসটা পাঠিয়ে দেয় আমাদের কাছে। নোটগুলো পরীক্ষার পর জাল বলে শনাক্ত করি আমরা। ঘটনাটা মনে পড়ায় পুরনো ফাইল চেক করি আমি—দেখতে পাই, ফিনিঙ্গার কেস আর গত বছরের নোটগুলো একই লটের। বৈশিষ্ট্যগুলো তো বটেই, সিরিয়াল নম্বরও একই সিরিজের।'

'গত বছর তোমার কেসটার তদন্ত করোনি?'

'করব না কেন? জাল নোট শনাক্ত হবার পর দু'জন এজেন্টকে পাঠানো হয়েছিল সেই গাড়ি-ক্রেতার কাছে। ঘটনা

শুনে লোকটা নিজেকে নির্দোষ দাবি করল। বলল, ব্যবসায় প্রচুর নগদ টাকার লেনদেন করে সে, কখন-কীভাবে কেউ তাকে জাল নোট গছিয়ে দিয়েছে, বুঝতে পারেনি। ব্যাখ্যাটা মেনে নিতে বাধ্য হই আমরা... না নিয়ে উপায়ও ছিল না। লোকটা অত্যন্ত নামকরা ব্যবসায়ী, সম্মানিত মানুষ, উঁচুমহলে তার প্রভাব-প্রতিপত্তিও মেলা। এমন একজন মানুষ জেনেশুনে নিজেকে জাল নোটের কারবারে জড়াবে না। তাই কেসটা ওখানেই চাপা পড়ে যায়। কার কথা বললাম এতক্ষণ, আন্দাজ করতে পারো? ক্লু দিই... লোকটা দক্ষিণ কোরিয়ান।'

'অ্যাণ্ডি লিম,' শান্ত গলায় বলল রানা।

'কারেক্ট।' চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল মিশেল। 'দুটো কেসের মাঝে যোগসূত্র পাবার পর আমি লিমের ফাইল চেক করলাম। অফিশিয়ালি তার বিরুদ্ধে কোথাও কোনও অভিযোগ নেই, কিন্তু আনঅফিশিয়ালি খুব কম লোকই তাকে ভালমানুষ বলবে। সন্দেহ হলো আমার। তা ছাড়া আমার লাইনে যে-কোনও তদন্তের ক্ষেত্রে টাকার গন্ধকে অনুসরণ করতে হয়। জাল নোটের একটা লট যেহেতু লিমের কাছ থেকে এসেছে, তাকেই ইনভেস্টিগেট করব বলে ঠিক করলাম। খোঁজ নিয়ে জানলাম, সে তখন জার্মানিতে—নিয়রবর্গরিঙে রেস দেখতে গেছে। তাই আমিও গেলাম ওখানে। বাকিটা তো তুমি জানোই।'

'সেদিনই এসব আমাকে খুলে বলা উচিত ছিল তোমার,' অনুযোগের সুরে বলল রানা।

'না বলার কারণ তো আগেই ব্যাখ্যা করেছি,' মিশেল বলল। 'তা ছাড়া ফটোগুলো দেখার সঙ্গে সঙ্গে কেসটার গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছিল কয়েক গুণ। জোসেফ ফিনিঙ্গার আর অ্যাণ্ডি লিমের মাঝে কানেকশন পেয়ে গিয়েছিলাম কিনা। গোপনীয়তা অবলম্বন করা জরুরি হয়ে পড়েছিল। তা ছাড়া, তুমিও তো নিজের পরিচয় বলোনি এখন পর্যন্ত। নিজেকে

ইনভেস্টিগেটর বলে পরিচয় দিয়েছ, কিন্তু সেটার অনেক রকম অর্থই হতে পারে। আসলে কে তুমি?'

সব খুলে বলার সিদ্ধান্ত নিল রানা। লুকোচুরির প্রয়োজন ফুরিয়েছে... মিশেল যেহেতু রাখঢাক করেনি, ওরও সেটা করা উচিত হবে না। তা ছাড়া ওর জীবন বাঁচিয়েছে মেয়েটা, সময়মত মোটেলের কম্পাউণ্ডে হাজির না হলে রানার পরিণতি ভিন্ন কিছু হতে পারত। সবচেয়ে বড় কথা, একই শত্রুর পেছনে ছুটছে দু'জনে। পরস্পরকে সাহায্য করলে লাভ বৈ ক্ষতি হবে না।

'বেশ,' বড় করে শ্বাস ফেলল রানা। তারপর একে একে খুলে বলল নিজের পরিচয় আর মিশন সম্পর্কে। শুনতে শুনতে চোখ বড় হয়ে গেল মিশেলের।

'মাই গড!' বলল সে। 'তুমি একজন স্পাই?'

'এসপিয়োনাজ এজেন্ট,' শুধরে দিল রানা। 'স্পাই শব্দটা ভাল শোনায় না। তা ছাড়া, এখন সে-অর্থে গুপ্তচরগিরিও করতে হয় না আমাকে। দিনকাল পাল্টে গেছে।'

'তারপরও ব্যাপারটা খুবই এক্সাইটিং। এই প্রথম আমি কোনও বিদেশি স্পাই... মানে, এসপিয়োনাজ এজেন্টকে সামনাসামনি দেখছি।'

'বাই দ্য ওয়ে, তোমাকে ধন্যবাদ জানানো হয়নি। আমার কপাল ভাল, এক্কেবারে ঠিক সময়ে হাজির হয়েছিলে মোটেলে। আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ।'

'কপালের কোনও ভূমিকা নেই ওতে,' হাসল মিশেল। 'আমি নজর রাখছিলাম মোটেলের ওপর।'

'কিন্তু আমি যে ওখানে উঠেছি, তা জানলে কী করে?'

'সেটা অবশ্য কিছুটা ভাগ্যের জোরে। হয়েছে কী... আমার ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে জার্মানিতে পাওয়া ছবিগুলোর কপি পাঠিয়েছিলাম এন.আর.এল.-এ। কিন্তু ওরা পাত্তাই দিল না। আমাকে তাই ওয়ালপ্স্ আইল্যাণ্ডে আসতে হলো

ফিনিঙ্গারের ব্যাপারে ভালমত খোঁজখবর নিতে। ভেবেছিলাম, কিছু তথ্য-প্রমাণ জোগাড় করে কমোডর ব্যালফোরকে দেখাব, যাতে বিপদের মাত্রাটা বুঝতে পারেন তিনি। ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের নাম শুনলে ঢুকতে দেবেন না, তাই এক ভুয়া এফবিআই এজেন্টের পরিচয়ে গিয়েছিলাম ওখানে। তখনই তোমাকে দেখলাম। কেন গেছ যেহেতু জানি না, ভাবলাম অনুসরণ করব। আর তা করতে গিয়ে আরেকটা গাড়িকে দেখলাম... তোমাকে ফলো করছে। পুরো ব্যাপারটাই ঘোলাটে মনে হচ্ছিল, তাই নজর রাখতে শুরু করেছিলাম মোটেলের ওপর।'

'খুব ভাল করেছ,' বলল রানা। 'যাক গে, এখন তো বুঝতে পারছ, আমরা একই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছি। একসঙ্গে কাজ করলে সুবিধে হবে। নাকি সকাল হতেই আবারও পালিয়ে যাবে?'

'না, পালাব না,' বলল মিশেল। 'অফিসে একটু কথা বলে নিতে হবে, তবে ওরাও আপত্তি করবে বলে মনে হয় না। চলো, ওঠা যাক। স্যালিসবারির কাছেই একটা হোটেলে উঠেছি আমি।'

'আবারও সোফায় রাত কাটাতে হবে আমাকে?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল রানা।

হেসে ফেলল মিশেল। 'তার প্রয়োজন নেই। ওখানে খালি রুম পাবে। চলো, যাই। বিশ্রাম দরকার। সকালে নাহয় আলোচনা করে ঠিক করে নেব, কীভাবে এগোনো যায়।'

ওয়েইট্রেসকে ডেকে অর্ডার ক্যানসেল করল ও। ক্ষতিপূরণ হিসেবে বাড়তি কিছু টাকা গুঁজে দিল কফির বিলের সঙ্গে। এরপর দু'জনে বেরিয়ে এল ডাইনার থেকে। পুবের আকাশ তখন ফর্সা হতে শুরু করেছে, সূর্য উঠতে দেরি নেই। সূচনা হতে চলেছে রকেট লঞ্চের আগে শেষ দিনটার।

তেরো

ধীরে ধীরে ঘুম ভাঙল রানার। গত রাতের ঘটনাগুলো যেন জগদ্দল পাথরের মত চেপে ছিল ওর ওপর, সেগুলোকে ঠেলে সরিয়ে সজাগ হতে হলো ওকে। চোখ মেলতেই দেখল সাদা ছাত আর দেয়াল—সাদামাঠা একটা কামরায় শুয়ে আছে ও, একা। গায়ের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে নেমে পড়ল বিছানা থেকে। জানালার পর্দা টানা, কিন্তু কড়া রোদ তার বাধা না মেনে আলোকিত করে রেখেছে কামরার ভেতরটা। এগিয়ে গিয়ে পর্দা সরাল ও, তাকাল বাইরে। চোখে পড়ল প্যাটিয়ো আর সুইমিং পুল—পানি কেটে সাবলীল ভঙ্গিতে ওখানে সাঁতার কাটছে কে যেন, শেষ প্রান্তে পৌঁছে ডিগবাজি দিয়ে মুখ ঘোরাল... আবার ফিরে আসছে এদিকে।

সাঁতার কাটতে থাকা মেয়েটি যে মিশেল, তা বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। ভেসে আছে তার উন্মুক্ত কাঁধ আর মুখ, সুগঠিত হাতদুটো নিপুণ ছন্দে পানিতে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে। দীঘল চুলের রঙ গাঢ় দেখাচ্ছে পানিতে ভিজে, যেন চুমো খাচ্ছে ওর ঘাড়ে। স্কিন কালারের একটা কস্টিউম পরেছে মিশেল, হঠাৎ দেখায় ওকে নগ্ন বলে ভ্রম হয়। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রানা, তারপর উল্টো ঘুরল। পর্দা টেনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ফোন নিয়ে। কয়েক জায়গায় কথা বলল, তারপর ঢুকে পড়ল বাথরুমে।

আধঘণ্টা পর, হোটেলের রেস্টুরেন্টে ওর সঙ্গে যোগ দিল

মেয়েটা। রানা তখন ব্রেকফাস্ট নিয়ে বসেছে। বুফে বার থেকে হালকা কয়েকটা আইটেম নিয়ে রানার টেবিলে এসে বসল মিশেল। চুল ভেজা।

'অ্যাণ্ডি লিম আমেরিকায় ফিরে এসেছে,' ওকে জানাল রানা। 'এফবিআই থেকে খবর নিয়েছি আমি। দু'রাত আগে নিউ ইয়র্কে ল্যাণ্ড করেছে তার প্রাইভেট জেট। গতকাল ওকে নিউ জার্সির প্যাটারসনে একটা কম্পাউণ্ডে ঢুকতে দেখা গেছে। ওখান থেকে আর বেরোয়নি।'

'ব্লু ডায়মণ্ডের কম্পাউণ্ড? ওটা তার কনস্ট্রাকশন কোম্পানির নাম।'

'হ্যাঁ। কম্পাউণ্ডের ভেতরে একটা ডিপো রয়েছে।'

'ছবি দেখেছি জায়গাটার,' বলল মিশেল। 'নিউ ইয়র্ক আর নিউ জার্সিতে প্রচুর কাজ করে ওর কোম্পানি, ওখানে রাখা হয় সমস্ত হেভি মেশিনারি আর ইকুইপমেন্ট—এক্সক্যাভেটর, ডাম্প ট্রাক, লো-বয়... এসব আর কী। সিকিউরিটি খুব কড়া। চারদিক বেড়া দিয়ে ঘেরা, ভেতরে রয়েছে পুরোদস্তুর একটা রক্ষীবাহিনী।' একটু ভাবল ও। 'ব্যাপারটা সন্দেহজনক। এত পাহারার প্রয়োজন কী? কী করছে সে ওখানে?'

'উঁকি দিয়ে দেখে আসা দরকার, কী বলো?' দুষ্টুমিমাখা সুরে বলল রানা। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সে যাবার। স্যালিসবারিতে বসে থেকে কোনও লাভ নেই। এন.আর.এল.-কে ও যেমন সতর্ক করে দিয়েছে, তেমনি সতর্ক করে দিয়েছে ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টকেও। এরপরেও রকেট লঞ্চ পিছাতে রাজি হয়নি ওরা। কাজেই এখানে বসে থেকে লাভ নেই কোনও। তারচেয়ে লিমের আস্তানায় হানা দেয়া যাক। লঞ্চের ঠিক আগের দিন সে ওখানে বসে আছে কেন, জানা দরকার। কিছু একটা উদ্দেশ্য তো আছে নিশ্চয়ই।

'ওখানে কী পাবে বলে ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল মিশেল।

'জানি না। ভেতরে ঢুকতে পারলে হয়তো বা তার আভাস পাব।'

'আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'

'তা তো বটেই। দলে ভারী হলে আমারই সুবিধে। তা ছাড়া গত রাতেই বুঝেছি, বিপদ মোকাবেলা করতে জানো তুমি। তোমার ওপর নিশ্চিন্তে ভরসা করা যায়।'

'থাক, আর পাম দিতে হবে না। খাওয়া শেষ হলে ওঠো। নিউ জার্সি যেতে অনেক সময় লাগবে।'

মেরিল্যাণ্ড থেকে নিউ জার্সি সাত ঘণ্টার রাস্তা। এস.ইউ.ভি-টা নিল না ওরা, শত্রুরা চিনে ফেলতে পারে; তার বদলে কার রেন্টাল থেকে ভাড়া নিল একটা সাধারণ চেহারার শেভ্রোলে সেডান। ট্যাঙ্কিতে তেল ভরে নেমে পড়ল রাস্তায়। রানা ড্রাইভ করছে, গাড়িকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে উদ্দাম গতিতে। সামনে দিগন্তবিস্তৃত সবুজ প্রকৃতি। ছোটখাট কিছু পাহাড় আছে, জনবসতি কম, শহর-টহর তো নেই বললেই চলে। আঁকা-বাঁকা পথ ধরে এগোবার সময় মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে ফার্মহাউস, পুকুর, আবাদি জমি, আর পশুচারণ ক্ষেত্র। এলাকাটা কৃষিপ্রধান। ড্রাইভ করছে, আর মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাচ্ছে রানা—জায়গাটা অপূর্ব।

রানার পাশে বসে আছে মিশেল। খোলা জানালা দিয়ে ছুটে আসা উদ্দাম বাতাসে ওর সুন্দর চুল উড়ছে। সঙ্গীর ঠোঁটে হালকা হাসি দেখে ও জানতে চাইল, 'হাসছ কেন?'

'আমি কত ভাগ্যবান, সেটা ভেবে,' বলল রানা। 'তাকিয়ে দেখো, দৃশ্যটা কত সুন্দর! অপরূপা এক সঙ্গিনীকে নিয়ে এর মাঝ দিয়ে লং ড্রাইভে বেরিয়েছি... ভাগ্য আর কাকে বলে!'

'ভাগ্য না, বলো নিয়তি,' গম্ভীর মিশেল। 'বেড়াতে যাচ্ছি না আমরা, কাজে যাচ্ছি। কাজ-টাজ বাদ দিয়ে যদি কোথাও হারিয়ে যেতে পারতাম, তা হলে নাহয় নিজেকে ভাগ্যবতী

ভাবতাম।'

'হারিয়ে যেতে কে মানা করছে?' রানা ভুরু নাচাল। 'একটু আগে চমৎকার একটা সরাইখানা পেরিয়ে এলাম। হাতের কাজ শেষ করে ওখানে ফিরে আসতে পারি আমরা। শুধু তুমি আর আমি... কয়েকটা দিন...'

'লোভ দেখিয়ো না,' কপট মিনতি করল মিশেল। 'সত্যি সত্যি গাড়ি ঘোরাতে বলতে পারি।'

হাসি-ঠাট্টায় উপভোগ্য হয়ে উঠল সময়টা।

'আচ্ছা,' হঠাৎ জানতে চাইল রানা, 'তুমি ট্রেজারির এজেন্ট হতে গেলে কেন?'

'মানে?' ভ্রূকুটি করে গ্রীবা বাঁকাল মিশেল।

'না, মানে... কথাটা অন্যভাবে নিয়ো না... আমি বলছিলাম যে, তোমার মত সুন্দরী মেয়ের জন্যে ফ্যাশন মডেলিং বা অভিনয়ের জগৎ আদর্শ হতে পারত। কিংবা লেখাপড়া শেষ করে সাধারণ কোনও চাকরিও নিতে পারতে। সেদিকে না গিয়ে একটা বিপজ্জনক পেশায় এলে কেন?'

'কেন জানতে চাও?'

'একসঙ্গে কাজ করতে চলেছি, দু'জন পরস্পরকে ভালমত জেনে-বুঝে নিলে সুবিধে হয়। অবশ্য যদি বলতে না চাও তো অসুবিধে নেই।'

'না, গোপন করার মত কিছু নয়,' রাস্তার দিকে চোখ ফেরাল মিশেল। উদাস হয়ে উঠেছে চেহারা। 'তবে বড় গলায় বলার মতও না। খুব সাধারণ পরিবারে আমার জন্ম। কোনি আইল্যাণ্ডের রেলওয়ে ডিপোর পেছনে ছিল আমাদের বাড়ি। ডিপোর বেড়ার একটা জায়গা ছিল ভাঙা, সেখান দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ত বাচ্চারা, খেলাধুলা করত রেলের ট্র্যাকে... ছোটবেলায় ওটাই ছিল আমার জগৎ।

'খুব মদ খেত আমার বাবা... আর সেই মদই তাকে খেল, আমার তখন ছ'বছর বয়স। আমার মা খুব চেষ্টা করল

আমাকে আগলে রাখতে, পারল না। তিন বেলার খাবার জোটাবার জন্যে দিনরাত কাজ করতে হতো তাকে, বাড়িতে আমি একা রয়ে যেতাম। আস্তে আস্তে রাস্তার ছেলেদের সঙ্গে মিশতে শুরু করলাম। ওদের সঙ্গে খেলাধুলা আর মারামারি করতে করতে বড় হলাম আমি। তেরো বছর বয়সে ঢুকে পড়লাম কার্নিভালে। অনেক ছেলেমেয়েই ঢোকে। সহজে টাকা কামানো যায়, কেউ কোনও প্রশ্নও করে না। তিন মাস একটা সাইড শো-তে কাজ করলাম। ওখানে আমি ছিলাম "*গ্রেটা, দ্য হেডলেস গার্ল।*" কাঁচের তৈরি একটা বাক্সে বসে থাকতাম, মাথাটা ঢেকে দেয়া হতো কারসাজি করা আয়না দিয়ে। দূর থেকে দেখলে মনে হতো, মুণ্ডুহীন একটা ধড় বসে আছে বুঝি। সে-অবস্থায় হাত-পা নাড়তাম, দর্শকরা ভয়ে আঁতকে উঠত। আমিও মজা পেতাম খুব। সপ্তাহে বিশ ডলার করে বেতন দিত ওরা আমাকে।

'কার্নিভালেই মোটরসাইকেল চালানো শিখলাম আমি, হেডলেস গার্লের অভিনয় ছেড়ে ঢুকে পড়লাম ওয়াল অভ ডেথে। নাম শুনেছ নিশ্চয়ই খেলাটার? মোটরসাইকেল চালিয়ে একটা পিপের মত গর্তের দেয়াল ধরে ওঠানামা করতে হয়। কাজটা খুবই বিপজ্জনক... আমি মেয়ে বলে দর্শকরা আরও বেশি আকৃষ্ট হতো। *লিটল মিস ডেয়ারডেভিল* বলত ওরা আমাকে।

'বিপজ্জনক কাজের সঙ্গে আমার জড়িয়ে পড়ার এ-ই হলো ইতিবৃত্ত। কার্নিভালের জীবনটা খুব উপভোগ করতাম আমি, হয়তো আজও রয়ে যেতাম ওখানে... কিন্তু হঠাৎ আমার মা-ও মারা গেল। লিভার ক্যান্সার হয়েছিল, শেষ মুহূর্তের আগে জানতেই পারিনি আমরা। অনাথ হয়ে গেলাম। এ-সময় দূর সম্পর্কের এক চাচা উদয় হলেন, আগে কোনোদিন দেখিনি তাঁকে... আমাকে এক রকম জোর করেই নিয়ে গেলেন ওয়াশিংটনে। ওখানেই আমার জীবন বদলে

গেল। চাচা-চাচি খুব ভাল মানুষ ছিলেন, নিজেদের কোনও সন্তান ছিল না তাঁদের, আমাকেই সন্তানের মত কাছে টেনে নিলেন। সন্তানকে যেভাবে মানুষ করতে হয়, সেভাবেই নিজেদের কাঁধে তুলে নিলেন দায়িত্ব। আমার উড়নচণ্ডী জীবনের রাশ টেনে ধরলেন তাঁরা, ভর্তি করে দিলেন স্কুলে। ধীরে ধীরে সভ্য, সামাজিক হয়ে উঠলাম। তবে ভেতরে ভেতরে রোমাঞ্চের নেশাটা রয়েই গিয়েছিল। তাই লেখাপড়া শেষ করে যখন জীবিকা খোঁজার পালা এল, যোগ দিলাম ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টে... ইনভেস্টিগেটর হিসেবে। ব্যস, এ-ই তো।'

'ইন্টারেস্টিং,' মন্তব্য করল রানা।

'এবার তোমার পালা,' ওর দিকে ফিরল মিশেল। 'ভেবো না আমার গল্প শুনে পার পেয়ে যাবে। আমিও তোমারটা শুনব। দুনিয়ায় এত পেশা থাকতে তুমিই বা কেন এসপিয়োনাজে যোগ দিয়েছ?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'অনেকটা তোমার মতই... চাচার প্রভাবে। আমার চাচা এরফান চৌধুরি এককালে স্পাই ছিলেন...'

নিজের জীবনকাহিনী বলতে শুরু করল ও। গাড়ি ছুটে চলল গন্তব্যের পানে।

ব্লু-ডায়মণ্ড কনস্ট্রাকশন ডিপোর কাছে রানা আর মিশেল যখন পৌঁছুল, তখন সূর্য পাটে বসেছে। ঘড়িতে পাঁচটা বাজে। আর ঠিক ত্রিশ ঘণ্টা পর ওয়ালপ্‌স্‌ আইল্যাণ্ডের রকেট লঞ্চ।

কম্পাউণ্ডের দিকে তাকিয়ে বিভ্রান্ত বোধ করল রানা। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিগার, ফর্কলিফট, গার্বেজ ট্রাক, কাঁটাতারের বাণ্ডিল, সিমেণ্ট ব্লক, ইত্যাদিতে ভরা একটা কনস্ট্রাকশন ডিপোর সঙ্গে সাড়ে চারশো মাইল দূরের লঞ্চসাইটের কী সম্পর্ক? এখান থেকে কী-ই বা ক্ষতি করা যাবে ওখানকার?

অ্যাণ্ডি লিম কেন ঘাঁটি গেড়েছে ভেতরে?

গাড়িটা একটু দূরে রেখেছে ওরা, টিলার মত মাটির এক উঁচু ঢিবির মাথায় উপুড় হয়ে শুয়ে তাকিয়ে আছে কম্পাউণ্ডের দিকে। রাস্তা ধরে একটা ট্রাককে এগিয়ে আসতে দেখল, মেইন গেটের সামনে পৌঁছে থামতে হলো ওটাকে। সশস্ত্র কয়েকজন গার্ড এগিয়ে এল, কাগজপত্র চেক করল, ড্রাইভারের শরীরতল্লাশি করল, গাড়ির ওপর-নিচ ভালমত দেখল, তারপর ট্রাকটাকে ঢুকতে দিল ভেতরে।

মিশেলের কথাই ঠিক, খুব কড়া সিকিউরিটি। চেইন-লিঙ্কের উঁচু ফেন্স দিয়ে ঘেরা হয়েছে পুরো সীমানা, ফেন্সের উপরে বসানো হয়েছে কাঁটাতারের কুণ্ডলী। একতলা একটা গার্ডহাউস রয়েছে মেইন এণ্ট্রান্সের পাশে, সেখানে অস্ত্রহাতে পাহারা দিচ্ছে ছ'জন গার্ড। কম্পাউণ্ডের ভেতরেও টহল দিচ্ছে কয়েকজন। বেশিরভাগই কোরিয়ান। ওখানেই শেষ নয়, সারা কম্পাউণ্ডজুড়ে মাথা তুলে রেখেছে অসংখ্য মেটাল পোল—সেগুলোর ডগায় শোভা পাচ্ছে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা আর ফ্লাডলাইট। বেড়ার বিভিন্ন স্থানে ঝোলানো হয়েছে সতর্কবাণী: *সাবধান! ব্যক্তিগত সম্পত্তি! বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ।*

যেন দুর্ভেদ্য এক দুর্গ বানিয়ে রাখা হয়েছে জায়গাটাকে। কেন, তা বোঝা যাচ্ছে না।

কম্পাউণ্ডের বাম প্রান্ত দখল করে রেখেছে অতিকায় এক ওয়্যারহাউস—প্রায় তিনতলা উঁচু। সেটার ছাত ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে মোটা এক চিমনি। ওয়্যারহাউসের বিশাল দরজা খুলে যেতে দেখল রানা, একটা লোডার ঢুকছে। ভেতর থেকে ভেসে এল নানা ধরনের মেশিনারির আওয়াজ। বালবের আলোয় কয়েকটা গ্যান্ট্রি দেখতে পেল, তারপরেই আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

ওয়্যারহাউসের উল্টোপাশে রয়েছে অফিস-বিল্ডিং আর

লিভিং কোয়ার্টার। শ'খানেক গাড়ি রাখার মত একটা পার্কিং এরিয়া আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লকও দেখা গেল। কিন্তু লিম কোথায়? তার বাসস্থানটা এক দেখাতেই চেনা গেল। কোর্টইয়ার্ডের মত বিশাল এক আঙিনার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে একটা রাজকীয় বাড়ি, ডিজাইনটা খুব চেনা চেনা লাগছে রানার। সাদা রঙের একটা দোতলা বিল্ডিং, উনিশ শতকের নির্মাণশৈলীতে গড়া, আমেরিকান নয় মোটেও। একটু ভাবতেই মনে পড়ে গেল। ছোটবেলায় ইটন কলেজের ছাত্র হিসেবে স্টাডি ট্যুরে যেতে হয়েছিল ওখানে—লণ্ডনের উত্তরে, হ্যাম্পস্টেডে... কবি জন কিটসের সেই বিখ্যাত বাড়ি। এই বিল্ডিংটা তার হুবহু নকল।

এবার বর্তমান সমস্যার দিকে মনোযোগ দিল রানা। ভেতরে ঢুকবে কীভাবে? ঘড়ির কাঁটা যে টিক টিক করে এগিয়ে চলেছে, সে-ব্যাপারে সচেতন। ওয়ালপ্স্ আইল্যাণ্ডে এতক্ষণে ফাইনাল চেকিং শুরু হয়ে গেছে, আগামীকাল রাত এগারোটায় ওদের রকেট মহাশূন্যের পথে যাত্রা করবে। তার আগেই লিমের কুপরিকল্পনা জানতে হবে ওকে, পাল্টা ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু কম্পাউণ্ডে ঢোকার কোনও রাস্তা চোখে পড়ছে না। বেড়া কেটে ঢোকা যাবে না... সে-ধরনের অনুপ্রবেশ ঠেকানোর মত অ্যালার্ম সিস্টেম আছে নিশ্চয়ই। দিনের আলোয় ঢোকার চেষ্টাও বোকামি। পুরো কম্পাউণ্ড জুড়ে ঘোরাফেরা করছে মানুষ—গার্ড যেমন আছে, তেমনি আছে অসংখ্য শ্রমিক। এত লোকের চোখ ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়। তারমানে যা করার তা করতে হবে রাতের আঁধারে। আর ঢুকতে হবে ওই মেইন গেট দিয়েই।

উঠে পড়ল ওরা। গাড়িতে চড়ে ফিরে চলল শহরের দিকে। একটা রেস্টুরেন্ট খুঁজে নিয়ে ডিনার করতে বসল। ইতিমধ্যে একটা প্ল্যান খাড়া করেছে রানা, মিশেলকে খুলে বলল সেটা। শুরুতে মিশেল তাতে আপত্তি জানাল; রানার

সঙ্গে ও-ও ঢুকতে চায় ভেতরে। দশ মিনিট ধরে তাকে বোঝাল রানা, রাজি করাল ওর প্ল্যান মোতাবেক কাজ করতে।

'কাজটা আমি তোমার সাহায্য ছাড়া করতে পারব না, মিশেল,' শেষে বলল ও। 'তবে কথা দিচ্ছি, ভেতরে যা-ই পাই, তা সবার আগে তুমি জানবে।'

রাত একটু বাড়লে ওরা ফিরে গেল কনস্ট্রাকশন ডিপোর কাছে। বাতাস বইছে না, আকাশের চাঁদ ঢাকা পড়ে গেছে মেঘের আড়ালে, পুরো এলাকায় তাই জমে বসেছে আঁধার। কম্পাউণ্ডের ভেতর জ্বলতে ঢাকা কিছু নিঃসঙ্গ বাতি ছাড়া সবখানে ছায়ার রাজত্ব। বিকেলে দেখা কর্মব্যস্ততা আর নেই ডিপোয়, খোলা জায়গায় এখন আর কাজ করছে না কেউ। কাজ চলছে শুধু ওয়্যারহাউসে—হেভি মেশিনারির চাপা গুমগুম আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে রানা, আবছাভাবে কাউকে হাঁকডাক দিতেও শুনল। বাতাসে ধুলো আর পোড়া তেলের গন্ধ। মেইন গেট দিয়ে মাঝে মাঝে ঢুকছে-বেরুচ্ছে একটা-দুটো গাড়ি। মনে মনে খুশি হলো রানা, রাতের অপারেশনের জন্যে একেবারে আদর্শ পরিবেশ।

হঠাৎ ইঞ্জিনের ভারী আওয়াজ শোনা গেল, এরপরেই দেখা গেল উজ্জ্বল আলো... ধীরে ধীরে বাড়ছে। রাস্তা ধরে একটা ট্রাক এগিয়ে আসছে কম্পাউণ্ডের দিকে। মিশেলের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা, তারপরেই দু'জনে ঝটপট নেমে এল মাটির ঢিবি থেকে। ট্রাকটা ওদেরকে পেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, এরপর এগোল ওটার পিছু পিছু। গতি ইতিমধ্যে কমিয়ে এনেছে ড্রাইভার, অনুসরণ করতে অসুবিধে হলো না। ট্রাকের আড়ালে থাকায় দেখা যাচ্ছে না ওদেরকে, গাঢ় রঙের পোশাক পরায় ছায়াতেও মিশে রয়েছে খানিকটা—ধরা পড়ার সম্ভাবনা নেই।

গেটের সামনে পৌঁছে ব্রেক কষল ট্রাক, রানা-মিশেল থেমে দাঁড়াল ওটার বিশ গজ তফাতে। পায়ের আওয়াজ আর মানুষের গলা শোনা গেল, গার্ডহাউস থেকে চারজন প্রহরী বেরিয়ে এসেছে ড্রাইভার ও তার বাহন চেক করতে।

'যাও,' চাপা গলায় মিশেলকে বলল রানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে পা বাড়াল মেয়েটা, স্বাভাবিক পদক্ষেপে হেঁটে এগিয়ে গেল গেটের দিকে। গার্ডরা থমকে দাঁড়াল, আঁধার থেকে অমন একজন ডানাকাটা পরী বেরিয়ে আসবে, আশা করেনি।

'এক্সকিউজ মি,' ওর গলা শুনতে পেল রানা, 'আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন? আমার গাড়িটা নষ্ট হয়ে গেছে। ওই যে... মেইন রোডে।'

'দাঁড়ান, ম্যাডাম। আপনি ভেতরে ঢুকতে পারবেন না...'

কিন্তু ততক্ষণে খোলা গেট পেরিয়ে ঢুকে গেছে মিশেল। গার্ডদের কথা না শোনার ভান করে এগিয়ে যাচ্ছে গার্ডহাউসের দরজার দিকে।

'আরে, আরে! কোথায় চললেন?'

'একটা ফোন করব। আমার সেলফোনের চার্জ শেষ হয়ে গেছে। ভেতরে ফোন আছে তো?'

'থামুন বলছি!'

হাঁ-হাঁ করে ওর দিকে ছুটে গেল তিন গার্ড। চতুর্থজন রয়ে গেল ড্রাইভারের পাশে। ব্যস, এটাই চাইছিল রানা। আড়াল থেকে বেরিয়ে দ্রুত এগোল ও। ট্রাকের অন্যপাশ দিয়ে অনায়াসে পেরিয়ে এল গেট, তারপর একছুটে লুকিয়ে পড়ল লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের পেছনে। ওখান থেকে উঁকি দিয়ে দেখল পরিস্থিতি।

ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছে মিশেল—গার্ডহাউসে সে ঢুকবেই। গার্ডরা কড়া গলায় বাধা দিচ্ছে ওকে। সন্দেহ নেই, বেশ কিছুক্ষণ চলবে এই কথা কাটাকাটি। শেষ পর্যন্ত হয়তো

হার মানবে গার্ডরা, বাধ্য হবে ওকে ফোন করতে দিতে। টো-ট্রাক ডাকার নাম করে আরও কিছুক্ষণ তাদেরকে ব্যস্ত রাখবে মিশেল। এই ফাঁকে রানা ঘুরে দেখবে কম্পাউণ্ডের ভেতরটা। কাজশেষে কোনও একটা ট্রাকের পেছনে চড়ে বেরিয়ে যাবে... বেরুনোর সময় খুব বেশি চেক করা হয় না গাড়িগুলো।

নিশ্চিন্ত হয়ে এবার কম্পাউণ্ডের দিকে নজর ফেরাল রানা। প্রথম বাধাটা সহজে পার হওয়া গেছে, এবার তল্লাশি চালাবার পালা। ওয়্যারহাউসেই প্রথমে ঢুকবে বলে ঠিক করেছে। লিমের সাদা বাড়ি আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লক নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না, সুযোগ পেলে ওগুলো পরে দেখবে। এত রাতে কী কাজ চলছে ওয়্যারহাউসে, সেটাই জানা দরকার আগে।

রওনা হবার আগে সিকিউরিটির অবস্থা দেখে নিল রানা। ফেন্সের কাছে কোনও ক্যামেরা নেই, ফ্লাডলাইটও জ্বলছে না। দূরের কিছু ক্যামেরা অবশ্য ফেরানো আছে সীমানার দিকে, সেগুলোয় নাইট ভিশনও থাকতে পারে, কিন্তু খুব বেশি নড়াচড়া না করলে মনিটরে ওকে শনাক্ত করা কঠিন হবে। কাজেই ফেন্স ঘেঁষে এগোবার সিদ্ধান্ত নিল। ওয়্যারহাউসটা বেশি দূরে নয়, হামাগুড়ি দিয়ে রওনা হলো ও। আড়াল নেবার মত জায়গা পেলেই থামছে, যাচাই করে নিচ্ছে পরিস্থিতি, তারপর ফের সামনে এগোচ্ছে। খানিক পরেই পৌঁছে গেল ওয়্যারহাউসের ধারে।

সামনের বিশাল স্লাইডিং ডোরদুটো বন্ধ। ঢোকার উপায় নেই। করোগেটেড আয়রনের দেয়াল ঘেঁষে ঘুরতে শুরু করল ও, দ্বিতীয় কোনও এণ্ট্রান্স পাওয়া যায় কি না দেখবে। পেয়েও গেল একটু পর। ওয়্যারহাউসের পেছনে একটা সার্ভিস ডোর। অব্যবহৃত। দরজার বাইরে উঁচু হয়ে জন্মেছে ঝোপ। পাল্লার গায়ে ঝুলছে অতিকায় এক তালা। তবে সেটা রানার

জন্যে কোনও সমস্যা নয়। প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে, জ্যাকেটের ভেতর থেকে বের করে আনল লক-পিকিং টুলস্। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল দরজার সামনে। একটু পরেই খুট করে খুলে গেল তালা। দরজার পাল্লা খুলতে একটু জোর খাটাতে হলো, বহুদিনের অব্যবহারে জ্যাম হয়ে গেছে কবজা। কয়েক দফা টানাটানির পর বিশ্রী আওয়াজ তুলে ফাঁকা হলো, তবে শব্দটা চাপা পড়ে গেল ভেতর থেকে ভেসে আসা ভারী যন্ত্রপাতির গর্জনে।

বেড়ালের মত নিঃশব্দে ওয়্যারহাউসে ঢুকে পড়ল রানা। হাতে বেরিয়ে এসেছে বিশ্বস্ত সিগ-সাওয়ার। বিপদ মোকাবেলার জন্যে তৈরি। তবে তেমন কিছু ঘটল না—কেউ টের পায়নি ওর অনুপ্রবেশ। দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল ও।

সামনে একটা লোহার সিঁড়ি, দু'পাশ কংক্রিটের দেয়াল দিয়ে ঢাকা। সেদিকে এগোল রানা, উঠতে শুরু করল সিঁড়ি ভেঙে, ওপর থেকে পুরো ওয়্যারহাউসটা ভাল করে দেখবে। তরতর করে একেবারে মাথায় উঠে গেল ও, বেরিয়ে এল একটা খোলা গ্যান্ট্রিতে। নিচে তাকিয়ে চমকে উঠল। যা দেখছে, তা অবিশ্বাস্য।

বিশাল একটা লো-বয় ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে ওয়্যারহাউসের ঠিক মাঝখানে। ওটার ট্রেইলারে শুয়ে আছে একটা রকেট—শেকল দিয়ে বাঁধা। ওয়ালপ্স্ আইল্যাণ্ডে যে-রকেটটা দেখে এসেছে রানা, সেটারই যমজ যেন। এমনকী রঙ আর গায়ে আঁকা সবগুলো প্রতীক হুবহু এক। পার্থক্য এটুকুই যে, এখানকারটা উৎক্ষেপণের উপযোগী নয়। শুধুমাত্র দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্টেজের অংশদুটো শুয়ে আছে ট্রেইলারে—মানে নোজ কোন থেকে শুরু করে অক্সিডাইজার ট্যাঙ্ক আর রকেট মোটর পর্যন্ত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ... মানে ফার্স্ট স্টেজ, যার সাহায্যে রকেটকে প্রপেল করা হয়, সেটাই নেই। আরও খারাপ খবর হলো, ফার্স্ট স্টেজের

অংশটা যেন কাটা পড়েছে। রকেটের গোড়ার অংশ এবড়ো-খেবড়ো, ছেঁড়া-ফাটা... যেন কোনও অতিকায় দৈত্য তার হাত দিয়ে মুচড়ে ওটাকে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। রকেটটাকে বাঁধাছাঁদার কাজ করছে জনাছয়েক কোরিয়ান। আরেকদলকে দেখা গেল বড় একটা তারপুলিনের রোল খুলতে। বুঝতে অসুবিধে হলো না, ওই তারপুলিন দিয়ে ঢেকে রকেটটা নিয়ে যাওয়া হবে কোথাও।

আশপাশে তাকিয়ে রানা টের পেল, এই ওয়্যারহাউস ওর পরিচিত। জার্মানিতে... লিমের অফিস থেকে পাওয়া ছবিতে এখানকার দৃশ্যই দেখেছিল ও। নিচে আবার চোখ ফেরাল রানা। দ্বিতীয় একটা লোড দেখতে পাচ্ছে ওয়্যারহাউসের একপ্রান্তে, তবে ওটা তারপুলিনে ঢেকে ফেলা হয়েছে আগেই। রকেট আকৃতির নয় ওটা, চৌকোনা... আকার দেখে মনে হচ্ছে বাক্স জাতীয় কিছু হবে। বেশ বড়, অনায়াসে একটা গাড়ি ঢুকে যাবে ওটায়। বেশ কিছু শ্রমিক ওটার পাশেও রয়েছে, ভারী ব্লক আর ট্যাকেলের সাহায্যে জিনিসটাকে মাটি থেকে তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। রকেটের সঙ্গে ওটাও সম্ভবত একই গন্তব্যে যাবে। কী ওটা? লঞ্চপ্যাড? কিন্তু তা-ই বা কী করে হয়? আধাখেঁচড়া একটা রকেটকে তো মহাকাশে পাঠানো সম্ভব নয়!

একটা ব্যাপার পরিষ্কার, ওয়ালপ্স্ আইল্যাণ্ডের রকেটে স্যাবোটাজ করছে না লিম, বরং সেটার নকল তৈরি করছে। কেন... সেটাই হলো প্রশ্ন। এ-জিনিস বানিয়ে কী লাভ তার? যুক্তিগ্রাহ্য কোনও জবাবই মিলছে না। একটা জিনিসই শুধু বুঝতে পারছে, কিছু একটা গোলমাল আছে এখানে। বুদ্ধিমানের কাজ হবে, দ্রুত কম্পাউণ্ড থেকে বেরিয়ে যাওয়া, তারপর খবর দেয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। তারাই ঠিক করুক, লিমের নকল রকেটের ব্যাপারে কী করবে না করবে।

কিন্তু মনের সায় পাচ্ছে না রানা। দুর্বোধ্য এক ধাঁধার

মুখোমুখি হয়েছে, তার সমাধান না করে স্বস্তি নেই। তা ছাড়া সিংহের গুহায় যখন ঢুকেই পড়েছে, এখানে আরও কত কী রহস্য লুকিয়ে আছে, সেগুলোর খোঁজ নেয়া জরুরি। পরে এমন সুযোগ না-ও মিলতে পারে। এর অর্থ, লিমের বাড়িতে হানা দিতে হবে ওকে। কাজটা বিপজ্জনক, কিন্তু দ্বিতীয় কোনও পথও দেখছে না।

সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে এল রানা। দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল ওয়্যারহাউস থেকে। কম্পাউণ্ডের মাঝ দিয়ে যাওয়া যাবে না, ক্যামেরায় ধরা পড়ে যাবে, তাই আবারও ফেন্সের কিনার ঘেঁষে ঘুরপথে সাদা বাড়িটার দিকে রওনা হলো ও। চলে গেল কাছাকাছি। বাড়ি আর ওর মাঝে এখন মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরত্ব। পুরোটাই খোলা জায়গা। দৌড়ে দূরত্বটা পার হবার জন্যে মনে মনে তৈরি হলো ও। পা বাড়াতে যাবে, এমন সময় বদলে গেল দৃশ্যপট।

বিকট আওয়াজের সঙ্গে একযোগে জ্বলে উঠল সমস্ত ফ্লাডলাইট। আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিল পুরো কম্পাউণ্ডকে। যেখানে ছিল, সেখানেই স্থির হয়ে গেল রানা। আলোর ঝলকানিতে চোখে ধাঁধা লেগে যাওয়ায় মুখ লুকাল কনুইয়ের ভাঁজে। পরক্ষণেই লাউডস্পিকারে ভেসে এল একটা গমগমে কণ্ঠ।

'অ্যাটেনশন, মি. রানা। আড়াল থেকে বেরিয়ে আসুন দু'হাত তুলে। হাতের অস্ত্র ফেলে দিন। মিস হান্টার এখন আমাদের কবজায়... কাজেই যদি কথা না শোনেন, তার শাস্তি ওঁকে দেয়া হবে। মেইন গেটে আছেন তিনি। দশ সেকেণ্ড সময় দেয়া হলো আপনাকে। দশ... নয়...'

চোখ পিট পিট করে গেটের দিকে তাকাল রানা। মিথ্যে বলছে না কণ্ঠটা। সত্যিই গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মিশেল। আহত। দু'পাশ থেকে ওকে টেনে ধরে রেখেছে দু'জন গার্ড।

'...আট... সাত...'

তৃতীয় একজন গার্ডকে এবার দেখতে পাচ্ছে রানা। হাতে পিস্তল, মিশেলের পেছনে দাঁড়ানো। পিস্তলের নলটা তাক করে রেখেছে মেয়েটার মাথার দিকে। গেটের পাল্লাও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। নিয়মিত গার্ডের পাশাপাশি সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে অন্তত বাড়তি আরও ছ'জন গার্ড। রানার চোখের সামনে আরও লোক এগোচ্ছে গেটের দিকে। লড়াই করে কিছুতেই আর ওখান দিয়ে বেরুতে পারবে না ও।

'...ছয়... পাঁচ... চার...'

কাউন্টডাউন চলছে। রানাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, ঠিক একইভাবে আগামীকাল ওয়ালপ্স্ আইল্যাণ্ডেও কাউন্টডাউন করা হবে রকেট লঞ্চের। কেমন যেন ঘোর ঘোর লাগছে ওর। কীভাবে কাণ্ডটা ঘটল, বুঝতে পারছে না। এরা টের পেল কীভাবে?

'...তিন...'

হার মানতে ইচ্ছে করছে না রানার। যেভাবে হোক, এখান থেকে বেরুতে হবে ওকে... কমোডর ব্যালফোরকে জানাতে হবে লিমের নকল রকেটের খবর। কিন্তু মিশেলের পেছনে দাঁড়ানো লোকটার দিকে তাকিয়ে দমে গেল। নিষ্কম্প হাতে পিস্তল ধরে রেখেছে সে, কাউন্টডাউন শেষ হলেই ট্রিগার চাপবে।

না, মিশেলকে মরতে দিতে পারে না ও। হার না মেনে উপায় নেই।

'...দুই...'

আর কিছু করার নেই, পিস্তলটা উল্টো করে ধরল রানা, সে-অবস্থায় দু'হাত তুলল মাথার উপরে। তারপর ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে এল আড়াল থেকে। সবাইকে দেখিয়ে পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলল মাটিতে।

কাউন্টডাউন থেমে গেল। চতুর্পাশ থেকে রানাকে ঘিরে ফেলল লিমের রক্ষীরা। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল অস্ত্র উঁচিয়ে।

চোদ্দ

চারদিকে নিরেট সাদা দেয়াল। কামরায় একটাই দরজা, সেটা বাইরে থেকে তালা দেয়া। পেছনের দেয়ালে, একেবারে ছাতের কাছে রয়েছে একটা ঘুলঘুলির মত জানালা, মোটা গরাদে লাগানো। সেখান দিয়ে এক চিলতে আকাশ ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে চারদিকে যে সতর্ক প্রহরা রয়েছে, তা রানা খুব ভালমতই বুঝতে পারছে। নিয়মিত বিরতিতে বাইরে পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে ও—টহল দিচ্ছে গার্ডেরা। এ ছাড়াও শোনা যায় ট্রাকের গর্জন, টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং আর ব্যস্ত লোকজনের হাঁকডাক।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লকের একটা খালি স্টোররুমে প্রায় বিশ ঘণ্টা ধরে বন্দি হয়ে আছে ও। আত্মসমর্পণের পর পরই ওকে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। তারপর যেন ওর কথা ভুলেই গেছে রক্ষীরা। দুপুরে খাবার পরিবেশন করা না হলে তেমনটাই ভাবতে হতো। সে-খাবার অবশ্য ছুঁয়েও দেখেনি রানা, শুধু তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে পানিটুকু খেয়েছে। ধীরে ধীরে অস্থির হয়ে উঠছে ও। লিমের নির্লিপ্ত আচরণে উদ্বেগ অনুভব করছে। এখন পর্যন্ত ইন্টারোগেট করা হলো না ওকে, টর্চার করা হলো না... মিশেলের ভাগ্যে কী ঘটেছে, তা-ও জানা নেই। লক্ষণ ভাল ঠেকছে না ওর কাছে।

অবশেষে... জানালার বাইরে আঁধার নেমে আসার পর... হঠাৎ আওয়াজ হলো দরজায়—তালা খোলা হচ্ছে। কয়েক সেকেণ্ড পর খুলে গেল পাল্লা। দোরগোড়ায় মিশেলকে ক্লান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা, মুখের একপাশে কালশিরে। পেছনে অস্ত্র উঁচিয়ে রেখেছে দু'জন কোরিয়ান গার্ড।

'রানা!' মিশেলের ডাকটা হাহাকারের মত শোনাল।

ওর দিকে এগিয়ে গেল রানা। 'তুমি ঠিক আছ?'

মাথা ঝাঁকাল মিশেল। 'কীভাবে কী হয়ে গেল, কিছুই বুঝতে পারিনি। আমাকে চিনে ফেলেছিল ওরা...'

'খামোশ!' পিছন থেকে গর্জে উঠল এক গার্ড। কুৎসিত চেহারা। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলছে। 'কথা নয়। বেরিয়ে এসো।'

'নিশ্চয়ই,' হালকা সুরে বলল রানা। 'কোথায় নিয়ে যাবে, জানতে পারি? চেহারা-সুরতের অবস্থা বেশি ভাল নয়, একটু গোসল করে নিতে পারলে ভাল হতো।' কথা বলার ফাঁকে চোখ বুলিয়ে নিল হাতঘড়িতে। ছ'টা বাজে। আর ঠিক পাঁচ ঘণ্টা পর ওয়ালপ্‌স্‌ আইল্যাণ্ডের লঞ্চ।

'কথা বাড়িয়ো না,' ধমকে উঠল গার্ড। 'চলো।'

বাথরুমে যাবার সুযোগ দেয়া হলো ওদের। তারপর বিল্ডিং থেকে বের করে আনা হলো। আরও দু'জন গার্ড যোগ দিল এবার। ছোট্ট দলটা এরপর মার্চ করে এগিয়ে চলল দোতলা সাদা বাড়িটার দিকে। আড়চোখে গার্ডদের দেখে নিল রানা। নাহ্, অ্যামেচার নয়, পাক্কা প্রফেশনাল। নাগালের বাইরে রয়েছে প্রত্যেকেই। দু'জন সামনে, দু'জন পেছনে। ক্লাসিক এসকর্টিং টেকনিক। সেফটি ক্যাচ অফ করে রেখেছে অস্ত্রের, বেচাল দেখলেই নির্দ্বিধায় গুলি চালাবে।

হাঁটতে হাঁটতে এবার ওয়্যারহাউসের দিকে চোখ ফেরাল রানা। স্লাইডিং ডোরদুটো হাট করে খোলা। ভেতরটা খালি।

লো-বয় ট্রাকদুটো নেই। নকল রকেটের ঊর্ধ্বাংশ নিয়ে চলে গেছে কোথাও।

সাদা বাড়িটায় পৌঁছে গেল ওরা। কড়া নাড়তেই খুলে গেল দরজা। ভেতরে পা রাখল দলটা। এয়ার-কণ্ডিশনারের ঝিরিঝিরি ঠাণ্ডা বাতাসে শরীর জুড়িয়ে গেল। আশপাশে নজর বোলাল রানা, ছোটবেলায় দেখা জন কিটসের বাড়ির চেয়ে একেবারেই ভিন্ন। বাড়ির বাইরের দিকটা সিমেণ্ট আর কংক্রিটের হলেও ইন্টেরিয়রটা মার্বেল পাথরের। মেডিটারেনিয়ান স্টাইলে শুরুতেই একটা বিশাল ফয়েই—সুন্দর করে সাজানো। দেয়ালে শোভা পাচ্ছে নানা রকম পেইন্টিং আর অ্যান্টিক শো-পিস। ছাত থেকে শেকলে ঝুলছে বহুমূল্য ঝাড়বাতি। পায়ের নিচের গালিচা যেন নরম দূর্বাঘাস, তাতে নানা ধরনের নকশা উঁকি দিচ্ছে। ফয়েই পেরিয়ে চওড়া এক হলওয়েতে ঢুকল ওরা, সেটা ধরে এগিয়ে চলল সামনে। শেষ প্রান্তে একটা বড়, নকশাকাটা দরজা। সেটার সামনে থামতে হলো ওদের।

'যা করার আমাকে করতে দিয়ো,' নিচু গলায় মিশেলকে বলল রানা। 'সুযোগ পেলে আমি সেটা ছাড়ছি না।'

বাঁকা চোখে ওর দিকে তাকাল মিশেল। 'সেটা যদি পালাবার সুযোগ হয়, আমি ছুটব সবার আগে।'

দরজায় টোকা দিল একজন গার্ড। ভেতর থেকে ঢোকার অনুমতি দেয়া হলো। দরজা ঠেলে এবার একটা ডাইনিং রুমে প্রবেশ করল ওরা। আকারে খুব বড় নয়, তবে চমৎকারভাবে সাজানো। চারদিকে খাঁজকাটা কাঠের প্যানেল, মাথার উপরে জ্বলছে দামি ঝাড়বাতি। পিছনদিকে দুটো জানালা রয়েছে, ভারী পর্দা দিয়ে ঢাকা। ঠিক মাঝখানে রয়েছে একটা রিজেন্সি ডাইনিং টেবিল—মেহগনি কাঠে গড়া। টেবিলের কিনার আর পায়াগুলো দক্ষ হাতে কারুকাজ করা। চেয়ারগুলো সে-তুলনায় সাদামাঠা... ফোমের গদিঅলা। খুব বেশি নকশা

নেই সেগুলোর গায়ে। এ-মুহূর্তে তিনজন বসার জন্যে সাজানো হয়েছে টেবিলটাকে, একজন ইতিমধ্যে এসেও গেছে। টেবিলের একপাশে বসে আছে অ্যাণ্ডি লিম—প্রশান্ত ভঙ্গিমায়। হাতদুটো আড়াআড়িভাবে পড়ে আছে টেবিলের ওপর। এক পাশে রেখেছে তাসের একটা প্যাকেট। কালো রঙের সাজ নিয়েছে সে—গায়ের জ্যাকেট, রোল-নেক জার্সি আর ট্রাউজার্স... সবই কালো। রানা আর মিশেলকে ঢুকতে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চোখের দৃষ্টি।

'আসুন, মি. রানা, মিস হাণ্টার,' সম্ভাষণ জানাল লিম। কণ্ঠে আন্তরিকতা ফোটানোর চেষ্টা। 'প্লিজ, বসুন।'

কোরিয়ান টাইকুনের দু'পাশে... টেবিলের দু'প্রান্তে বসল রানা আর মিশেল। গার্ডরা চলে গেল না, দু'জন দাঁড়িয়ে রইল দরজার দু'পাশে, বাকি দু'জন পজিশন নিল রানার চেয়ারের পেছনে, হাতের নাগালে। চারজনেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ ওর ওপর। হতাশ চোখে সামনে সাজিয়ে রাখা কাটলারিজের দিকে তাকাল রানা, কয়েক সেকেণ্ড পেলেই ছুরিটা তুলে হামলা করা যেত লিমের ওপর। কিন্তু গার্ডরা ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলায় সেটা আর সম্ভব নয়।

'বাড়িটা কেমন লাগছে আপনার, মি. রানা?' হাসিমুখে জানতে চাইল লিম।

'ভাল,' সংক্ষেপে বলল রানা।

'আপনাকে তো জার্মানিতেই বলেছিলাম, অতিথি আপ্যায়নের জন্যে এ-ধরনের অনেক সম্পত্তি আছে আমার।'

'কিন্তু কনস্ট্রাকশন ডিপোর ভেতরে অতিথি আপ্যায়ন করতে যাবেন কেন, তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আগে এখানে ডিপো ছিল না। ব্রিটেন থেকে আসা এক সিল্কের ব্যবসায়ীর বাড়ি ছিল এটা। স্বদেশের প্রতি টান থেকে কবি জন কিটসের বাড়ির রেপ্লিকা তৈরি করেছিল সে। বেশ কয়েক বছর আগে আমার সঙ্গে ব্যবসায়িক বিরোধে জড়িয়ে

পড়ে লোকটা। তার সহায়-সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে... তাকে সর্বস্বান্ত করে তবেই ছেড়েছি। অপমানের চূড়ান্ত করেছি ওর সাধের বাড়িটার চারপাশে কনস্ট্রাকশন ডিপো বানিয়ে। তবে বাড়িটা এত সুন্দর... নষ্ট করতে ইচ্ছে হয়নি। তা ছাড়া নিউ জার্সিতে এলে নিজের থাকার জন্যেও তো একটা জায়গা প্রয়োজন, তাই না? এখানে সাধারণত অতিথি আপ্যায়ন করি না আমি। আপনারা ব্যতিক্রম।'

'এত বড় সৌভাগ্য হলো কী করে, জানতে পারি?' বাঁকা সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

মুখের হাসি প্রসারিত হলো লিমের। 'কীভাবে ধরা পড়লেন, সেটাই জানতে চাইছেন তো? অসতর্কতা আর দুর্ভাগ্য... দুটোরই ভূমিকা আছে ওতে। পুরো কম্পাউণ্ড জুড়ে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগানো আছে, অথচ কেয়ার করেননি... কাজেই অসতর্ক। আর আপনাদের দুর্ভাগ্য যে, সমস্ত ক্যামেরার রিলে রয়েছে আমার ব্যক্তিগত অফিসে। গত রাতে ওখানে বসেই কাজ করছিলাম আমি, হঠাৎ মনিটরে মিস হার্ণ্টারকে দেখতে পেলাম। শ্লস ব্রনসার্টেও তাঁকে দেখেছি, তাই চিনতে অসুবিধে হয়নি। মানুষের চেহারা সহজে ভুলি না আমি। ওঁকে দেখামাত্র সন্দেহ জাগল, একজন স্পোর্টস জার্নালিস্ট আমার ডিপোতে কেন? গাড়ি নষ্ট হবার যে-অজুহাত দেখাচ্ছিলেন, তা যে ভুয়া, বুঝতে অসুবিধে হয়নি। তক্ষুণি তাঁকে আটক করবার নির্দেশ দিই আমি, জিজ্ঞাসাবাদ করতে বলি। অস্ত্রের মুখে শেষ পর্যন্ত তিনি বলতে বাধ্য হন, কম্পাউণ্ডে আপনিও আছেন, মি. রানা। বাকিটা তো ...'

'এসব কথা শুনতে চাই না আমি,' বিরক্ত গলায় বলল মিশেল। 'কাউকে বড়াই করতে দেখলে অসহ্য লাগে আমার।'

মুখের হাসি মুছে গেল লিমের। ঝট্ করে মিশেলের দিকে তাকাল সে। থমথমে গলায় বলল, 'অভদ্র আচরণ করে

কাজটা ভাল করলেন না, মিস হান্টার। কার সামনে... কোথায় বসে আছেন, তা ভুলে যাবেন না। আমার ইচ্ছে হয়েছে বলে এই মুহূর্তে এখানে আছেন আপনি। কিন্তু জেনে রাখুন, আর একটিবার যদি আমার কথার মাঝখানে কথা বলেন, ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়াব। সারাদিন যে-অন্ধকার স্টোররুমে বন্দি হয়ে ছিলেন, সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে আপনাকে। আমার গার্ডদের এ-ও বলে দেব, আপনাকে নিয়ে ওরা যা-খুশি-তাই করতে পারে। কাজেই, যদি নিজের ভাল চান তো চুপচাপ বসে থাকুন। উপভোগ করুন সময়টা।'

প্রতিবাদ করতে গেল মিশেল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সামলাল নিজেকে। সেধে বিপদ ডেকে এনে যে লাভ হবে না, তা বুঝতে পারছে।

রানার দিকে আবার ফিরল লিম। বলল, 'কথাগুলো আপনার জন্যেও প্রযোজ্য, মি. রানা। আমি জানি, এ-ধরনের পরিস্থিতিতে আপনি আগেও পড়েছেন; কিন্তু নিশ্চিত থাকুন, এবার ভাগ্যের সহায়তা পাবেন না। এমনিতেই খুব বেশি সময় নেই আপনার হাতে, খামোকা মৃত্যুটা ত্বরান্বিত না করলেই ভাল করবেন।'

'যতটা ভাবছেন, ততটা সময় আসলে আপনার হাতেও নেই,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল রানা। 'আমাদের সঙ্গী-সাথীরা জানে আমরা কোথায়। যদি ফিরে না যাই, আইনের লোকেরা ছুটে আসবে আপনার দরজায় কড়া নাড়তে।'

'কথাটা বলে ভাল করেছেন, আমার দরজা ওদের জন্যে সবসময়েই খোলা থাকবে,' বলল লিম। 'তবে দরজার অন্য পাশে আপনাদেরকে ওরা খুঁজে পাবে কি না, সে-ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

ডাইনিং রুমের পাশের একটা দরজা খুলে গেল। সেখান দিয়ে ভেতরে ঢুকল ধোপদুরস্ত পোশাক পরা একজন কোরিয়ান ওয়েইটার। হাতে রূপালি ট্রে, তাতে সাজানো

রয়েছে তিনটে ককটেল গ্লাস।

'আসুন, ড্রিঙ্ক করা যাক,' বলল লিম। 'মার্টিনি পছন্দ করেন আপনি? ব্যক্তিগতভাবে আমার পছন্দ নিট ড্রিঙ্ক, তবে আপনাদের সম্মানে আজ একটু ককটেল পান করা যেতেই পারে। ভদকার সঙ্গে সামান্য ভারমাথ আর লেবুর রস। কী বলেন? মিস হান্টারেরও আশা করি ভাল লাগবে ওটা।'

ড্রিঙ্ক পরিবেশন করল ওয়েইটার। গ্লাসটা ঠোঁটের কাছে তুলে ছোট্ট একটা চুমুক দিল রানা। বরফের মত ঠাণ্ডা, ভারমাথের পরিমাণও বেশি হয়ে গেছে। ভাল লাগল না। গ্লাসটা নামিয়ে রাখল টেবিলে।

'আপনার সম্পর্কে সবই জানা আছে আমার, মি. রানা,' নিজের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল লিম। 'মাসুদ রানা—বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের দুর্ধর্ষ এজেন্ট। আরও অনেকগুলো পরিচয় আছে আপনার। রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির ডিরেক্টর, জাতিসংঘের অ্যান্টি-ক্রাইম অর্গানাইজেশনের স্পেশাল এজেন্ট, ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সির স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর, স্বনামধন্য শৌখিন আর্কিয়োলজিস্ট, সফল ট্রেজার হান্টার... রিয়েলি ইম্প্রেসিভ! এক অঙ্গে এত রূপ সচরাচর দেখা যায় না। তবে ভক্তের তুলনায় আপনার শত্রুর সংখ্যাও নেহাত কম নয়। আমি নিশ্চিত, আপনাকে খতম হতে দেখলে তাদের বেশিরভাগই কৃতজ্ঞতা জানাবে আমাকে।'

'উল্টোটাও ঘটতে পারে,' বলল রানা হালকা গলায়। 'ব্যর্থতার জন্যে আপনাকে দুয়ো দেবে সবাই। শেষ পর্যন্ত আপনিও ওদের দলে নাম লেখাবেন। আশায় আশায় থাকবেন, অন্য কেউ যদি আমাকে খতম করতে পারে!'

'সে-সম্ভাবনা ক্ষীণ।' তুড়ি বাজিয়ে ওয়েইটারকে কাছে ডাকল লিম। 'সিগারেট চলবে? আপনার পছন্দের কোনও নির্দিষ্ট ব্র্যাণ্ড আছে কি না জানি না, আপাতত মার্লবোরো দিয়ে

কাজ চালাতে হবে। আমি নিজে অবশ্য ধূমপান করি না। খুব ক্ষতিকর নেশা। তবে আপনাকে এই শেষ মুহূর্তে বঞ্চিত করা উচিত হবে না।'

রানার সামনে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইয়ের বাক্স রাখল ওয়েইটার। রানা দেখল, ম্যাচের মাত্র দুটো কাঠি দেয়া হয়েছে ওকে। একটা এখন, আরেকটা পরে ব্যবহারের জন্যে। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে ঝোলাল ও, আগুন জ্বেলে আয়েশ করে দিল এক টান। ধোঁয়াটা ছাড়ল সময় নিয়ে।

'আজকাল খাওয়া-দাওয়ায় বড় বেশি আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে এসেছি আমরা,' লিম বলল। 'রান্না-বান্না, পরিবেশন, টেবল-ম্যানার্স... পশুপাখির মধ্যে ওসবের বালাই নেই। যখন যেখানে যা পাচ্ছে, খেয়ে নিচ্ছে। মানুষেরও তা-ই করা উচিত বলে মনে করি আমি। প্রশ্ন করতে পারেন, এখন তা হলে এখানে এত আয়োজন করে আপনাকে বসিয়েছি কেন? দুটো কারণে। প্রথমত, জীবনের শেষ খাওয়াটা আপনাকে ভদ্রোচিতভাবে খাওয়ানো আমার মানবিক দায়িত্ব। দ্বিতীয়ত, খেতে খেতে কথা বলা যাবে বলে।'

'কী বলবেন?' সিগারেটে আবারও টান দিল রানা। 'বলার মত খুব বেশি কিছু কি আছে?'

'আপনাকে আমি আমার জীবনের গল্প শোনাব, মি. রানা,' বলল লিম। 'গল্পটা খুবই ইন্টারেস্টিং... এক হিসেবে অতুলনীয়ও বলতে পারেন। শুনতে ভাল লাগবে আপনার, আমার কাজের পেছনে যুক্তিগুলো খুঁজে পাবেন, আমাকে নিছক একজন উন্মাদ বলে ভাবতে পারবেন না আর। সারা দুনিয়াকে যদি এই গল্প শোনাতে পারতাম, সেটা সবচেয়ে ভাল হতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা সম্ভব নয়। আপনাকে শোনাবার পেছনে একটাই কারণ... আর সেটা ইতিমধ্যেই বলেছি—খুব শীঘ্রি মৃত্যু ঘটবে আপনার। আমার সঙ্গে প্রথম

যেদিন শত্রুতা করলেন, সেদিনই মৃত্যু নির্ধারিত হয়ে গেছে আপনার। ভাল করতেন, যদি দূরে দূরে থাকতেন। আয়ু হয়তো কয়েকটা দিন বাড়ত। কী ভাবছেন, জানি। মনে মনে ছক কষছেন নিশ্চয়ই? কীভাবে, কী করলে এখান থেকে পালাতে পারবেন... তা নেড়েচেড়ে দেখছেন। আপনাকে তাই শুরুতেই সতর্ক করে দিতে চাই, এই কামরায় দাঁড়িয়ে থাকা গার্ডরা সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখছে আপনাকে। ওদের মনোযোগের শতভাগ নিবদ্ধ রয়েছে স্রেফ আপনার ওপর। একটা আঙুলও যদি অপ্রত্যাশিত ভঙ্গিতে নাড়েন, ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে আপনার ওপর। কাজেই কোনও চালাকি করার চেষ্টা করবেন না। বুঝতে পারছেন আমার কথা?'

'পরিষ্কার,' বলল রানা। মনের ভেতরে ক্ষীণ একটু আশা জেগে উঠলেও চেহারায় নিস্পৃহ ভাব ফুটিয়ে রেখেছে। একটু বেশিই বলে ফেলেছে প্রতিপক্ষ, ওর সামনে প্রকাশ করে দিয়েছে একটা দুর্বলতা। কীভাবে তা কাজে লাগানো যায়, সেটাই ভাবতে শুরু করেছে ও।

'গুড,' মাথা ঝাঁকাল লিম। 'ড্রিঙ্ক আর সিগারেটে আপনি সন্তুষ্ট? তা হলে শুরু করা যাক।' নিজের কাহিনী বলতে শুরু করল সে। 'আমার মাতৃভূমি সম্পর্কে প্রথমে বলি। রণকৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে কোরিয়ান পেনিনসুলাকে সারা দুনিয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবে, কারণ চিন ও জাপান খুব কাছে বলে ওখানে বসে তাদের ওপর নজরদারি করা যায়... ছড়ি ঘোরানো যায়। গত শতাব্দীর শুরুতে আমরা ছিলাম জাপানের দখলে... ভয়ানক নিষ্ঠুর এক জাত। কোরিয়ানদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করত ওরা। লুঠ করে নিয়ে যেত আমাদের সব সম্পদ, ভূলুণ্ঠিত করত আমাদের ঐতিহ্য, পায়ের তলায় পিষে মারত আমাদের। সে-অবস্থা থেকে আমরা মুক্তি পেলাম ১৯৪৫ সালের ১৫ই আগস্ট, মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে। সেদিনটার কথা আমার মনে নেই,

আমি তখন নিতান্তই শিশু... তবে গুরুজনদের মুখে শুনেছি, অবিস্মরণীয় এক দিন ছিল সেটা। সারা দেশ মেতে উঠেছিল উৎসবে। প্রথমবারের মত দেশের আনাচে-কানাচে উড়তে শুরু করেছিল আমাদের পতাকা। সবাই ভেবেছিল, এবার আত্মপরিচয় ফিরে পাবে কোরিয়া, মাথা তুলে দাঁড়াবে বিশ্ব-দরবারে। কিন্তু সে-আনন্দ ছিল ক্ষণস্থায়ী। যুদ্ধজয়ী আমেরিকা আর সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেদের খেয়াল-খুশিমত... আমাদের মতামতের তোয়াক্কা না করে... ভাগ-বাটোয়ারা করে নিল দেশটাকে। আটত্রিশতম অক্ষাংশ বরাবর দু'ভাগ করে দিল পেনিনসুলাকে—সৃষ্টি হলো উত্তর আর দক্ষিণ কোরিয়ার। আর সেই বিভেদের পরিণাম হলো ভয়াবহ। সে-কথায় পরে আসছি। আগে দক্ষিণ কোরিয়ার কথা বলে নিই।

'লোক-দেখানো একটা নির্বাচন হলো আমাদের দেশে। আমেরিকার মদদপুষ্ট এক প্রেসিডেন্ট নিলেন ক্ষমতা—তার নাম সিংমান রি। নিষ্ঠুর এক স্বৈরশাসক ছিলেন তিনি। সারা দেশে আন্দোলন শুরু হলো... সেই সঙ্গে গুপ্তহত্যা আর সন্ত্রাস। বড় বড় শহরে হামলা চালাল কমিউনিস্ট গেরিলারা। পুলিশ, তথা সরকার তাদের ঠেকাতে ব্যর্থ হলো। দুর্নীতিবাজ, সুবিধাবাদী, অযোগ্য লোকদের কাছ থেকে কিছু আশা করাও ঠিক নয়। সারা দেশ যেন আগুনে পুড়তে শুরু করল। কোথাও যাবার উপায় রইল না কোরিয়ানদের।

'বলে রাখা ভাল, দক্ষিণ কোরিয়ার সেই দুর্দশার আঁচ খুব একটা পোহাতে হয়নি আমাদের পরিবারকে। ধনী ছিলাম আমরা... আমার বাবা ছিলেন একজন *ইয়াংবান*, মানে অভিজাত সমাজের সদস্য। কনফুশিয়ান স্কলার ছিলেন তিনি, সেই সঙ্গে স্থানীয় সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। সম্রাজ্ঞী মিয়োংসং... যাঁকে লোকে রানি মিন বলে চেনে... তাঁর খাস সহচরী ছিলেন আমার দাদি। *চোসোন*

রাজপরিবারের শেষ দিনগুলোয় দাদি ওদের রাজপ্রাসাদেই থাকতেন। সোজা কথায়, অঢেল প্রাচুর্যের মাঝে জন্ম নিয়েছিলাম আমি। ছেলেবেলায় অভাব-অনটনের চেহারা দেখিনি।

'সবকিছু বদলে গেল ১৯৫০ সালের ২৫শে জুনে। আমি তখন ছ'বছর বয়সী এক বালক, কিন্তু আজও পরিষ্কার মনে আছে সব খুঁটিনাটি। সকাল না হতেই সাইরেনের শব্দে প্রকম্পিত হয়েছিল পুরো সোউল শহর। রেডিওতে প্রচার করা হচ্ছিল ইমার্জেন্সি বুলেটিন—উত্তর কোরিয়ার কমিউনিস্ট আর্মি... প্রায় দেড় লাখ সৈন্য, রাশান টি-৩৪ ট্যাঙ্ক আর আর্টিলারি ইউনিট নিয়ে আটত্রিশতম অক্ষরেখা অতিক্রম করেছে। পুরো দক্ষিণ কোরিয়াকে গ্রাস করতে চলেছে ওরা, ঠেকাবার উপায় নেই।'

ডিনার নিয়ে ওয়েইটার ফিরে আসায় একটু থামল লিম। প্লেটে সাজানো খাবার পরিবেশন করা হলো ওদেরকে: মাংসের স্টেক, ফ্রাইড রাইস আর সামান্য সবজি। ছুরি আর কাঁটাচামচে হাত দিতেই গার্ডদের শরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠতে দেখল রানা, কিন্তু পরোয়া করল না। খেয়ে নেবে বলে ঠিক করেছে। গত রাত থেকে কিছুই পেটে পড়েনি... সামনে যা-ই অপেক্ষা করুক, তা মোকাবেলার জন্যে শক্তি দরকার। লিমকেও একই খাবার দেয়া হয়েছে।

'খেতে খেতে কথা বললে আশা করি কিছু মনে করবেন না, মি. রানা?' বলল সে।

'কথা তো আপনি বলছেন।'

'তা ঠিক।' মিশেলের দিকে তাকাল লিম। 'খাবার ঠিক আছে তো, মিস হান্টার? অন্য কিছু চাইলে বলতে পারেন।'

'না, ধন্যবাদ,' মুখ না তুলেই বলল মিশেল।

রানা আর মিশেলের সামনে দুটো গ্লাস রেখে তাতে রেড ওয়াইন ঢালল ওয়েইটার। বোতলটা নামিয়ে রাখল টেবিলে।

ওটাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায় কি না, ভাবল রানা। ভরসা পেল না। গার্ডরা শকুনের চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

ইশারায় ওয়েইটারকে চলে যেতে বলল লিম। এরপর খেই ধরল গল্পের।

'আমার বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন, তক্ষুণি আমাদেরকে শহর ছেড়ে পালাতে হবে। তাঁর হিসেবে উত্তর কোরিয়ান সৈন্যরা এক সপ্তাহের মধ্যে সোউলে পৌঁছুবে—বাস্তবে লেগেছিল মাত্র তিন দিন—আর শহরে ঢুকেই সবার আগে সরকারি লোকজনকে খুন করবে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে তিনি যে একেবারে প্রথম দিককার শিকার হবেন, তাতে সন্দেহ নেই। কাজেই পালিয়ে যাওয়াই ভাল। বাড়িঘর ফেলে চলে যাবার ইচ্ছে ছিল না আমার মা, বা বড় দুই বোনের, কিন্তু বাবার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস ছিল না কারও। তাই তৈরি হতে হলো পালাবার জন্যে। বাবা বলে দিলেন, কাপড়চোপড় ছাড়া আর কিছুই নেয়া যাবে না সঙ্গে। বাড়িতে গয়নাগাটি আর দামি যত জিনিস ছিল, সব তিনি একত্র করে লুকিয়ে রাখলেন খাবার ঘরের মেঝের নিচে একটা গোপন কুঠুরিতে। এরপর সদর দরজায় তালা ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা।

'*চু গক রি* নামে একটা গ্রামে যাচ্ছিলাম আমরা, সেখানে আমার দাদার বাড়ি। দাদা কয়েক বছর আগে মারা গেছেন, দাদি তখন একাই থাকেন ওখানে। একটা বাস ধরে আমরা হান নদী পর্যন্ত গেলাম, সেতু পেরোলাম পায়ে হেঁটে। ভাগ্য ভাল ছিল বলতে হবে, কারণ আমরা যাবার একদিন পরেই আমাদের নিজস্ব আর্মি বিনা নোটিসে ব্রিজটা উড়িয়ে দেয়, আর তাতে মারা পড়ে আমাদেরই শতাধিক নিরীহ মানুষ। বলে রাখা ভাল, যুদ্ধের সময় এ-ধরনের বহু ভুল করেছে আমাদের পক্ষ। আমেরিকান যুদ্ধবিমানগুলো বহুবার শত্রু

ভেবে আমাদের সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ওটাকে আসলে যুদ্ধ ভাবা মুশকিল, বরং এক ধরনের জগাখিচুড়ি পাকানো ধ্বংসযজ্ঞ বললেই বেশি মানাবে। কোরিয়ায় নিয়োজিত আমেরিকান মিলিটারি ছিল অনভিজ্ঞ, অপ্রশিক্ষিত ও বিশৃঙ্খল। বহু সৈনিক ছিল, যারা মৌলিক প্রশিক্ষণটুকুও নিয়ে আসেনি। আরেকটা তথ্য দিয়ে রাখি, এটার সঙ্গে আমার কাহিনীর নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে—ওরা উত্তর কোরিয়ার কমিউনিস্ট শত্রু আর প্রাণভয়ে পলায়নরত দক্ষিণ কোরিয়ান রিফিউজিদের মাঝে কোনও পার্থক্য করতে পারত না। কোরিয়ান ভাষায় নিজেদের আমরা বলি *হাংগুক সারাম*, সেটাকেই সংক্ষেপে *গুক* বলে ডাকত ওরা। উত্তর-দক্ষিণের ভেদাভেদ ছিল না ওদের চোখে, আমরা সবাই ছিলাম একেকজন গুক!'

গ্লাস তুলে এক ঢোক পানি খেল লিম। মদ নেয়নি সে। সামনে পড়ে রয়েছে খাবারের প্লেট, ছুঁয়ে দেখছে না। গল্প বলায় ব্যস্ত।

'চু গক রি-তে আমরা যখন পৌঁছুলাম, তখন সোউল থেকে বানের জলের মত বেরিয়ে আসছে মানুষ। রাস্তা ধরে ছুটছে মোটরগাড়ির সারি—মাথায় স্তূপ করে বাঁধা সাংসারিক জিনিসপত্রের বোঝা নিয়ে। এরপর অন্যান্য যানবাহন—ঘোড়ার গাড়ি, ঠেলাগাড়ি ও শিশুদের প্যারাম্বুলেটর। সবার শেষে অসংখ্য মানুষের স্রোত। গ্রীষ্মের প্রখর রোদ মাথায় নিয়ে দক্ষিণে ছুটছিল সবাই, পেছনে ধাওয়া করছিল শত্রুপক্ষের সেনারা। মাথার ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে বিমান উড়ে যেতে দেখতাম আমরা, আর দেখতাম ট্রেন যাচ্ছে—দক্ষিণ কোরিয়ান সৈন্যদের উত্তরে নিয়ে চলেছে যুদ্ধের ময়দানে। তবে আগে-ভাগে সোউল ছেড়ে বেরিয়ে আসায় নিরাপদে ছিলাম আমরা। সুন্দর একটা বাড়ি ছিল আমার দাদির—টালি করা ছাত, খোলা বারান্দা, চারদিক

গাছপালায় ঘেরা। তাঁর চেহারা এখনও চোখে ভাসে আমার... শেষ বয়সেও সে কী আভিজাত্য! সারাক্ষণ হাসতেন, খুব আদর করতেন আমাকে। বাড়িতে থাকার জায়গার অভাব ছিল না—বাবা-মা তো আলাদা কামরা পেলেনই, আমার বড় দু'বোন... সু-লি, ডং-লি, আর আমিও পেলাম নিজস্ব কামরা। যুদ্ধের কথা ভুলে গিয়ে আনন্দে কাটাতে থাকলাম সময়।

'এক মাস কাটল ওভাবে। তারপরেই মিলিয়ে গেল শান্তি। দিন দিন গ্রামে রিফিউজিদের সংখ্যা বাড়ছিল। থাকার জায়গা না পেয়ে রাস্তাঘাটেও থাকতে শুরু করেছিল ওরা, ঝড়-বাদলের পরোয়া না করে। বর্ষার মরশুম শুরু হলো, গ্রামের কাঁচা পথগুলো পরিণত হলো কাদার সাগরে। দেখা দিল মশার উৎপাত। প্রতিদিন নিত্যনতুন মানুষকে ঢুকতে দেখতাম গ্রামে—পিঠে ভারী বোঝা... পালাবার সময় যা যা পেরেছে, নিয়ে এসেছে। মহিলারাও ভার বইছে, বাচ্চারা কোলে করে নিয়ে আসছে তাদের ছোট ভাইবোনদের। রিফিউজিদের পিছু পিছু যুদ্ধও কাছে চলে আসছিল। দূর থেকে ভেসে আসা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পেতাম আমরা, কখনও কখনও রাতের আকাশ আলোকিত হয়ে উঠত গোলাবারুদের আগুনে। বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসত পোড়া গন্ধ।

'কিছুদিন পর উদয় হলো আমেরিকান সৈন্যরা। জিপ আর ট্রাকে চড়ে এল তারা, গ্রামের বাইরে বসাল তাদের ক্যাম্প। ছোট ছোট দলে টহল দেয়া, আর বাকি সময় তাঁবুর সামনে বসে তাস পেটানো... এ-ই ছিল তাদের কাজ। গ্রামের কিছু বাচ্চা ঘুর ঘুর করত ক্যাম্পের আশপাশে, আমেরিকান চকলেট আর চিউয়িং গাম পাবার আশায়। কিন্তু আমার বাবা আমাকে ওখানে যেতে দিতেন না। ওদেরকে ভয় পেতেন তিনি, কোত্থেকে যেন খবর পেয়েছিলেন, দশজনের বেশি কোরিয়ানকে যদি একত্রে পাওয়া যায়, তা হলে গুলি

চালানোর নির্দেশ আছে ওদের ওপর। কমিউনিস্ট গেরিলারা সাধারণ কোরিয়ান সেজে চোরাগোপ্তা হামলা চালাতে পারে, এই ভয় থেকেই সম্ভবত দেয়া হয়েছিল আদেশটা। এমনিতে উত্তর আর দক্ষিণ কোরিয়ানদের মাঝে তো খুব একটা পার্থক্য নেই। চেহারা বলুন, বা পোশাক-আশাক... সবই এক ছিল আমাদের। তাই সতর্ক থাকতে চাইছিল আমেরিকানরা। আরেকটা গুজব ছড়াল গ্রামে—আমেরিকান সৈন্যদের বেশিরভাগই তরুণ, সদ্য কৈশোর পেরিয়েছে, কোনোদিন নারীস্পর্শ পায়নি। এরা নাকি সুযোগ পেলেই নিঃসঙ্গ মেয়েদের ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। আমার দু'বোনের চুল কেটে ছোট করে দিলেন মা, সাজগোজ করতে মানা করে দিলেন। ঘর থেকেও বেরুতে দিতেন না। তাঁর চোখে সারাক্ষণ খেলা করত আতঙ্ক। মায়ের চোখে আমেরিকান সৈন্যরা ছিল হিংস্র পশুর মত ভয়ঙ্কর।'

চুপচাপ লিমের কথা শুনছে রানা। গল্পটা কোন্‌দিকে মোড় নিতে চলেছে, তা ও আন্দাজ করতে পারছে। কিন্তু যেটা ওকে অবাক করছে, তা হলো লিমের বলার ভঙ্গি। নিচু, একঘেয়ে সুরে গল্প বলছে সে; আবেগহীন গলায়। যেন ঘটনাগুলো অন্য কারও জীবনে ঘটেছে।

'এরপর এল সেই দিন। আমেরিকান বাহিনীর তরফ থেকে হুকুম এল, গ্রাম ছাড়তে হবে সবাইকে। উত্তরে নাকি পরাজিত হয়েছে তারা, কমিউনিস্টরা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে এদিকে। আমরা একটা ব্যাটল জোনের মাঝখানে পড়তে চলেছি। পরিষ্কার মনে আছে, থলথলে শরীরের এক আমেরিকান সার্জেন্ট বলছিল কথাগুলো। হুডখোলা একটা জিপে চড়ে গ্রামের রাস্তায় চক্কর দিচ্ছিল সে, পাশে একজন দোভাষী। হ্যাণ্ডমাইকে বলছিল, দু'ঘণ্টার ভেতর চলে যেতে হবে সবাইকে... যতটুকু হাতে নেয়া যায়, তার চেয়ে বেশি জিনিস যেন কেউ সঙ্গে না নেয়। ঘোষণা শেষ হতেই

হুড়োহুড়ি পড়ে গেল গ্রামে। আমার বাবা তখন পরাস্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তি বা ক্ষমতার কিছুই অবশিষ্ট নেই। আমাদেরকে এসে বললেন, আমেরিকানদের হুকুম না মেনে উপায় নেই। বাড়ির ভেতরে গেলেন দাদিকে আনতে। তিনি তখন শয্যাশায়ী, অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁকে ফেলে যাবার কোনও ইচ্ছে ছিল না আমাদের। বেশ কিছুক্ষণ কাটল, এরপর বেরিয়ে এলেন বাবা। চেহারা গম্ভীর।

'"উনি যাবেন না আমাদের সঙ্গে," বললেন তিনি। আমার মা প্রতিবাদ করতে গেলেন, কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিলেন বাবা। "তর্ক করে লাভ নেই, উনি তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়।" এরপর ফিরলেন আমার দিকে। "লিম, তোমাকে ডেকেছেন মা। তাড়াতাড়ি দেখা করে এসো। আমাদের হাতে বেশি সময় নেই।"

'ভয়ে ভয়ে ঢুকলাম দাদির কামরায়। বিছানায় বসে আছেন তিনি। চেহারা পাণ্ডুর হলেও তাতে দৃঢ়তার ছাপ। হাতছানি দিয়ে ডাকলেন আমাকে, পাশে বসতে ইশারা করলেন।

'"আমি তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি না, জানো তো?" বললেন দাদি। ছোট্ট এক ছ'বছরের ছেলে হলেও আমার সঙ্গে কথা বলছেন বড়দের মত। "উত্তরের সৈন্যদের আমি ভয় পাই না। আমার ক্ষতি করে কী লাভ ওদের? ওদের চেয়ে আমেরিকানরা অনেক খারাপ। মাথামোটা একটা জাত... যুদ্ধ-বিগ্রহ আর খুনোখুনি ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না। যাক গে, ওসব নিয়ে ভেবে লাভ নেই। সময় আমার এমনিতেই ফুরিয়ে এসেছে। যা-ই ঘটুক, তাতে আমার কিছু যাবে-আসবে না।"

'"সত্যিই তুমি যাবে না, দাদি?" জানতে চাইলাম।

'"না, বাছা," দাদি হাসলেন। "তোমাকে একটা উপহার দিতে চাই আমি। রাজপরিবারের কাছ থেকে পাওয়া অমূল্য প্রতিদান, যার ওপর আমি ছাড়া কারও অধিকার নেই।

একমাত্র নাতি হিসেবে আমি তোমার হাতে ওগুলো তুলে দিতে চাই।" হাত বাড়িয়ে বালিশের তলা থেকে সিল্কের একটা পাউচ বের করলেন তিনি। তুলে দিলেন আমার হাতে, যেন নিজের সর্বস্ব দিয়ে দিলেন। "তোমার বাবাকে কিছু বলতে যেয়ো না। ও ভাববে, ওর ওপর আস্থা নেই আমার। ধারণাটা খুব একটা ভুলও নয়। গত কিছুদিনে দেখলাম তো ওর অবস্থা। বিপদে পড়ে যেভাবে কেঁচোর মত গুটিয়ে গেছে, তাতে ওর ওপর আর ভরসা করা যায় না। কিন্তু তুমি ওর মত নও, লিম। তোমার চোখে আমি সেই আগুন দেখি, যা তোমার পূর্বপুরুষদের চোখে ছিল। একমাত্র তুমিই পারবে আমাদের হারানো সম্মান ফিরিয়ে আনতে... কোরিয়ার দুর্দশা ঘোচাতে। সে-কাজে আমার দেয়া উপহারটা যথেষ্ট সাহায্য করবে তোমাকে। আপাতত লুকিয়ে ফেলো ওটা। সময়-সুযোগমত খুলে দেখো। তারপর বুদ্ধি খাটিয়ে সঠিক সময়ে কাজে লাগিয়ো।" দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার মাথায় হাত বোলালেন তিনি। "এখন যাও। আমার শুভকামনা রইল। সাবধানে থেকো, লিম। কোনোদিন কাউকে বিশ্বাস কোরো না। এই দেশে আজ পর্যন্ত যত বাইরের লোক এসেছে, সবাই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমাদের সঙ্গে। তাই প্রতিশোধ নেবার জন্যে তোমাকেও তাদের পথ ধরতে হবে—এটুকুই শুধু বলতে পারি। বিদায়। ভাল থেকো।"

'পাউচটা জামার তলায় গুঁজে বেরিয়ে এলাম দাদির কামরা থেকে। একটু পর শুরু হলো আমাদের যাত্রা। আত্মপরিচয়ের কিছুই অবশিষ্ট নেই, আমরা তখন পলায়নপর রিফিউজিদের অংশমাত্র, সংকীর্ণ এক উপত্যকার মাঝ দিয়ে... ধানখেত আর ঝোপ-জঙ্গল ভেদ করে প্রাণের দায়ে এগিয়ে চলেছি। আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে কিছু আমেরিকান সৈন্য। খুব গরম পড়েছিল গত ক'দিন ধরে, সন্ধ্যায় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। মুহূর্তেই ভিজে চুপসে

গেলাম আমরা। দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল গোলাগুলির আওয়াজ, বিস্ফোরণের শকওয়েভে কাঁপছিল মাটি। রাত যখন নামল, তখন খিদে আর পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি সবাই, তারপরেও এগিয়ে চলতে বাধ্য হলাম। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে শেষ পর্যন্ত আমরা পৌঁছুলাম *নো গান রি*-র ব্রিজে।'

নড়েচড়ে বসল রানা। ইতিহাস পড়া আছে ওর—নো গান রি-র গণহত্যা তার এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। কোরিয়ান যুদ্ধের সময় আমেরিকানরা ভুল করে হামলা চালিয়েছিল ওখানে, খুন করেছিল কয়েকশ' নিরীহ দক্ষিণ কোরিয়ান রিফিউজিকে। স্ক্যাণ্ডাল এড়াবার জন্যে বহু বছর ধরে সে-ঘটনায় দায় অস্বীকার করা হয়েছে, শেষ পর্যন্ত সত্যটা প্রকাশ পেয়েছে ঘটনার প্রায় পঞ্চাশ বছর পর। লিম কোনও ভয়াল অভিজ্ঞতা শোনাবে, তা আগেই আশা করেছিল, কিন্তু সেটা নো গান রি-র অভিজ্ঞতা হতে পারে বলে ভাবেনি।

'ব্রিজের নামটা এসেছে প্রাচীন দুটো কোরিয়ান শব্দ থেকে,' বলে চলেছে লিম। 'একটার অর্থ, অরণ্য; অন্যটা হরিণ। জাপানিরা বানিয়েছিল ওই ব্রিজ। খুবই নিরেট... খুবই মজবুত করে। দুটো কংক্রিটের আর্চের ওপর দিয়ে চলে গেছে রেলওয়ে ট্র্যাক। ব্রিজ থেকে একটা কাঁচা রাস্তা নেমে গেছে নিচে, সেখানে রয়েছে কিছু মাটির ঘর—স্থানীয় চাষীরা থাকে। চারদিকে রয়েছে দিগন্ত-প্রসারিত ধানের খেত। জায়গাটা পুরোপুরি উন্মুক্ত। আশ্রয় নেবার জন্যে মোটেও উপযোগী নয়। তারপরেও থামতে বাধ্য হলাম আমরা। সবাই এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে, হাঁটতে পারছে না। রাতের আকাশে খানিকক্ষণ আগুনের গোলা উড়তে দেখলাম—একদিক থেকে উঠে আরেকদিকে আছড়ে পড়ছে, তারপর ভেসে আসছে চাপা গুমগুম শব্দ। তবে রাত বাড়তেই ছেদ পড়ল যুদ্ধে, নেমে এল নৈঃশব্দ্য। বাতাসে ধানের খেতে ওঠা গুঞ্জন শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম আমরা।

'সকাল হলো। চোখ মেলে দেখলাম, রেললাইনের ধারে গাদাগাদি করে শুয়ে আছি আমরা প্রায় ছয়শো রিফিউজি। সবুজ ইউনিফর্ম পরা আমেরিকান সৈনিকরা গর্ত খুঁড়েছে পাহাড়ি ঢালের গায়ে, আশ্রয় নিয়েছে সেখানে। কেউ কেউ চোখে বিনকিউলার ঠেকিয়ে নজর রাখছে আমাদের ওপর। ব্যাগ থেকে শুকনো খাবার বের করলেন আমার মা, ভাগাভাগি করে তা দিয়ে নাশতা সারলাম আমরা। জানি না, এরপর কী ঘটবে। খুব অদ্ভুত লাগছিল, বুঝলেন? মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে রাজধানীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে আমরা পরিণত হয়েছি ভিটেমাটিহীন শরণার্থীতে। কিন্তু তাতে অভিযোগ ছিল না। ছোট ছিলাম তো, অগাধ আস্থা ছিল বাবার ওপর। ভাবছিলাম তিনি কোনও না কোনও উপায়ে আবারও আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন আমাদের। তাঁর মুখে শুনলাম, আমেরিকানরা আমাদেরকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবে—ট্রেন বা গাড়ি জাতীয় কিছু একটা পাঠাবে। সে-আশাতেই বসে রইলাম আমরা।

'বেলা বাড়ল। রোদের তেজে ঘেমে-নেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছি, এমন সময় শুনতে পেলাম বিমানের আওয়াজ। একটু পরেই দৃষ্টিসীমায় উদয় হলো সেগুলো। সবাইকে খুশি হয়ে উঠতে দেখলাম, কারণ বিমানগুলো আমেরিকান। আমার অবশ্য অবাক লাগছিল, চারপাশে ল্যাণ্ড করার মত কোনও জায়গা নেই, তা হলে ওরা বিমান পাঠিয়েছে কেন?

'ধীরে ধীরে কাছে চলে এল বিমানগুলো। এবার চেনা গেল ওগুলোকে। যাত্রী বা মালবাহী বিমান নয়, ফাইটার। খুব নিচু হয়ে উড়ছে। ইঞ্জিনের আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়ে গেল আমাদের। কেউ নড়ল না, নড়বার কথাও কারও মাথায় আসেনি। আর সে-অবস্থাতেই আমাদের লক্ষ্য করে ফায়ার ওপেন করল ওগুলো।

'এরপর যা ঘটল, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন, মি.

রানা। কতক্ষণ সে-আক্রমণ চলেছে, আমি জানি না। শুধু এটুকু জানি, দিন যেন রাতে পরিণত হয়েছিল, বিস্ফোরিত হয়েছিল পুরো পৃথিবী। আমার চারপাশে মানুষজন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল বোমা, রকেট আর মেশিনগানের গুলির আঘাতে। কানে তালা লেগে গিয়েছিল আমার, মনে হচ্ছিল কোনও দানবীয় হাতের ঘুসি খেয়ে শ্রবণশক্তি হারিয়েছি। নির্বাক ছবির মত চোখের সামনে দেখছিলাম অকল্পনীয় নৃশংসতার দৃশ্য। আগুন, বোমা... কারও পেট ফেঁড়ে দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে, কারও হাত-পা ছিঁড়ে উড়ে চলে যাচ্ছে! বাবাকে চোখের সামনে মারা যেতে দেখলাম। এই তিনি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন... হতবিহ্বল, আকাশের দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকানো অবস্থায়; পরমুহূর্তে তাঁর মাথাটা বিস্ফোরিত হলো। ধড়টা রক্ত ছিটাতে ছিটাতে আছড়ে পড়ল মাটিতে। আমার মা হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত আতঙ্কে চেঁচাতে থাকলেন, বাবার রক্তে তাঁর শরীর মাখামাখি হয়ে গেছে। আমার বড় বোন সু-লি ছোঁ মেরে আমাকে কোলে তুলে নিল, চিৎকার করে ছুটতে শুরু করল সামনে... ব্রিজের দিকে। আর্চের তলায় আশ্রয় নিতে চাইছে, সে-মুহূর্তে ওটাই একমাত্র নিরাপদ জায়গা। টানতে টানতে মাকে নিয়ে আমাদের পিছু পিছু এল ডং-লি। তবে আমাদের মত আরও অনেকেই একই উদ্দেশ্য নিয়ে ছুটছে। খেপা গরুর পালের মত রিফিউজিদের পায়ের তলায় পিষ্ট হতে থাকল আহত-নিহতদের দেহ।

'হঠাৎ গলার কাছটা জ্বালা করে উঠল। বুঝলাম, একটা বুলেট আঁচড় কেটে গেছে চামড়ায়। যেদিক থেকে এসেছে গুলি, সেদিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। পাহাড়ের ঢাল থেকে এবার আমেরিকান সৈনিকরা গুলি করছে আমাদের উদ্দেশে। সু-লি কেঁপে উঠল, কিন্তু থামল না। আমাকে নিয়ে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে পৌঁছুল ব্রিজের তলায়। এতক্ষণে দম ফেলার ফুরসত

মিলল। গুলিগুলো পৌঁছুচ্ছে না কংক্রিট ভেদ করে। আমাকে কোল থেকে নামিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসল সু-লি। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে। একটু পরেই চোখ মেলা অবস্থায় স্থির হয়ে গেল। ওর নাম ধরে ডাকলাম, কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিলাম, কিন্তু নড়ল না কিছুতেই। বরং কাত হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। ওর পিঠে অনেকগুলো গর্ত দেখতে পেলাম... গুলির আঘাত... রক্ত বেরিয়ে আসছে। বুঝলাম, নিজের শরীরকে বর্ম বানিয়ে আমাকে রক্ষা করেছে ও। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হলো। আমার প্রাণপ্রিয় বোন, যে-আমাকে আদর-সোহাগে ভরিয়ে রাখত, প্রতি রাতে ঘুমুতে যাবার আগে গল্প শোনাত, সে মরে পড়ে আছে আমার সামনে। আমার মা আর ডং-লির খোঁজে পেছনে তাকালাম। দেখা যাচ্ছে না ওদের। ওরা পৌঁছুতে পারেনি ব্রিজের নিচে। কী ঘটেছে তা বুঝতে অসুবিধে হলো না। ছুটন্ত মানুষগুলোর ওপর নির্বিচারে গুলি চালানো হয়েছে, আমি অনাথ হয়ে গেছি চিরদিনের জন্যে।

'পরের বারো ঘণ্টা এক অবর্ণনীয় নরকযন্ত্রণা ভোগ করলাম আমি—যেন মৃত আর অর্ধমৃত মানুষের এক খোঁয়াড়ে বন্দি হয়ে আছি। বীভৎস সব ক্ষত দেখলাম—নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছে কচি বাচ্চাদের, দুই-তিন টুকরো হয়ে আছে নারী-বৃদ্ধের শরীর, অনেকে থেঁতলে গেছে, কেউ কেউ পরিণত হয়েছে মাংসপিণ্ডের দলায়। প্রচণ্ড তাপে খুব শীঘ্রি পচন ধরল লাশগুলোয়, কোত্থেকে যেন উড়ে এল হাজার হাজার কালো মাছি। গা ঘিনঘিনে গন্ধ ভাসতে শুরু করল বাতাসে।

'তাই বলে ক্ষান্ত দিল না আমেরিকানরা। যুদ্ধবিমানগুলো ক্রমাগত বোমাবর্ষণ করে গেল। কেউ পালাবার চেষ্টা করলে গুলি ছুঁড়ছে পাহাড়ে পজিশন নেয়া সৈন্যরা। পানির অভাবে পাগলের দশা হলো আমাদের। রাত নামলে অসহ্য হয়ে উঠল তৃষ্ণা। কংক্রিটের শুকনো দেয়াল চাটলাম আমি, মুখটা যাতে

লালায় ভরে ওঠে... ওই দিয়ে যদি একটু তৃষ্ণা মেটানো যায়! বার বার মনে পড়ছিল বাবা-মা আর বোনদের কথা, ইচ্ছে করছিল মরে গিয়ে ওদের সঙ্গী হতে। কষ্ট আর সহ্য করতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত অনেকটা ঘোর লাগা অবস্থায় বেরিয়ে এলাম ব্রিজের তলার টানেল থেকে, চোখ মুদে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ, ভাবলাম গুলিবৃষ্টি হবে, আমিও শান্তিতে পাড়ি জমাতে পারব পরপারে। কিন্তু ঠিক তখুনি মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ল চাঁদ। নিকষ অন্ধকারে ডুবে গেল চরাচর। কেউ আমাকে দেখতে পেল না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর হাঁটতে শুরু করলাম আমি। চাঁদ আবার মুখ দেখাবার আগেই সরে এলাম ওই মৃত্যুপুরী থেকে। তখনও প্রায় একশো মানুষ রয়ে গিয়েছিল ওই ব্রিজের তলায়। পরে জেনেছিলাম, আরও তিনদিন তাদেরকে আটকা পড়ে থাকতে হয়েছিল ওখানে।

'যে-পথে এসেছিলাম, বুদ্ধি খাটিয়ে সে-পথেই ফিরে গেলাম চু গক রি গ্রামে। ভাবলাম দাদির কাছে গিয়ে আশ্রয় নেব। কিন্তু গ্রামে পা দিয়ে থমকে দাঁড়াতে হলো। আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে সব ঘরবাড়ি। তার আগে যারা পেরেছে, পালিয়েছে। চলৎশক্তিহীন সমস্ত অসুস্থ, বুড়ো মানুষ জ্যান্ত পুড়ে মরেছে বাড়ির ভেতরে। গ্রামের আশপাশের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা কিছু মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাদের সঙ্গী হয়ে শেষ পর্যন্ত পনেরো মাইল দূরের ইয়াকমক নামে এক শহরে পৌঁছুলাম। সেখান থেকে এক ব্যাটালিয়ন দক্ষিণ কোরিয়ান সৈন্য ট্রেনে চেপে পুসানের দিকে যাচ্ছিল। স্টেশনে আমাকে একাকী উদ্‌ভ্রান্তের ঘুরতে দেখে ডেকে নেয় ওরা। আমার কাহিনী শোনার পর ট্রেনে তুলে নেয় আমাকে।

'সৈন্যদের সঙ্গে ট্রেনে চেপে দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের পুসানে পৌঁছাই আমি। কোণঠাসা দক্ষিণ কোরিয়ায় শেষ মুক্তাঞ্চল সেটা। শহরটা তখন সামরিক আর বেসামরিক

লোকে গিজগিজ করছে। শরণার্থীদের ভিড় সর্বত্র। এক মুঠো খাবারের জন্যে খুনোখুনি করতেও দ্বিধা করছে না মানুষ। ভাগ্যক্রমে একটা চার্চে আশ্রয় পেলাম আমি, আরও কিছু অনাথ ছেলেমেয়ের সঙ্গে। ওখানে বেশ কিছুদিন কাটালাম, তারপর একটা আমেরিকান মানবতাবাদী সংগঠনের প্রতিনিধিরা এসে উদ্ধার করল আমাদের সবাইকে। পুনর্বাসনের জন্যে নিয়ে গেল হাওয়াইয়ে, সেখানকার একটা অনাথ-আশ্রমে ঠাঁই দেয়া হলো আমাকে।

'আমার গল্প প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, মি. রানা, তবে দাদির দেয়া উপহারটার রহস্য না ভাঙলে তা অপূর্ণ রয়ে যাবে। বলে রাখা ভাল, অতসব তাণ্ডবের মাঝেও পাউচটা হারাইনি আমি। চার্চে আশ্রয় নেবার কিছুদিন পর খুলে দেখেছিলাম ওটা। ভেতরে পেয়েছিলাম বারোটা নীল হীরা—বিশ্বস্ততার প্রতিদান হিসেবে রানি মিনের কাছ থেকে ওগুলো পেয়েছিলেন আমার দাদি। মহামূল্যবান ওই রত্নগুলোর গুরুত্ব বুঝতে অসুবিধে হয়নি আমার, সেগুলো সযত্নে রেখে দিয়েছিলাম নিজের কাছে। হাওয়াইয়ে যাবার পর লেখাপড়া শিখলাম আমি, বড় হবার পর যখন জীবিকা অন্বেষণের পালা এল, কাজে লাগালাম হীরাগুলো। হীরা বিক্রির টাকা দিয়েই ব্যবসার গোড়াপত্তন করি আমি। হীরার স্মৃতি থেকে নিজের কোম্পানির নাম রাখি ব্লু ডায়মণ্ড। নিজের মেধা, কৌশল আর পরিশ্রম দিয়ে ধীরে ধীরে কোম্পানিকে তুলে এনেছি আজকের অবস্থায়। অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেছি দাদির উপদেশ... কাউকে কোনোদিন বিশ্বাস করিনি, কাউকে আমার দুর্বলতার সুযোগ নিতে দিইনি, আমেরিকান-দের মত ছলে-বলে-কৌশলে স্বার্থসিদ্ধি করেছি, নিজে না ঠকে ঠকিয়েছি অন্যদের—জাত-পাত নির্বিশেষে সবাইকে। ধনী-গরিবের ভেদাভেদ করিনি, এজন্যে বাজারে আমার দুর্নামও কম নয়। গরিবী হাল থেকে উঠে আসার পরেও

গরিবদের ঠকাই বলে আমাকে গাল দেয় অনেকে। কিন্তু ওসবে মাথা ঘামাই না আমি। ওরা তো জানে না, এসব কাজ করছি আমি নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য অর্জনের জন্যে।

'আমার দীর্ঘ গল্পের মূলে রয়েছে সেটাই। আমার মোটিভেশন... আমার লক্ষ্যগুলো এবার বুঝতে পারবেন আপনি, মি. রানা। চোখ বুজলে এখনও আমি নো গান রি-র সেই দিনটা দেখি। দেখতে পাই আমার বাবার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে... দেখি আমার বোনের মৃতদেহ... আর দেখি সেই কালো বীভৎস মাছিগুলোকে। নিজের অসহায়ত্ব আর সব হারানোর বেদনা এক মুহূর্তের জন্যে শান্তি দেয় না আমাকে। আর সেসবের জন্যে দায়ী স্রেফ আমেরিকানরা। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে আমার মাতৃভূমিকে শুধু দু'টুকরো করে ক্ষান্ত হয়নি ওরা, শত্রু-মিত্র চেনার প্রয়োজনীয়তা অবজ্ঞা করে নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে আমাদের ওপর, আর তার চরম মাশুল চুকাতে হয়েছে হতভাগ্য এক ছ'বছরের শিশুকে। ওদেরকে তাই ঘৃণা করি আমি... অন্তরের অন্তস্তল থেকে ঘৃণা করি! আজ পর্যন্ত আমি আমেরিকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করিনি সেই কারণে। আমেরিকার মাটিতে বসে সম্পদের পাহাড় গড়েছি নিজের কোরিয়ান পরিচয় নিয়ে। কোনোদিন বিয়ে করিনি, পাছে লক্ষ্যচ্যুত হই। অনেক বড় একটা দায়িত্ব আমাকে দিয়ে গেছেন দাদি—পরিবারের হারানো সম্মান ফেরাতে হবে আমাকে, কোরিয়ার দুর্দশা ঘোচাতে হবে... প্রতিশোধ নিতে হবে! আমার পুরো জীবন আমি উৎসর্গ করে দিয়েছি তার জন্যে।

'প্রশ্ন করতে পারেন, লক্ষ্যপূরণের জন্যে আমি এতদিন অপেক্ষা করেছি কেন? আমি ধৈর্যশীল মানুষ, মি. রানা। জানি, তাড়াহুড়োর ফল ভাল হয় না। তাই ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করেছি সঠিক সময় আর সুযোগের। এতদিনে এসেছে সেই সুযোগ। সেই সঙ্গে পেয়েছি আমাকে সাহায্য করার মত

উপযুক্ত মিত্র। এবার আমি চরম আঘাত হানব। আমেরিকাকে বুঝিয়ে দেব, কত বড় ভুল করেছিল ওরা কোরিয়াকে বিভক্ত করে। দুই কোরিয়া আবার একত্র হবে... অখণ্ড কোরিয়ার সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হবে ওরা। আর কোনোদিন আমাদের ওপর ছড়ি ঘোরাতে পারবে না।

'বলার মত আর বিশেষ কিছু নেই। অনেকক্ষণ থেকেই কথা বলছি, ধৈর্য ধরে শুনেছেন বলে ধন্যবাদ। এসব কথা শোনানোর মত সুযোগ সহজে পাই না আমি। মনটা হালকা লাগছে। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে আপনার কৌতূহল নিরসন করব এবার। নিশ্চয়ই জানতে চান, ঠিক কী ঘটাতে চলেছি আমি? না, না, মিথ্যে বলছি না, আমি নির্দ্বিধায় বলব সব। বলতে ভাল লাগবে। কীসের মধ্যে নাক গলিয়ে মরতে বসেছেন, তা আপনার জানা থাকা উচিত। তা ছাড়া পুরো প্ল্যানটা নিয়ে আমি এতই গর্বিত, সেটা না শুনিয়ে শান্তি পাব না। তবে এই অংশটা সংক্ষেপে সারতে হবে। আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই। আপনার জন্যে আরও ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার অপেক্ষা করছে।'

হাত বাড়িয়ে তাসের প্যাকেটটা কাছে টেনে নিল লিম।

পনেরো

যুদ্ধবাজ আমেরিকানদের অত্যাচারে ছয় বছরের এক এতিম শিশুর অসহনীয় দুর্দশার প্রতি সহানুভূতি জাগলেও সেই শিশু আজ কী ভয়ঙ্কর দানবে পরিণত হয়েছে সেটা ভাবতেই দূর

হয়ে গেছে রানার সমস্ত দুর্বলতা। প্লেটে নামিয়ে রাখা ছুরিটার দিকে তাকাল ও, ধারাল ফলাটা ওকে চুম্বকের মত টানছে। মাংসের স্টেকটা সহজেই কাটা গেছে ওটা দিয়ে, লিমের গলা দু'ফাঁক করতেও অসুবিধে হবার কথা নয়। ইতিমধ্যে খাওয়া শেষ করেছে ও। লিমের মুখে নো গান রি-র নৃশংস বর্ণনা শোনার সময় গা গুলিয়ে উঠেছিল, খাওয়ার রুচি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু থামেনি রানা। শেষবারের মত লড়তে চাইলে শরীরে শক্তি প্রয়োজন। জোর করে গিলেছে সব খাবার। মানসিকভাবে প্রতিপক্ষকে দুর্বল করবার জন্যেও সেটার দরকার ছিল। নির্বিকার ভঙ্গিতে খাওয়া-দাওয়া চালিয়ে যাবার অভিনয় করে তাকে বোঝাতে চেয়েছে, ভয়ঙ্কর ওই গল্প শুনে মোটেই অভিভূত হচ্ছে না ও, উন্মাদ এক খুনির প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি অনুভব করছে না।

হাত নিশপিশ করছে রানার। ইচ্ছে করছে ছুরিটা তুলে নিয়ে লিমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। কিন্তু গার্ডদের কথা ভেবে বিরত রেখেছে নিজেকে। এক মুহূর্তের জন্যে দৃষ্টি সরছে না তাদের, ক্ষণিকের জন্যেও সরছে না মনোযোগ। যেন আঠা দিয়ে তাদের দৃষ্টি সেঁটে দেয়া হয়েছে রানার ওপর। মিশেলের দিকে তাকাল। মূর্তির মত বসে আছে মেয়েটা, খেয়েছে খুব সামান্য, প্লেটটা যেভাবে দেয়া হয়েছিল, অনেকটা সেভাবেই পড়ে রয়েছে তার সামনে। খাবার স্পর্শ করেনি লিমও। সে নিজের গল্প বলায় মত্ত।

'আপনার গল্পটা ইন্টারেস্টিং, কোনও সন্দেহ নেই,' বলল রানা। দেশলাইয়ের দ্বিতীয় কাঠিটা খরচ করে আরেকটা সিগারেট ধরাল। 'তবে আমাকে না শুনিয়ে কোনও কোয়ালিফায়েড সাইকিয়াট্রিস্টকে শোনালে ভাল করতেন। কখনও কি গেছেন ওরকম কারও কাছে? না গিয়ে থাকলে আমি কয়েকজনের নাম সাজেস্ট করতে পারি। পোস্ট ট্রমাটিক সিনড্রোমের চিকিৎসায় তাঁরা খুবই দক্ষ।'

'আমাকে আপনি মানসিক রোগী বলে ভাবছেন?' লিমের চোয়াল শক্ত হলো।

'অবশ্যই। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার পর এমনটা ঘটতেই পারে। তবে এ-ধরনের রোগীদের বেলায় সাধারণত আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়। আপনার বেলায় ঘটেছে ঠিক উল্টোটা। নিজে না মরে আপনি অন্যকে মারতে চাইছেন। কেসটা যথেষ্ট সিরিয়াস বলে মনে হচ্ছে। আরেকটু বুঝে নেয়া দরকার। প্লিজ, কণ্টিনিউ। দেখা যাক, আপনার উন্মাদনা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে। বাই দ্য ওয়ে, স্টেকটা খুব ভাল ছিল। যাবার সময় রেসিপিটা সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।'

এক মুহূর্তের জন্যে আগুন জ্বলে উঠল লিমের চোখদুটোয়। মুঠো হয়ে গেল হাত। মনে হলো এখুনি বিস্ফোরিত হবে। কিন্তু পরক্ষণেই আশ্চর্য দক্ষতায় সামলাল নিজেকে। হাসল নিঃশব্দে।

'আপনি আমাকে রাগাতে চাইছেন, মি. রানা। ভাবছেন, রেগে গেলে কিছু একটা ভুল করব আমি, আর আপনি সেটার ফায়দা তুলবেন। দুঃখিত, সে-রকম কোনও সুযোগ আপনাকে দেয়া হবে না। কাজেই আপনার অপমানজনক মন্তব্য কানে না তুলে আমি আমার কথা বলে যাব। অবশ্য... যদি চান তো কথাবার্তা বাদ দিয়ে আমরা সরাসরি পরের অংশটাতেও চলে যেতে পারি। যেটার মাধ্যমে আপনার ভাগ্য নির্ধারিত হবে।'

'আপনার প্ল্যান আমরা জানি, মি. লিম,' বলে উঠল মিশেল। কণ্ঠস্বর শান্ত, সংযত। রানার দিক থেকে কোরিয়ান টাইকুনের মনোযোগ ফেরাতে চাইছে। 'ঘুষ দিয়ে ওয়ালপ্স্ আইল্যাণ্ডের একজন সুপারভাইজরকে কিনে নিয়েছেন আপনি, তার মাধ্যমে স্যাবোটাজ করিয়েছেন আমেরিকান একটা রকেটে। টাকাগুলো কে দিয়েছিল আপনাকে, বলুন তো? আপনার সেই মিত্ররা? ভালই বন্ধু বেছেছেন... জাল নোটের বাণ্ডিল ধরিয়ে দিয়েছে আপনাকে। আর সেই জাল

নোটের সূত্র ধরেই আপনার কাছে পৌঁছেছি আমরা।'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা দুঃখজনক,' স্বীকার করল লিম। 'উত্তর কোরিয়ার ক্ষমতাসীন সরকারের ছোটলোকির চরম দৃষ্টান্ত বলতে পারেন। এমনিতে কাজটায় আপত্তি নেই আমার। উত্তর কোরিয়ার প্রেসে তৈরি করা হচ্ছে নকল ডলার, সেগুলো সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে আমেরিকার অর্থনীতিতে ধস নামাবার জন্যে। কিন্তু আমাকে ওসব গছানো একদম উচিত হয়নি ওদের। খামোকা বাড়তি ঝামেলায় পড়লাম। তবে... ওতে আমার প্ল্যানের কোনও হেরফের হচ্ছে না।'

'উত্তর কোরিয়া?' ভ্রূকুটি করল রানা। 'আপনি দক্ষিণ কোরিয়ান হয়ে হাত মিলিয়েছেন উত্তর কোরিয়া... মানে, আপনাদের চরম শত্রুর সঙ্গে?'

'কোরিয়া একটাই, মি. রানা,' বলল লিম। 'উত্তর-দক্ষিণের বিভেদ সৃষ্টি করেছে এই পশ্চিমারা। আমাদের মাঝে বিবদমান শত্রুতাও ওদেরই উপহার। তবে সুখবর হলো, যেদিন দুই কোরিয়া একত্র হবে, সেদিন অবসান ঘটবে সব শত্রুতার। আমি সেই লক্ষ্যেই কাজ করছি। কারণ আমি একজন জাতীয়তাবাদী। লক্ষ-কোটি কোরিয়ানদের মত আমিও অখণ্ড কোরিয়ার স্বপ্ন দেখি। উত্তর বা দক্ষিণের প্রতি আমার আলাদা কোনও দুর্বলতা নেই, উদ্যোগটা যে-কোনও পক্ষ থেকে নিলেই চলে। দুর্ভাগ্যক্রমে দক্ষিণ কোরিয়া এখন আমেরিকার পা-চাটা কুকুর, কাজেই অখণ্ড কোরিয়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে পারে শুধু উত্তর কোরিয়া। সেই শক্তি, সামর্থ্য ও দৃঢ়তা তাদের আছে। আমি তাই তাদের দলে যোগ দিয়েছি।'

'কিন্তু একটা আমেরিকান রকেট ক্র্যাশ করিয়ে কীভাবে দুই কোরিয়াকে একত্র করা সম্ভব, তা আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'তা হলে বোঝা গেল, আমার প্ল্যান জানেন বলে মিস

হান্টার এইমাত্র যে-বুলিটা ছাড়লেন, তা সর্বৈব মিথ্যা,' মিটিমিটি হাসছে লিম। 'আমার প্ল্যানের খুব সামান্য একটা অংশই শুধু জানতে পেরেছেন আপনারা। হ্যাঁ, জোসেফ ফিনিঙ্গার কে কাজে লাগিয়েছি আমি—ওয়ালপ্‌স্‌ আইল্যান্ডের রকেটের টার্বো পাম্পে ছোট্ট একটু কারসাজি করেছে সে। প্রি-লঞ্চ টেস্টে সেটা ধরা পড়েনি, কারণ টেস্টগুলোয় সত্যিকার ফিউয়েল ইগনিশন করা হয় না। কাজেই কয়েক ঘণ্টা পর যখন রকেটটা লঞ্চ করা হবে, পাম্পটা যথেষ্ট পরিমাণ ফিউয়েল ইনজেক্ট করতে পারবে না কমবাশচন চেম্বারে। ফলে গতি হারাবে রকেট, ব্যর্থ হবে অরবিটে পৌঁছুতে। নিচের কন্ট্রোল রুমে যখন ব্যাপারটা ধরা পড়বে, তখন কিছুই করার থাকবে না। ওরা বাধ্য হবে রকেটের সেলফ-ডেস্ট্রাক্ট সিস্টেম অ্যাক্টিভেট করতে। বিস্ফোরণ ঘটবে রকেটে—টুকরোগুলো আপার অ্যাটমোস্ফিয়ারেই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

'কিন্তু সেটা যদি না ঘটে? ধরুন, কোনও টেকনিকাল ফল্টের কারণে সেলফ-ডেস্ট্রাক্ট সিস্টেম কাজ করল না... আস্ত রকেট বা তার অংশবিশেষ আকাশ থেকে খসে পড়ল কোনও জনবহুল শহরের বুকে। উদাহরণ হিসেবে নিউ ইয়র্কের কথাই ধরা যাক। কল্পনা করতে পারেন, বিশ হাজার পাউণ্ড ওজনের একটা সিলিণ্ডার... ভেতরটা দাহ্য জ্বালানি আর তরল অক্সিজেনে ভরা, ঘণ্টায় দু'শো বিশ মাইল বেগে যদি আছড়ে পড়ে কোথাও... কী ঘটবে? আমি বলছি। প্রায় দশ লাখ টন টিএনটি-র সমপরিমাণ একটা বিস্ফোরণ হবে, যেটার সঙ্গে একটা নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশনের বিশেষ তফাৎ নেই। ধূলিসাৎ হয়ে যাবে বিশাল একটা এলাকা, মারা যাবে অসংখ্য মানুষ। মি. রানা, আমি ঠিক সেটাই ঘটাতে চলেছি... মানে, সিমুলেট করতে চাইছি।

'গত রাতে আপনি আমার ওয়্যারহাউসে ঢুকেছিলেন,

নিশ্চয়ই সেখানে আমেরিকান রকেটের একটা নিখুঁত রেপ্লিকা দেখেছেন। ইতিমধ্যে সেটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে কোনি আইল্যাণ্ডের র‍্যাপিড ট্রানজিট ইয়ার্ডে। নিউ ইয়র্কের ট্রানজিট সিস্টেমে প্রচুর লোক ঢুকিয়েছি আমি, ওখানকার ওয়ার্কশপ এখন আমার দখলে। রেপ্লিকা রকেটটা সাবওয়ের একটা ট্রেনে তুলব আমরা, সেই সঙ্গে তুলব একটা বিশাল বোমা—ওটাও গত রাতে দেখে থাকবেন হয়তো। সি-ফোর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ওই বোমা—দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী এক্সপ্লোসিভ। দু'তিন পাউণ্ড দিয়েই যেখানে একটা বিল্ডিং ধসিয়ে দেয়া যায়, সেখানে আমার ট্রেনে থাকবে দেড় লাখ পাউণ্ড... ডিটোনেটররে সংযুক্ত অবস্থায়।

'রকেট লঞ্চের আধঘণ্টা আগে কোনি আইল্যাণ্ড থেকে রওনা হবে আমার ট্রেন। লাইন যাতে ক্লিয়ার থাকে, সে-ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে... ট্রেনটা কোথাও না থেমে সরাসরি পৌঁছুবে থার্টি-ফোর্থ স্ট্রিট আর সিক্সথ অ্যাভিনিউয়ের জংশনে। ম্যানহাটন সম্পর্কে যদি আপনার ধারণা থাকে তো বুঝবেন, ওটা নিউ ইয়র্ক সিটির কেন্দ্রবিন্দু... এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং থেকে মাত্র দু'ব্লক দূরে। দূরত্বটা খানিকটা বেশি, প্রায় দেড় হাজার ফুট, তবে ভূগর্ভের একটা ঝরনার সাহায্য পাব আমরা। পুরনো ম্যাপগুলোয় ওটাকে সানফিশ পণ্ড বলে নাম দেয়া হয়েছে। শহরের তলার মেটামরফিক রকের মাঝ দিয়ে বিস্ফোরণের শকওয়েভ ছড়িয়ে দেবে ওটা। আমার টেকনিশিয়ানরা হিসেব করে জানিয়েছে, প্রাথমিক বিস্ফোরণে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং ধ্বংস হবে না, কিন্তু সয়েল লিকুইফিকেশন নামে একটা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার কারণে ধসে পড়বে ওটা। সোজা কথায় শকওয়েভের ধাক্কায় তরল হয়ে যাবে বিল্ডিঙের তলার মাটি, ভার নিতে পারবে না, তাই পড়ে যাবে অবলম্বন হারিয়ে। পঙ্গু কোনও মানুষের ক্রাচ কাদায় পড়লে যা হয় আর কী। আশপাশে আরও কী পরিমাণ

ধ্বংসযজ্ঞ হবে, সেটা আর না-ই বললাম। নিউ ইয়র্কের একটা বিশাল অংশ নেই হয়ে যাবে চোখের পলকে।

'এটাই আমার প্ল্যান, মি. রানা। রাত এগারোটার খানিক পরে আমেরিকান রকেটে গোলমাল দেখা দেবে, ওটাকে ধ্বংস করে দিতে বাধ্য হবে এন.আর.এল.। তার ঠিক পাঁচ মিনিট পর নিউ ইয়র্কের কেন্দ্রে ভয়াবহ এক বিস্ফোরণ ঘটবে। শহরের আনাচে-কানাচে নিজস্ব লোক ছড়িয়ে রেখেছি আমি, ওরা সাক্ষ্য দেবে—বিস্ফোরণের ঠিক আগে-ভাগে আকাশ থেকে কিছু একটা ওরা খসে পড়তে দেখেছে। রকেট ফেইলিওরের খবর যদি আমেরিকান সরকার না-ও প্রচার করে, আমি সেটা লিক করে দেব। দু'য়ে দু'য়ে চার মিলিয়ে নেবে মিডিয়া আর সাধারণ জনগণ—আকাশ থেকে খসে পড়েছে নষ্ট রকেট, তাই এই দুর্ঘটনা। সবচেয়ে বড় কথা, রকেটটা তাদেরই। বিস্ফোরণের কেন্দ্রে যে-বিশাল গর্ত সৃষ্টি হবে, সেখানে পাওয়া যাবে রকেটের খণ্ড-বিখণ্ড অংশ—ঘটনার অকাট্য প্রমাণ। ট্রেনের ধ্বংসাবশেষও হয়তো কিছু পাওয়া যাবে, তবে সেটা বিস্ফোরণেই ধ্বংস হয়েছে বলে চালিয়ে দেয়া যাবে। এরপর সরকার যতই অস্বীকার করুক... যতই বলুক যে, আসল রকেটটা তারা আকাশে থাকতেই ধ্বংস করে দিয়েছে... কেউ সে-কথা বিশ্বাস করবে না। সমস্ত দোষ বর্তাবে আমেরিকান সরকারের ওপর, আমি রয়ে যাব ধরাছোঁয়ার বাইরে। শুধু তা-ই নয়, নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে বড় কণ্ট্রাকটর হিসেবে দুর্ঘটনাসৃষ্ট জঞ্জাল অপসারণ, এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পুনর্নির্মাণের বেশিরভাগ কাজ আবার আমার কোম্পানিকেই দেয়া হবে। দেখতেই পাচ্ছেন, এক ঢিলে কত পাখি শিকার করছি আমি!'

'ধরে নিচ্ছি, এই প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্যেই বিদেশি লোকজনকে গত কয়েক মাস ধরে আমেরিকা থেকে তাড়াচ্ছেন আপনি?' বলল রানা। 'সেখানে নিজের লোক

ঢোকাচ্ছেন?'

'এগজ্যাক্টলি,' বলল লিম। 'আসলে আমি নিউ ইয়র্কে নিজের লোক ঢোকাতে চাইছিলাম, কিন্তু সেটা আলাদাভাবে করলে লোকের চোখে পড়ে যেতে পারে বলে পুরো দেশ থেকেই শ্রমিক আর অন্যান্য পেশার লোকজনকে খেদাবার পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। আফটার অল, বাইরের লোকের ওপর কী করে আস্থা রাখি বলুন? এসব কাজ তো একা করা যায় না। ঘটনা ঘটাবার আগে যেমন গোপনীয়তা প্রয়োজন, ঠিক তেমনি ঘটনার পরেও প্রমাণ লোপাট করা বা নকল এভিডেন্স সাজানোর জন্যে বিশ্বস্ত লোক দরকার। তাই আমার মতাদর্শে বিশ্বাসী লোকজনকে বিভিন্ন জায়গায় প্লেস করতে হয়েছে।'

'কিন্তু এ-কাজ করে কী লাভ হচ্ছে আপনার? হ্যাঁ, এক হিসেবে হয়তো ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে পারছেন... আমেরিকার নিরীহ মানুষজনকে মেরে শোধ নিতে পারছেন নো গান রি-র গণহত্যার। তাতে উত্তর কোরিয়া আপনাকে সাহায্য করছে কেন? দুই কোরিয়া একত্র হবার ব্যাপারেই বা কী ভূমিকা রাখবে ওই রকেট ক্র্যাশ?'

'ভূমিকাটা পরোক্ষ, মি. রানা, তবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইন ফ্যাক্ট, ওটাই এই অপারেশনের মূল লক্ষ্য। ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার যে-পয়েন্ট তুললেন, সেটা আমার জন্যে বোনাস। খোলাসা করে বলছি। আগেই শুনেছেন, কোরিয়ার একত্রীকরণ একমাত্র উত্তর কোরিয়ার মাধ্যমে হতে পারে... আগেও একাধিকবার সে-চেষ্টা করা হয়েছে, কোনোবারই তা সফল হয়নি আমেরিকার বাধার কারণে। দক্ষিণ কোরিয়াকে কুক্ষিগত করে রেখেছে ওরা। ওদের হাতের মুঠো থেকে দেশটাকে মুক্ত করার জন্যে উত্তর কোরিয়াকে সামরিক শক্তিতে আমেরিকার সমকক্ষ হয়ে উঠতে হবে। এ-কারণেই পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করছে উত্তর কোরিয়া, একের

পর এক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। কিন্তু ক্রমাগত তাতে বাধা দিয়ে চলেছে আমেরিকা, জাতিসংঘের মাধ্যমে আরোপ করছে একের পর এক নিষেধাজ্ঞা, একঘরে করতে চাইছে দেশটাকে। শুধু তা-ই নয়, সামরিক অভিযান চালাবারও প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা। ওয়ালপ্‌স্‌ আইল্যাণ্ডের রকেট লঞ্চ তারই অংশ। লোকে জানে, একটা ওয়েদার মনিটরিং স্যাটেলাইট লঞ্চ করা হচ্ছে ওই রকেটের সাহায্যে, আসলে কিন্তু সেটা এক অত্যাধুনিক স্পাই স্যাটেলাইট। উত্তর কোরিয়ার মাথার ওপর বসানো হবে ওটা, ডিটেক্ট করা হবে সমস্ত নিউক্লিয়ার লঞ্চ সাইট আর মিসাইল ডিপো, যাতে অতর্কিত হামলা চালিয়ে ধ্বংস করে দেয়া যায় ওগুলো। এসব তথ্য ইন্টেলিজেন্স অপারেশনের মাধ্যমে জানা গেছে। এখন আপনিই বলুন, অমন একটা স্যাটেলাইট কী করে আকাশে উড়তে দেয় ওরা? সরাসরি ধ্বংস করাও সম্ভব নয়, তাতে যুদ্ধ বেধে যাবে। তাই বেছে নেয়া হয়েছে বিকল্প ব্যবস্থা, যাতে সাপ মরে, আবার লাঠিও না ভাঙে। এ-কথা ঠিক, পুরো ঘটনার জন্যে উত্তর কোরিয়াকে সন্দেহ করবে ওরা, কিন্তু প্রমাণের অভাবে কিচ্ছু করতে পারবে না। বরং ইশারায় ধমক দেয়া হবে—দেখেছ তো, উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে লাগতে গেলে কী হয়? যদি ভাল চাও তো ভবিষ্যতে আর বাড়াবাড়ি কোরো না। কেঁচোর মত গুটিয়ে যেতে বাধ্য হবে ওরা, রকেট ক্র্যাশের ফলে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা সামাল দিতে হিমশিম খাবে, দ্বিতীয় কোনও স্যাটেলাইটও পাঠাতে পারবে না জনগণের প্রতিবাদের মুখে। সেই সুযোগে উত্তর কোরিয়া তাদের পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ করবে। তারপর অভিযানে নামবে দক্ষিণ কোরিয়াকে মুক্ত করবার জন্যে। আমরা পাব অখণ্ড কোরিয়া। কী বলেন, মি. রানা, প্ল্যানটা চমৎকার নয়?'

জবাব না দিয়ে একটু ভাবল রানা। এতক্ষণ যা শুনল, তা খতিয়ে দেখছে। সুদূরপ্রসারী ও জটিল এক ছক সাজিয়েছে

লিম... তাতে সফল হবার সম্ভাবনা কতখানি? হ্যাঁ, আমেরিকার সমস্ত স্পেস প্রোগ্রাম থমকে দাঁড়াবে; উত্তর কোরিয়াও হয়তো নিজেদের পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে পারবে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত অখণ্ড কোরিয়া প্রতিষ্ঠিত হবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। নিশ্চয়তা আছে কেবল একটা ব্যাপারে—নিউ ইয়র্কের কয়েক লক্ষ নিরীহ মানুষ মারা পড়তে চলেছে ভয়াবহ বিস্ফোরণে, যার মাঝে রয়েছে অন্তত কয়েক হাজার প্রবাসী বাঙালি-সহ অন্যান্য দেশের খেটে-খাওয়া মানুষ। নো গান রি-র গণহত্যার মাশুল শুধু আমেরিকান জনগণ নয়, অন্যেরাও চুকাতে চলেছে। সব কিছু ফেলে এটুকুই বড় হয়ে দেখা দিল ওর চোখে।

অস্থিরতা অনুভব করল রানা। যে করে হোক, ওয়ালপ্স্ আইল্যাণ্ডের রকেট লঞ্চ থামাতে হবে ওকে। হাতে সময় নেই একদমই। পালাবার উপায় নিয়ে ভাবতে শুরু করল আবার। গার্ডদের দেখে নিল, এখনও একাগ্র চোখে ওর দিকে চেয়ে আছে তারা।

'কী হলো, কিছু বলছেন না যে?' লিমের গলা শুনে সংবিৎ ফিরল ওর।

রেড ওয়াইনে চুমুক দিল রানা। বলল, 'বলার মত তেমন কিছু নেই। শুধু এটুকু জানাই, অযথা সময় নষ্ট করছেন আপনি। এখানে আসার আগে আমি আর মিস হাণ্টার... দু'জনেই যার যার হেড অফিসে তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্ট দিয়ে এসেছি, পাঠিয়ে দিয়েছি আপনার জার্মান দুর্গ থেকে পাওয়া ছবিগুলোর কপি। ছবিতে রকেটের রেপ্লিকা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। জোসেফ ফিনিঙ্গারের ব্যাপারে জানি আমরা, জাল নোটগুলোও আমাদের হাতে। নিশ্চিত থাকতে পারেন, দুর্ঘটনার যে-দৃশ্য আপনি সাজাতে চাইছেন, তা বিশ্বাস করবে না কেউ।'

‘খামোকাই আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন, মি. রানা,’ বলল লিম। ‘যুগটাই এখন বিভ্রান্তির। সত্যের চেয়ে মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ। ভেবেছেন ওই ছবি দেখিয়ে পুরো দুনিয়াকে বুঝ দেয়া যাবে? কক্ষনো নয়। যাক গে, তর্ক করে লাভ নেই। আমেরিকার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে, এবার আপনার ভাগ্যের দিকে নজর দেয়া যাক।’ প্যাকেট খুলে তাসগুলো বের করল সে।

‘তাস কেন? জুয়া খেলতে চান?’

‘জুয়াই... তবে সেটা আপনার জীবন নিয়ে। খেলার নিয়মকানুন সংক্ষেপে জানিয়ে দিচ্ছি...’

গৎবাঁধা বুলি আউড়াতে শুরু করল কোরিয়ান টাইকুন—কোরিয়ার তাস খেলা, মৃত্যুর অনিশ্চয়তা, নিজের বানানো তাসের ডেক, ইত্যাদি। আড়চোখে মিশেলের দিকে তাকাল রানা, লিমের কথা শুনে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মেয়েটার চেহারা। অবাক লাগল, খানিক আগে কয়েক লক্ষ মানুষের আশুমৃত্যুর কথা শুনেও এতটা ঘাবড়ে যায়নি, অথচ রানার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। বোকার মত কিছু না করে বসলে হয়। চোখের ইশারায় ওকে শান্ত থাকতে বলল রানা।

‘...মৃত্যু এখন আমার জন্যে এক খেলা, মি. রানা,’ নিজের কথা বলে চলেছে লিম। ‘সেই খেলায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাকে।’ তাসগুলো শাফল করল সে, তারপর মেলে ধরল টেবিলের ওপর। ‘এই নিন। যেটা ইচ্ছে তুলুন। উল্টোপাশে লেখা থাকবে আপনার মৃত্যুর পন্থা।’

উল্টো করে বিছিয়ে রাখা তাসগুলোর ওপর চোখ বোলাল রানা। তেতো ঠেকল মুখের ভেতরটা। ওর মত আরও কতজনকে এভাবে নিজের মৃত্যু বেছে নিতে হয়েছে কে জানে।

‘তাসগুলো আপনি নিজের পশ্চাৎদেশে ঢুকিয়ে রাখতে পারেন, মি. লিম,’ শান্ত গলায় বলল ও। ‘আপনার নোংরা

খেলায় আমার কোনও আগ্রহ নেই। আমাকে যদি খুন করতে চান তো এমনিতেই করুন।'

'মরতেই হবে, এমন কোনও কথা নেই, মি. রানা,' অপমানটা গায়ে মাখল না লিম। 'এখানে তিনটে সাদা তাস আছে! ওগুলোর কোনোটা উঠলে বেঁচে যাবেন আপনি।'

'বিশ্বাস করি না।'

'কাম অন, মি. রানা! আমি আপনাকে মিথ্যে বলব কেন?'

'তা হলে দেখতে দিন, সত্যিই আছে কি না।'

থমকে গেল লিম। এ-কথা এর আগে কেউ বলেনি তাকে। মনে মনে হাসল রানা, একটু সময়ের জন্যে হলেও খেলার নিয়ন্ত্রণ সরানো গেছে লোকটার হাত থেকে। দেখা যাক, ফাঁদে সে পা দেয় কি না।

ঠোঁট কামড়ে একটু ভাবল লিম। তারপর বলল, 'বেশ, দেখুন।'

হাত বাড়িয়ে তাসগুলো তুলে নিল রানা। উল্টে দেখতে শুরু করল। লিমের কথাই ঠিক, প্রত্যেকটায় লেখা রয়েছে একটা করে মৃত্যুর কায়দা—বিষ, ফাঁসি, অনাহার, জবাই, ইত্যাদি। সবগুলো পড়ার রুচি হলো না, দ্রুত পুরো ডেকটা দেখে নিল ও। আছে... সাদা তিনটে তাস সত্যিই রাখা হয়েছে ওতে। নিশ্চিত হবার জন্যে সেগুলো বের করে পরখ করল ও, তারপর আবার ঢুকিয়ে রাখল ডেকে। এরপর সবগুলো তাস ফিরিয়ে দিল লিমের হাতে।

'সন্তুষ্ট?' জিজ্ঞেস করল লিম।

নীরবে মাথা ঝাঁকাল রানা।

হাসি ফুটল কোরিয়ান টাইকুনের মুখে। তাসগুলো নতুন করে শাফল করল সে। দ্বিতীয়বারের মত বিছিয়ে রাখল টেবিলের ওপর।

'নিন... টানুন।'

'না, রানা!' টেবিলের ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠল মিশেল। 'টেনো না!'

অস্ত্রধারী গার্ডদের দিকে ইশারা করল রানা। 'আমি নাচার।' সামনে একটু ঝুঁকল ও। তীক্ষ্ণচোখে দেখল সবক'টা তাস। তারপর মাঝখান থেকে টেনে বের করল একটা। সেটা বাড়িয়ে ধরল লিমের দিকে। 'টানলাম। আপনি খুশি তো?'

দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে তাসটা নিল লিম। রানার চোখে ভয়ডর না দেখে বিস্মিত হয়েছে। কারণ কী?

'কই, উল্টান! দেখান কী উঠেছে!' তাড়া দিল রানা, ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা।

উল্টাল লিম। তাসটা সাদা! কিচ্ছু লেখা নেই! মুখের ভাষা হারাল সে।

'বাহ্! একেই বলে ভাগ্য!' রানার ঠোঁটের হাসি প্রসারিত হলো। 'ধরে নিচ্ছি আপনি এক কথার মানুষ। কাজেই যদি বেরোবার দরজাটা দেখিয়ে দেন, শুভরাত্রি জানিয়ে চলে যেতে পারি।'

'না!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করল লিম।

'সে কী! কথার বরখেলাপ করবেন?'

'নিশ্চয়ই করব! কারণ আপনি সৎভাবে খেলেননি... জোচ্চুরি করেছেন!'

'কীভাবে জোচ্চুরি করলাম? তাস তো আপনিই বাঁটলেন।'

প্রশ্নটার জবাব জানা নেই লিমের। কথা খুঁজে পেল না। থরথর করে কাঁপছে সে। দেখতে ভাল লাগছে রানার। অভিযোগটা অবশ্য মিথ্যে নয়, সত্যিই কিছু একটা কৌশল খাটিয়েছে ও, তবে সেটা এই উন্মাদের পক্ষে ধরা সম্ভব নয়। খুব সরল এক কৌশল... তাসগুলো দেখার ফাঁকে সাদা একটা তাসের কোনা নখ দিয়ে আলতোভাবে খুঁটে দিয়েছে ও—এতই সূক্ষ্মভাবে যে, জানা না থাকলে সেটা খালি চোখে

ধরা পড়বে না। এরপর যখন তাসগুলো বিছিয়ে দেয়া হলো, খুঁটে দেয়া তাসটা টেনেছে। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে করেনি কাজটা... জানে, দুনিয়া উল্টে গেলেও ওকে জ্যান্ত ছেড়ে দেবে না লিম... কিন্তু লোকটার একতরফা খেলার আনন্দ মাটি হয়ে গেছে ওতে।

'জোচ্চুরি করেছেন আপনি—আমি জানি!' গোঁয়ারের মত বলল লিম। 'কাজেই আবার তাস টানা হবে। না, আপনাকে আর সুযোগ দেব না, এবার আমি টানব আপনার হয়ে।'

ঝট্ করে একটা তাস তুলল সে। উল্টে দেখল অপর পাশ। তারপর দেখতে দিল রানাকে। বড় বড় হরফে সেখানে লেখা রয়েছে:

জ্যান্ত কবর।

একটু শান্ত হয়েছে লিম। হেলান দিল চেয়ারে। বলল, 'হ্যাঁ, এবার উঠেছে সঠিক তাস। এমন একটা মৃত্যুই প্রাপ্য আপনার—ধীর, কষ্টদায়ক।' মিশেলের দিকে তাকাল। 'আপনাকে আরও কয়েক দিন বাঁচিয়ে রাখব বলে ঠিক করেছি আমি, মিস হান্টার। কারণ, আপনি আমার জন্যে মোটেও হুমকি নন, আমার গার্ডদেরও মনোরঞ্জনের একটা ব্যবস্থা হবে আপনার মাধ্যমে। আমেরিকান মেয়েদের খুব পছন্দ করে ওরা।' শব্দ করে হাসল সে। 'আর আপনি... মি. রানা... আপনাকে একটা বাক্সে ভরে মাটিতে পুঁতে ফেলা হবে। খবরদার, বাধা দেবার চেষ্টা করবেন না। তা হলে আমার গার্ডরা আপনার হাঁটুতে গুলি চালাবে। তা হলে জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো মাটির তলায় অন্ধকার আর আতঙ্কের পাশাপাশি তীব্র যন্ত্রণাতেও কাটাতে হবে আপনাকে।'

গার্ডদের উদ্দেশে কোরিয়ান ভাষায় কয়েকটা নির্দেশ দিল লিম। উঠে দাঁড়াল। 'এবার আমাকে নিউ ইয়র্কের পথে রওনা হতে হয়। শুভরাত্রি। আপনার মৃত্যু কষ্টদায়ক হোক, মি. রানা।'

রানাও চেয়ার ছাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে দু'গার্ড এসে দু'পাশ থেকে চেপে ধরল ওকে। বাকি দু'জন চলে এল সামনে, বন্দুকের নল তাক করল ওর তলপেটে। মিশেল ছুটে এল ওর দিকে, ঝাঁপিয়ে পড়ল বুকে। দু'হাতে ওকে জাপটে ধরল।

'না, প্লিজ!' হাহাকারের মত শোনাল মিশেলের গলা। 'আমাকে ফেলে যেয়ো না, রানা!' টান দিয়ে ছাড়াতে চাইল ওকে, কিন্তু গার্ডরা অনড়। 'প্লিজ, ওকে ছেড়ে দিন। আপনারা যা চাইবেন, আমি তা-ই করব।'

'থামুন!' গর্জে উঠল লিম। 'সিনেমার নায়িকার মত সিন ক্রিয়েট করবেন না। অ্যাই, কে আছিস... একে নিয়ে যা এখান থেকে।'

সঙ্গে সঙ্গে নতুন দু'জন গার্ড ঢুকল কামরায়। টেনে-হিঁচড়ে মিশেলকে রানার কাছ থেকে সরিয়ে আনল তারা। নিয়ে গেল রুমের এক প্রান্তে।

অগ্নিদৃষ্টিতে কোরিয়ান টাইকুনের দিকে তাকাল রানা। 'ভুল করছেন আপনি, মি. লিম। মানুষের জীবন নিয়ে খেলছেন... এর ফল খুব শীঘ্রি ভোগ করতে হবে আপনাকে।'

'তেমন কিছু যদি ঘটেও,' দম্ভভরে বলল লিম, 'সেটা দেখার জন্যে আপনি বেঁচে থাকবেন না।'

ইশারা করল সে। ঠেলাধাক্কা দিয়ে রানাকে রুম থেকে বের করে নিয়ে গেল গার্ডেরা।

ষোলো

কফিন নয়, প্লাইউডের একটা বাক্স আনা হয়েছে রানার জন্যে—আকারে সেটা অনেকটা কফিনের মতই। ডালাটা সরিয়ে রাখা হয়েছে একপাশে। বাড়ির পেছনের কাঁচা জমিনে রাখা হয়েছে বাক্সটা। ব্লু ডায়মণ্ডের মনোগ্রামঅলা একটা মেকানিক্যাল ডিগারের সাহায্যে খোঁড়া হচ্ছে গর্ত—প্রায় সাত ফুট গভীর। ডিগার অপারেট করছে অল্পবয়েসী এক আমেরিকান তরুণ, মাথায় সোনালি চুল, নিষ্পাপ চেহারা। দেখে মনে হয় না এর পক্ষে কোনও খারাপ কাজ করা সম্ভব, অথচ নির্বিকার চেহারায় ডিগার চালাচ্ছে সে। আদৌ কি জানে, ওর খোঁড়া গর্তটা কী কাজে ব্যবহার হতে চলেছে?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমন সব এলোমেলো চিন্তা করছে রানা। ওর চোখের সামনে সম্পন্ন করা হচ্ছে সব আয়োজন—নিজের কবর খোঁড়া দেখতে বাধ্য করা হচ্ছে ওকে। চারদিকে রয়েছে সশস্ত্র চার গার্ড—সবার অস্ত্র ওর দিকে তাক করা। এরা কোনও সুযোগ দেবে না ওকে।

গর্ত খোঁড়া শেষ হয়েছে। ইঞ্জিনে জোর আওয়াজ তুলে ধীরে ধীরে পিছিয়ে গেল ডিগার। সময় সমাগত। গলার ভেতরটা খসখসে লাগল রানার, হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে হৃৎপিণ্ডে। শক্ত থাকার চেষ্টা সত্ত্বেও মানবসত্তার আদিমতম আতঙ্ক—মৃত্যুভয় চেপে বসছে মনে, হাজারো ট্রেনিঙে যা দূর হবার নয়।

শত্রুর চূড়ান্ত পরিণতি দেখার জন্যে শেষ মুহূর্তে হাজির হয়েছে অ্যাণ্ডি লিম। ডিনারের পোশাক বদলে ফেলেছে, এখন তার গায়ে সাবওয়ে ওয়ার্কারের ছদ্মবেশ—গায়ে ঢোলা কভারঅল, পায়ে বুট, আর মাথায় ইঞ্জিনিয়ার্স ক্যাপ। ডিগারটা সরে গেলে বাক্সের দিকে ইশারা করল।

'ঢুকে পড়ুন, মি. রানা। জানেন কি না জানি না, বাক্সের ভেতরে সর্বোচ্চ এক ঘণ্টা টিকবেন আপনি, এরপর মারা যাবেন দম বন্ধ হয়ে। অবশ্য তার বহু আগেই আতঙ্কে পাগল হয়ে যাবেন বলে আমার ধারণা। শেষবারের মত কিছু বলতে চান? মস্করা করবেন না আমার সঙ্গে?'

'জাহান্নামে যান!' দাঁতে দাঁত পিষে বলল রানা।

'বিদায়-সম্ভাষণ হিসেবে কথাটা খুব শোভনীয় হলো না। কী আর করা! যান, সুবোধ বালকের মত এবার শুয়ে পড়ুন বাক্সে।'

কিছু করা যায় কি না, ভাবল রানা। লড়াই করা যেতে পারে। অস্ত্রধারী চারজন গার্ডের সঙ্গে হয়তো পেরে ওঠা যাবে না, কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে লিমের ওপর। লোকটাকে মানব-বর্ম বানিয়ে পালাবার একটা চেষ্টা করাই যায়। তবে তাতে সফল হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। লিমের কাছে পৌঁছুবার আগেই ওকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেবে গার্ডরা। একদিক থেকে সেটাও মন্দ নয়। মাটির তলায় তিলে তিলে মরার চেয়ে গুলি খেয়ে ঝটপট মরে যাওয়া ভাল। পরক্ষণে চিন্তাটা বাতিল করে দিল ও। না, এখুনি হার মানা যাবে না। গোপন একটা অস্ত্র রয়েছে ওর কাছে, শত্রুরা তার খবর জানে না। আশা এখনও ফুরিয়ে যায়নি।

রাতের বাতাসে বড় করে শ্বাস নিল রানা, তাকাল লিমের দিকে। লোকটা নিঃসন্দেহে বিকারগ্রস্ত—ছ'বছর বয়সে চোখের সামনে গণহত্যা দেখেছে... নিজের পুরো পরিবারকে খুন হতে দেখেছে... মানসিক বিকার দেখা দেয়াই স্বাভাবিক।

তাই বলে কোনও সহানুভূতি অনুভব করছে না ও। যেভাবে তাসের খেলার মাধ্যমে নৃশংসভাবে হত্যা করছে প্রতিপক্ষকে... যেভাবে নিউ ইয়র্কের কয়েক লক্ষ নিরীহ মানুষকে খুন করতে চলেছে... তাতে কোনও সহানুভূতি দেখানো যায় না। রানার চোখে অ্যাণ্ডি লিম নিজেই একটা রোগবিশেষ—সারা মানবজাতির জন্যে ঘাতক রোগ, ক্যান্সারের মত ধ্বংস করতে চাইছে নিজের চারপাশের সবকিছুকে। এমন রোগের একটাই চিকিৎসা—দেহ থেকে কেটে ফেলে দিতে হবে। যদি কোনোভাবে বেঁচে ফিরতে পারে, লিম নামের এই দুরাত্মাকে কঠোরতম শাস্তি দেবে... মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল রানা।

'আমরা অপেক্ষা করছি, মি. রানা,' তাড়া দিল লিম।

আরেকবার বড় করে শ্বাস নিল রানা, তারপর এগিয়ে গেল বাক্সের দিকে। ভেতরে ঢুকে সটান শুয়ে পড়ল চিৎ হয়ে। দু'জন গার্ড এগিয়ে এল, তুলে ধরল ডালাটা। শেষবারের মত রাতের আকাশ দেখল রানা, আর দেখল দৃষ্টিসীমার কিনারে লিমের উঁকি দিতে থাকা মুখ। এরপরেই ডালাটা বসিয়ে দেয়া হলো বাক্সের ওপর।

অন্ধকারটা যেন ঘুসির মত লাগল চোখে-মুখে। চরম অন্ধকার বুঝি একেই বলে—ঘন, নিকষ, নিশ্ছিদ্র। রক্ত চলাচল দ্রুততর হয়ে গেছে, টের পেল রানা। বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস করে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। জোর করে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখল, নইলে দ্রুত খরচ হয়ে যাবে ভেতরে আটকা পড়া অক্সিজেন। হাত তুলল ও, তালু ঠেকাল ডালার গায়ে—মুখ থেকে ছ'ইঞ্চি উপরে রয়েছে সেটা। এক মুহূর্ত পরেই শোনা গেল হাতুড়ির ঠক ঠক আওয়াজ। পেরেক গেঁথে আটকে দেয়া হচ্ছে ডালা। ক'টা পেরেক গাঁথা হচ্ছে, হিসেব রাখার চেষ্টা করল ও—পরে কাজে লাগবে। ঠক-ঠক-ঠক-ঠক... যন্ত্রচালিতের মত পড়ছে হাতুড়ির বাড়ি। অত্যাচার

চালাচ্ছে কানের পর্দায়। অন্ধকারে চোখ সয়ে এলে ডালার ফাঁক দিয়ে মৃদু আলো দেখতে পেল রানা। সেখানে নড়াচড়া করছে কয়েকটা ছায়ামূর্তি। চোখ মুদে নিজেকে শান্ত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালাল। ভয় পাওয়া চলবে না। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে।

কয়েক মিনিট পর থেমে গেল শব্দের অত্যাচার। হিসেব মিলিয়ে নিল রানা—দশটা পেরেক গাঁথা হয়েছে... দু'পাশে চারটা, আর ওপর-নিচে একটা করে। কত লম্বা পেরেক ব্যবহার করেছে? এটাও গুরুত্বপূর্ণ। বাক্সবন্দি হবার আগে এক নজর দেখা গেলে ভাল হতো।

কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করল। এরপর এক ঝটকায় বাক্সটা উঠে গেল শূন্যে। দোল খেতে শুরু করল। গর্তের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। খানিক পর নামিয়ে দেয়া হলো নিচে। ডালার ফাঁক থেকে অদৃশ্য হলো আলোর আভা। এখন রানা পুরোপুরি অন্ধ। শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে এল ভয়ের একটা শীতল স্রোত। ধুপ করে মৃদু একটা আওয়াজ হলো... স্থির হয়ে গেল বাক্স। গর্তের তলায় পৌঁছে গেছে। বাক্সের ডালায় দু'হাত ঠেকিয়ে ধাক্কা দিল রানা। একচুল নড়ল না সেটা। আবারও নেমে এসেছে নীরবতা। কীভাবে গর্তটা ভরাট করবে ওরা—ডিগার দিয়ে, নাকি হাতে? আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। গভীর মনোযোগে সেটা বোঝার চেষ্টা করল, কিন্তু সহজ হলো না কাজটা। মাথার ভেতরে কেউ যেন চিৎকার জুড়েছে, এ-অবস্থায় কিছু চিন্তা করা মুশকিল।

কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না রানা। শুধু শুনতে পাচ্ছে নিজের হৃৎস্পন্দন... ধমনীগুলোর মাঝ দিয়ে প্রবল বেগে ছুটে চলেছে রক্ত। কিন্তু হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ এত দ্রুত লয়ে কখনও শোনেনি ও। পীড়া দিচ্ছে সেই আওয়াজ, কিন্তু মুক্তি নেই। ফাঁদের ভেতর বন্দি হয়ে আছে ও। চতুর্দিকে রুক্ষ কাঠের দেয়াল। শরীরের প্রতিটা কোষ ওকে উঠে বসতে বলছে,

সবকিছু ভেঙেচুরে ফেলার মিথ্যে তাড়না দিচ্ছে... পাগল করে তুলতে চাইছে ওকে। আতঙ্কটাই ওর সবচেয়ে বড় শত্রু—বুঝতে পারছে রানা। কিছুতেই তার কাছে হার মানা চলবে না। চোখ বুজে ফেলল ও, আত্মসম্মোহনের কায়দায় কথা বলতে শুরু করল নিজের সঙ্গে।

শান্ত হও। ভাল করে ভাবো। তুমি মরবে না। অন্তত আজ নয়... এভাবে নয়। অন্ধকারকে ভয় পেয়ো না, ধরে নাও চোখ মুদেছ বলে আলোর দেখা পাচ্ছ না। স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নাও। কবরে নয়, মনে করো তুমি কোনও জাহাজের বাঙ্কে শুয়ে আছ। প্রথমবার যে-জাহাজে উঠেছিলে, তার কথা মনে আছে? সোহেলও ছিল তোমার সঙ্গে। সাগর অশান্ত হতেই জাহাজের দুলুনিতে দু'জনেই বাঙ্ক থেকে পড়ে গেলে... মনে নেই? ব্যথায় কষ্ট না পেয়ে বরং দু'জনেই গলা মিলিয়ে হেসেছিলে।

কাজ হলো অটো-সাজেশনে। জাহাজের সেই স্মৃতি মনে পড়ে যাওয়ায় এ-অবস্থাতেও ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল হাসির রেখা। বুকের ধুকপুক কমে এসেছে, টের পেল রানা। আত্মনিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে ও। ইন্দ্রিয়গুলো কাজ করছে স্বাভাবিকভাবে।

নতুন শব্দ শুনল ও। ধুপধাপ করে মৃদু আওয়াজ হচ্ছে বাক্সের ডালায়। ওপর থেকে মাটি ফেলা হচ্ছে। ছন্দোবদ্ধ আওয়াজ শুনে বুঝল, বেলচা ব্যবহার করছে ওরা, ডিগার নয়। তা-ই চেয়েছিল ও। ধীরে ধীরে কমে এল শব্দ। ডালার ওপর মাটির স্তর যত পুরু হচ্ছে, ততই ক্ষীণ হচ্ছে আওয়াজ। শেষ পর্যন্ত একেবারে থেমে গেল। রানা বুঝল, পুরোপুরি কবর হয়ে গেছে ওর।

নৈঃশব্দ্য আবার জমাট বাঁধল বাক্সের ভেতরে। যেন ওজন আছে শব্দহীনতার, চেপে বসতে চাইছে রানার সমগ্র অস্তিত্বের ওপর। তাপও বাড়ছে বদ্ধ জায়গাটার ভেতরে।

ঘামতে শুরু করল ও। শরীরের ওপর থেকে তরল ঘাম গড়িয়ে নামছে নিচে। ভেজা ভেজা ঠেকছে পিঠ। জান্তব আতঙ্কটা ফিরে এল আবার। অটো-সাজেশনের মাধ্যমে অদৃশ্য যে-দেয়াল তৈরি করেছিল রানা, তা ভেঙে পড়েছে।

বার বার একটা কথাই মাথায় ঘুরছে—জ্যান্ত কবর দেয়া হয়েছে ওকে... ছোট্ট একটা বাক্সে বন্দি করে। আলো নেই। নড়ার জায়গা নেই। বাতাস নেই।

না! মনে মনে নিজেকে ধমকাল রানা। ভুল ভাবছে। বাক্সটা কফিন আকৃতির। ধরা যাক দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে আশি আর ত্রিশ ইঞ্চি, উচ্চতায় দু'ফুট। হিসেব করা যাক... ভেতরে বত্রিশ বর্গফুট বাতাস থাকার কথা। কিন্তু অর্ধেকটা দখল করে রেখেছে ওর নিজের দেহ। তারমানে বাকি রইল ষোলো বর্গফুট। মিনিটে বারোবার শ্বাস টানছে ও। স্বাভাবিকভাবে একেকবার শ্বাস টানলে মানুষ এক বর্গফুটের ছ'ভাগের এক ভাগ বাতাস টানে। সেই হিসেবে অন্তত নব্বুই মিনিটের বাতাস রয়েছে বাক্সের ভেতর। এর সঙ্গে কার্বন ডায়োক্সাইডের হিসেব করতে হবে। শ্বাস ত্যাগের সময় ষোলো পার্সেন্ট অক্সিজেন আর সাড়ে চার পার্সেন্ট কার্বন ডায়োক্সাইড বের হয় মানবশরীর থেকে। এই হিসেব রানা শিখেছে সাবমেরিনে চড়ার অভিজ্ঞতা থেকে। কার্বন ডায়োক্সাইডটাই আসলে খুন করবে ওকে। ডাক্তারি ভাষায় একে বলা হয় হাইপারক্যাপনিয়া, বা কার্বন ডায়োক্সাইডের বিষক্রিয়া। প্রথমে ঝিমঝিম করবে মাথা, চিন্তা-ভাবনা গুলিয়ে যাবে। এরপর বাড়তে থাকবে রক্তচাপ আর হৃৎস্পন্দন। খিঁচুনি শুরু হবে শরীরে। সবশেষে মৃত্যু।

কিন্তু সময় আছে রানার হাতে, সেটা একঘণ্টার বেশিই হবে। দেড় ঘণ্টাও টিকে যেতে পারে। এর অর্থ, ভুল করেছে লিম। এটাই প্রথম ভুল নয়, নিজেকে অতি-চালাক ভাবতে গিয়ে শুরু থেকেই একের পর এক ভুল করে চলেছে সে।

ডাইনিং রুমে করেছে সে-রকম একটা ভুল। চার গার্ডকে হুকুম দিয়েছিল রানার দিকে শতভাগ মনোযোগ দিতে। কিন্তু তার ফলে যে মিশেলের দিকে কারও নজর থাকবে না, সেটা ভাবেনি। মেয়েটাও বুঝেছে সেটা, রানার সঙ্গে চোখে চোখে কথা হয়েছে তার। রানা তার ছুরি সরাতে পারেনি, কিন্তু মিশেল ঠিকই নিজের ছুরিটা নিয়ে ফেলেছিল তালু আর কবজির আড়ালে। কাঁদতে কাঁদতে রানার দিকে ছুটে আসা, ওকে জড়িয়ে ধরা... সবই ছিল অভিনয়। আর অভিনয়ের ফাঁকে সুকৌশলে রানার প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছে ছুরিটা। এতই আত্মবিশ্বাসী ছিল লিম, রানাকে কবর দেয়ার আগে শরীরতল্লাশি করেনি, তাই পায়নি ওটা। আরেকটা ভুল। পকেটে হাত দিয়ে ছুরিটা এবার বের করে আনল ও।

এই ছুরিটাই রানাকে এতটা সময় সংযত রেখেছে, উন্মাদ হতে দেয়নি। ওটাই ওর আশার প্রদীপ। ছুরিটা যদি ওকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত না-ও করতে পারে, অন্যভাবে সাহায্য করবে। ক্যারোটিভ ধমনীতে ছোট্ট একটা পোঁচ দেবে রানা, মুহূর্তেই অবসান ঘটবে সব যন্ত্রণার। ভয়াবহ মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পারবে ও, বেছে নিতে পারবে সহজ মৃত্যু।

তবে এখুনি সে-পথে পা বাড়াবার ইচ্ছে নেই ওর। হাত বাড়িয়ে বাক্সের দেয়াল ছুঁল রানা, আঙুল দিয়ে হাতড়ে খুঁজে নিল ডালার সংযোগস্থল। ছুরির ডগাটা সেখানে ঠেকিয়ে চাপ দিল ও, অনায়াসে ঢুকে গেল ফলাটা। সত্যিকার কাঠ নয়, কাঠের পাতলা পরত জুড়ে বানানো প্লাইউড দিয়ে তৈরি হয়েছে বাক্সটা। দামে খুব সস্তা, কিন্তু মোটেই টেকসই বা শক্তিশালী নয়। ডালাটা ইতিমধ্যে মাটির ভারের কাছে পরাস্ত হতে চলেছে, বেঁকে গেছে নিচের দিকে। পেরেক মেরে আটকানো হয়েছে ওটা—তা আরেক দুর্বলতা। স্ক্রু দিয়ে আটকালে বরং বেগ পেতে হতো রানাকে। ধীরে ধীরে ছুরিটা ঘোরাতে শুরু করল ও। সাবধান থাকতে হচ্ছে, ফলাটা ভেঙে

গেলে সর্বনাশ। আস্তে আস্তে উঁচু হলো ডালা, পেরেকটা উঠে আসছে দেয়াল থেকে। কপাল ভাল রানার, বেলচা দিয়ে মাটি ফেলা হয়েছে, তাই ঝুরঝুরে। ডিগার ব্যবহার করলে অনেক বেশি জমাট থাকত মাটি, ডালাটা নড়তে পারত না।

প্রথম পেরেকটা আলগা করে দ্বিতীয়টার পেছনে লাগল ও। এবার হাঁটুর কাছাকাছি। বেশ কষ্ট হলো, কারণ হাত নাড়াবার জন্যে যথেষ্ট জায়গা পাচ্ছে না। তারপরেও সময় নিয়ে চেষ্টা করায় পেরেকটা আলগা করে ফেলতে পারল। মুখ বরাবর যেটা রয়েছে, সেটার বেলায় অতটা অসুবিধে হলো না। ডানদিক শেষ করে বামদিকে ব্যস্ত হলো ও। সবশেষে আলগা করল মাথার উপরের পেরেকটা। দশটার মাঝে সাতটা পেরেকই আলগা হয়ে গেল এর ফলে। বাকি রয়েছে কেবল পায়ের কাছে তিনটা—দু'পাশ আর তলায়।

হাঁপিয়ে গেছে রানা। থেমে বিশ্রাম নিল একটু। এর মাঝে কয়েক দফাই আতঙ্কটা ফিরে আসতে চেয়েছে, কিন্তু সুযোগ দেয়নি ও। চোখ মুদে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখল। বাক্সের ডালা অনেকটাই আলগা করে ফেলেছে, কিন্তু বাকিটা করার আগে প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন। ও জানে, ওই ডালাটাই এ-মুহূর্তে বাঁচিয়ে রেখেছে ওকে, নইলে খোলা মাটির তলায় চাপা পড়ে তাৎক্ষণিক মৃত্যু হতো ওর। ডালা সরালে সেটাই ঘটবে। তাই চাই বিকল্প ব্যবস্থা।

প্যান্টে গোঁজা রয়েছে ওর শার্ট, হাত বাড়িয়ে শার্টের তলার অংশ টেনে বের করল রানা। দুটো বোতাম খুলল, তারপর ওটাকে উল্টো করে ওঠাতে থাকল মাথার কাছে। কাজটা কঠিন, বাক্সের ভেতর নড়তেই পারছে না, তাও গোড়ালিতে ভর দিয়ে পিঠ একটু উঁচু করল ও, শার্টকে উঠে আসতে দিল উপরে। পুরোটা উঠে এলে হাতা থেকে হাতদুটো বের করল, এরপর তলার অংশটা গিঁঠ দিয়ে বাঁধল। কলারের বোতাম লাগিয়ে নিয়েছে আগেই, এবার তলার

অংশে গিঁঠ দেয়ায় শার্টটা একটা বেলুনের মত ঘিরে ফেলল ওর মুখকে। এবার ডালা সরানো যেতে পারে; বাক্সের ভেতরে মাটি ঢুকে পড়লেও শার্টের আবরণের কারণে ঢুকবে না ওর নাক বা মুখে। মাটি খুঁড়ে উপরে উঠে যেতে পারবে ও।

সত্যিই কি পারবে? গর্তটা সাত ফুট গভীর, রানার উচ্চতা পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি। তারমানে গর্তের তলায় খাড়া হতে পারলেও উপরে আরও এক ফুটের বেশি অতিক্রম করতে হবে ওকে। কিন্তু চেষ্টা না চালিয়ে উপায় নেই, কাজেই মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করল ও। এরপর পা সোজা করে লাথি দিতে শুরু করল ডালার গায়ে। প্রথমে কিছু ঘটল না, কিন্তু খানিক পরেই ভোঁতা শব্দ তুলে নড়ে উঠল ডালা—উপড়ে ফেলেছে শেষ পেরেকগুলো। ফাঁক পেয়ে ঝরঝর করে বাক্সের ভেতরে ঢুকল কিছু মাটি। থামল না রানা, পা চালাবার মত জায়গা বাড়ায় আরও জোরে লাথি মারতে থাকল, একই সঙ্গে হাত দিয়ে দিচ্ছে ধাক্কা। অনেকটাই সরে গেল ডালা, মাটি এবার তুমুল বেগে ঢুকছে ফাঁকা জায়গাটা ভরাট করে দিতে।

এই মুহূর্তটাই সবচেয়ে জটিল—মাটির ভারে চাপা পড়ার আগে খাড়া হতে হবে রানাকে। এক পাশে কাত হলো ও, সরে যাওয়া ডালার ফাঁকে নিয়ে এল শরীরকে। মাটির স্রোতকে অগ্রাহ্য করে এক হাতে মুঠো করে ধরল ডালার কিনার, ঠেলে ওটাকে সরাল আরেকটু, জায়গা করে নিল পুরো শরীরের জন্যে। এরপর দু'হাতে খামচি মেরে জাগাতে শুরু করল দেহকে।

শুরু হলো যুদ্ধ। ঝুরঝুরে মাটি যেন জীবন্ত কোনও দানব—চেপে বসছে চারদিক থেকে, গিলে নিতে চাইছে ওকে। মুখ-টুখ চাপা পড়ে গেল মুহূর্তে, শার্টটা না থাকলে সঙ্গে সঙ্গে মারা যেত রানা। মাটির সোঁদা গন্ধ পাচ্ছে ও,

অনুভব করছে প্রচণ্ড চাপ... কিন্তু হার মানল না। পানির গভীর থেকে যেভাবে হাত-পা ছুঁড়ে সারফেসে উঠে আসে ডুবুরি, সেভাবে মুঠো মুঠো মাটি দু'হাতে খামচে ধরে উঠে দাঁড়াচ্ছে ও। মাটির চাক গায়ে ভালমত চেপে বসার আগেই সোজা হয়ে দাঁড়াল। পায়ের তলায় বাক্সের মেঝের শক্ত অবলম্বন পেতেই দেহকে ঠেলে দিল উপরে, হাত চালিয়ে মাথার উপরের মাটি সরিয়ে দিচ্ছে একই সঙ্গে।

কয়েক মুহূর্ত পর আতঙ্কিত বোধ করল ও। উঠতে পারছে না আর। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে রেখেছে, দু'হাত খাড়া হয়ে আছে ওপরদিকে, অথচ ভেদ করতে পারছে না সারফেস। এত কষ্ট, এত শ্রম, সব ব্যয় হলো কেবল খাড়া অবস্থায় কবর হওয়ার জন্যে! কিন্তু হার মানতে রাজি নয় রানা, পাগলের মত দু'পা নাড়ল, হঠাৎ স্পর্শ পেল ডালাটার—নড়ে গেলেও বাক্সের ওপর থেকে পুরোপুরি সরে যায়নি ওটা, আটকে আছে। ডালার ওপর একটা পা তুলে দিল ও, সমস্ত শক্তি একত্র করে দেহকে ঠেলে দিল উপরে। ভয় হচ্ছিল, ডালাটা না ভেঙে যায়... কিন্তু বাক্সের ভেতরে মাটি ঢুকে পড়ায় ডালাটা একটা প্ল্যাটফর্মের মত কাজ করল, ওটায় চাপ দিয়ে বাক্সের উচ্চতার প্রায় দু'ফুট দূরত্ব এগিয়ে যেতে পারল ও।

আচমকা রানা অনুভব করল, হাতের সামনে আর কোনও বাধা নেই, বাতাসের স্পর্শ পাচ্ছে ও চামড়ায়। দ্রুত নাড়ল হাতদুটো, মাটির আরেকটু সরিয়ে নিল মাথার ওপর থেকে। এবার শরীর তোলার পালা। ক্ষণিকের জন্যে দুশ্চিন্তা হলো, কবর পাহারার জন্যে লিম কাউকে রেখে দেয়নি তো? কিন্তু ভাববার সময় পেল না, সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে, লাল-নীল ফুটকি দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে। শার্টটা এখন আর রক্ষা করছে না ওকে, বরং মাটির চাপে লেপ্টে গেছে মুখে। এক ফোঁটা বাতাস পাচ্ছে না ফুসফুস। হাতদুটো

দু'পাশের শক্ত মাটিতে রাখল রানা, এরপর টেনে তুলতে শুরু করল নিজেকে। অমানুষিক পরিশ্রম হচ্ছে, হাতের পেশিগুলোয় যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কেউ। তবু থামল না। ইঞ্চি-ইঞ্চি করে শরীরটা উঠে এল উপরে—প্রথমে মাথা, তারপর গলা আর কাঁধ। বুক পর্যন্ত শরীর জাগিয়ে থামল রানা, আর সম্ভব না। টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল শার্টটা। বুক ভরে টেনে নিল তাজা বাতাস। নিস্তেজ হয়ে পড়ে রইল কয়েক মিনিট।

স্বাভাবিক হবার পর আশপাশে চোখ বোলাল ও। না, নেই কেউ। পাহারা দেবার জন্যে কাউকে রেখে যায়নি কোরিয়ান টাইকুন। বিশাল সাদা বাড়িটাও নিস্তব্ধ, কোনও আলো জ্বলছে না। দলবল নিয়ে নিউ ইয়র্কে চলে গেছে সে। তাড়াতাড়ি শরীরের বাকিটুকু কবর থেকে তুলে আনল রানা, এবার খুব বেশি কষ্ট হলো না।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গা থেকে ধুলোমাটি ঝাড়ল ও। পিছন ফিরে তাকাল গর্তটার দিকে, ওটা আবার বুজে যেতে শুরু করেছে। বিশ্বাস করতে পারছে না, উঠে এসেছে ওখান থেকে।

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রানা। তারপর সামনে ফিরল। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে। দৌড়াতে শুরু করল এবার। মিশেলকে খুঁজে বের করতে হবে।

সতেরো

মিশেলকে চাই, মনে মনে ভাবছে রানা। কোনি আইল্যাণ্ডের রেল-ইয়ার্ডের পাশে বড় হয়েছে ও, জায়গাটা ভালমত চেনে। ওখানেই নকল রকেট নিয়ে গেছে লিম। মিশেল সঙ্গে থাকলে সেখানে ঢুকতে সুবিধে হবে। তা ছাড়া, এতকিছুর পর মেয়েটাকে ফেলে যাবার কথা ভাবা যায় না। ও না থাকলে এতক্ষণে মারা যেত রানা। কাজেই মিশেলকে উদ্ধার করা ওর দায়িত্ব। তাতে যত সময় লাগে লাগুক।

কত সময় বাকি রকেট লঞ্চের? হাতের দিকে তাকাতেই রানা দেখল, ঘড়িটা নেই। নিশ্চয়ই কবর থেকে উঠে আসার সময় মাটির ঘষায় খুলে পড়ে গেছে। খুব শখের ঘড়ি ছিল—ট্যাগ হিউয়ার ব্র্যাণ্ডের... ছ'মাসও হয়নি কিনেছে। কিন্তু ঘড়ির জন্যে হা-পিত্যেশ করল না রানা। বুনো একটা ভাব ফুটে উঠেছে চেহারায়, নিচু হয়ে পেরিমিটার ফেন্সের কিনার ধরে দৌড়াচ্ছে, যাতে ক্যামেরায় দেখা না যায়। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লকের দিকে চলেছে—গতকাল থেকে ওখানে বন্দি করে রাখা হয়েছিল ওদেরকে, মিশেলকেও নিশ্চয়ই ওখানেই ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

নোংরা হয়ে আছে রানা—সারা শরীরে কবরের মাটি... ঢুকে গেছে চুলের ভেতরেও। কাপড়ের পরত পেরিয়ে পৌঁছে গেছে চামড়া পর্যন্ত। ঢুকে গেছে নখের ভেতর। নাকে সারাক্ষণ সোঁদা গন্ধ পাচ্ছে ও; গন্ধটা ভুলতে দিচ্ছে না

কবরের ভয়াবহ স্মৃতি। পোশাক ভারী হয়ে গেছে, চলতে-ফিরতে অস্বস্তি লাগছে খুব। কপালের ঘাম মুছল রানা, হাতের উল্টোপিঠ চোখের সামনে আনতেই দেখল কালচে ছোপ ছোপ কাদা। অনুমান করল, হরর ছবির দানবের মত দেখাচ্ছে ওকে।

কিছুদূর এগোতেই বোঝা গেল, কম্পাউণ্ড এখনও আগের মতই সুরক্ষিত। পাহারা দেবার মত যথেষ্ট লোক রেখে গেছে লিম। মেইন এণ্ট্রান্সে গার্ড রয়েছে, ব্যারিয়ারটা নামানো। আঙিনার টহলও চলছে বরাবরের মত। নিজেদের গাড়িটা সিকি মাইল দূরে রেখেছে রানা, তারমানে কম্পাউণ্ড থেকে বেরুতে হলে অন্য গাড়ি চাই। পার্কিং লটের দিকে তাকাল ও, ডজনখানেক গাড়ি রয়েছে ওখানে... তবে গার্ডদের চোখ এড়িয়ে কোনোটা চুরি করা যাবে কি না সন্দেহ। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিঙের কাছাকাছি পৌঁছুতেই একটা গাড়ির ইঞ্জিন জ্যান্ত হয়ে উঠল। ঘাড় ফিরিয়ে রানা দেখল, গেটের দিকে এগিয়ে চলেছে সেটা। ব্যারিয়ারের কাছে গিয়ে থামল। চালক তার আই.ডি. দেখাল গার্ডকে। নিশ্চিত হয়ে তবেই তাকে বেরুতে দিল ওরা। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রানার বুক চিরে। কম্পাউণ্ড থেকে বেরুতে যথেষ্ট ঝক্কি পোহাতে হবে।

পেছনের একটা দরজা খুলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিঙে ঢুকে পড়ল রানা। যেখানে ওকে আটকে রাখা হয়েছিল, সে-জায়গাটা চেনা রয়েছে, তাই দ্রুত পায়ে এগোল করিডোর ধরে। করিডোরের লাইট জ্বলছে, তবে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ চারদিকে সব অফিস... রাতের বেলা অফিস করে না কেউ। হাঁটতে হাঁটতে খোলা একটা দরজার সামনে পৌঁছুল ও, ভেতরে ডেস্কের ওপর একটা টেলিফোন দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি রুমটায় ঢুকে পড়ল, ভেজিয়ে দিল দরজা। ওর বন্ধু এরিক স্টার্নকে ফোন করবে,

সে এফবিআই এজেন্ট... চাইলেই বন্ধ করে দিতে পারবে নিউ ইয়র্কের পুরো সাবওয়ে সিস্টেম। অ্যাণ্ডি লিমের কুপরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে তাতে। কিন্তু রিসিভার কানে ঠেকাতেই মুখ কালো হয়ে গেল রানার। ডেড। ফোনগুলো সেণ্ট্রাল এক্সচেঞ্জ থেকে ডিসকানেক্ট করে রাখা হয়েছে অফিস আওয়ার শেষ হয়ে যাওয়ায়। লিমের সতর্কতার আরেক নমুনা।

করিডোরে বেরিয়ে এল রানা, আবারও এগোতে শুরু করল। খানিক পরেই সামনে থেকে একটা দরজা খোলার শব্দ ভেসে এল। চট করে পাশের একটা কামরায় ঢুকে পড়ল ও। দরজার পাল্লা ফাঁক করে উঁকি দিল বাইরে। মাঝারি উচ্চতার একজন লোককে হেঁটে যেতে দেখল কয়েক সেকেণ্ড পর, কাঁধে একটা স্পোর্টস ব্যাগ ঝুলছে।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল রানা। কোত্থেকে এল লোকটা? আরও কেউ কি আছে? কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না কারও। সন্তর্পণে কামরা থেকে বেরোল ও, নিঃশব্দে এগোল সামনে। ডানদিকের একটা দরজা খোলা, ওখান থেকে বেরিয়েছে লোকটা। কাছে গিয়ে উঁকি দিল—ভেতরে একটা চেঞ্জিং রুম... ডিপোর কর্মচারীদের জন্যে। এখন কেউ নেই। একপাশে সার বেঁধে রয়েছে লকারের সারি। বাকিটায় সিঙ্ক, টয়লেট, আর শাওয়ারের বুথ। র‍্যাকে ভাঁজ করে রাখা তোয়ালে দেখতে পেয়ে লোভী হয়ে উঠল রানা... কিন্তু অতটা সময় কি আছে? চেঞ্জিং রুমের দেয়ালে বড় একটা ঘড়ি ঝুলছে, সেটায় সাড়ে ন'টা বাজে। তারমানে মাত্র দেড় ঘণ্টা পর ওয়ালপ্‌স্ আইল্যাণ্ডের লঞ্চ। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল রানা—গোসল করে নেবে, লকার থেকে চুরি করবে পরিষ্কার পোশাক। পাঁচ-সাত মিনিট হয়তো বেরিয়ে যাবে ওতে, কিন্তু শারীরিক ও মানসিকভাবে ঝরঝরে হতে পারলে সহজ হবে ওর কাজ।

ঝটপট নোংরা পোশাক খুলে দিগম্বর হলো রানা, ঢুকে পড়ল একটা শাওয়ার বুথে। ছেড়ে দিল ঝরনা। তীব্র বেগে বেরিয়ে এল ঈষৎ-উষ্ণ পানি। শরীর থেকে ধুয়ে ফেলতে থাকল মাটি। হাত বাড়িয়ে সাবান নিল ও, ডলে ডলে মাখল পুরো শরীরে। অল্পক্ষণেই পরিষ্কার হয়ে গেল পুরো দেহ, কাদা মেশা পানিও মিলিয়ে গেল পায়ের কাছ থেকে। কবরে যাবার বাহ্যিক সব চিহ্ন মুছে গেল, রয়ে গেল শুধু স্মৃতি। সেটাও মুছে ফেলা গেলে ভাল হতো।

হঠাৎ সচকিত হলো রানা। দরজা খোলার শব্দ—কেউ ঢুকেছে চেঞ্জিং রুমে! তাড়াতাড়ি বুথের প্লাস্টিকের পর্দাটা টেনে দিল, যাতে ওকে দেখা না যায়। তাই বলে নিজের উপস্থিতি লুকানো গেল না, শাওয়ারের পানির আওয়াজ কানে গেছে আগন্তুকের।

'কে ওখানে?' শোনা গেল কণ্ঠ। 'জ্যাক... তুমি?'

চুপ করে রইল রানা। দেখা যাক, জবাব না দিলে চলে যায় কি না। কিন্তু গেল না আগন্তুক।

'কী ব্যাপার, কথা বলছ না কেন?' বোধহয় সন্দেহ হলো লোকটার। পর্দার ওপাশে তার অবয়ব বড় হতে দেখল রানা। এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

'অ্যাই! ভেতরে কে?'

রানা জানে, এখন ওকে কী করতে হবে। চাবি ঘুরিয়ে ঝরনার পানি বন্ধ করল ও, এক ঝটকায় পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এল বুথ থেকে। শরীরের সমস্ত পেশি শক্ত করে ফেলেছে, ঝাঁপ দেবার জন্যে তৈরি। প্রতিপক্ষকে ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে দেবার আগে একটা কারাতে চপ বসাবে কণ্ঠায়। চিৎকার দেবার সময়টুকুও পাবে না লোকটা, শ্বাসনালী ভেঙে যাওয়ায় বাতাসের অভাবে খাবি খাবে... দুই মিনিটেই মারা যাবে। একেবারে টেক্সটবুক অ্যাটাকিং টেকনিক। সেটাই খাটাল রানা। কাঁধের এক ধাক্কায় ব্যালান্স নষ্ট করে দিল

আগন্তুকের, কিন্তু গলায় চপ বসানোর আগে কী যেন হয়ে গেল ভেতরে... কাকে হত্যা করতে চলেছে, তা দেখে নেবার তাগিদ অনুভব করল অন্তরে।

মাঝপথে থেমে গেল রানার হাত, মরতে চলা মানুষটার মুখের ওপর স্থির হলো ওর দৃষ্টি। অল্পবয়েসী এক তরুণ... মাথায় সোনালি চুল, আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে আছে চোখদুটো। পরনে শর্টস, কাঁধের তোয়ালে লুটাচ্ছে মেঝেতে—ঘুমাতে যাবার আগে গোসল করতে এসেছে। ছেলেটাকে চেনে রানা। এ সেই মেকানিক্যাল ডিগারের অপারেটর—ঘণ্টাখানেক আগে এই ছেলেই ওর জন্যে কবর খুঁড়েছিল। যারা রানাকে মাটির তলায় জ্যান্ত অবস্থায় পুঁতে ফেলেছিল, ছেলেটা তাদের একজন।

'প্লিজ, আমাকে মারবেন না!' খসখসে গলায় বলল তরুণ। চিৎকারের চেষ্টা করছে না। দু'হাত মাথার উপরে তুলল, আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে। 'দয়া করুন!'

ছেলেটার আচরণে এক ধরনের সরলতা রয়েছে। কী যেন ভাবল রানা, তারপর ছেড়ে দিল তাকে। উঠে দাঁড়িয়ে তোয়ালেটা কুড়িয়ে নিল, পেঁচাল কোমরে। ততক্ষণে ছেলেটাও উঠে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু পালাবার চেষ্টা করল না, কিংবা কাউকে ডাকল না।

'আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি,' থমথমে গলায় বলল রানা। চোখে শীতল আগুন। 'তুমি আজ ওদের সঙ্গে ছিলে। সেজন্যে এখুনি তোমাকে খুন করা উচিত আমার! কেন করব না বলতে পারো?'

'ঈশ্বরের কিরে, আমি ওদের দলের নই। আমি শুধু হুকুম পালন করি।' কাঁপা কাঁপা হাতে পকেট হাতড়ে একটা সিকিউরিটি পাস বের করল তরুণ। দেখতে দিল রানাকে। 'এই দেখুন, আমি সামান্য এক ইকুইপমেন্ট অপারেটর... গার্ডদের কেউ নই। আমার নাম টমি... টমি ফিশার। কুইন্সে

বাড়ি। ঘরে আমার অসুস্থ মা আর ছোট ছোট দুটো বোন আছে...'

'তুমি আমাকে জ্যান্ত কবর দিয়েছিলে!'

'না, স্যর, আমি কিছু করিনি! বিশ্বাস করুন! আমাকে শুধু একটা গর্ত খুঁড়তে বলা হয়েছিল। আমি তা-ই করেছি।'

'মিথ্যে বোলো না!' চাপা গলায় ধমকে উঠল রানা। হাত ওঠাল আঘাত হানার জন্যে। 'তুমি দেখোনি, ওরা কী করছে?'

কুঁকড়ে গেল টমি। 'হ্যাঁ, দেখেছি। আজই প্রথম নয়, আগেও অনেক ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটাতে দেখেছি ওদেরকে। কিন্তু কী করার ছিল আমার, বলুন? আমি তো একা মানুষ। এখানে এসেছি স্রেফ পেটের দায়ে। বছরখানেক আগে চুরি করে ধরা পড়েছিলাম, জেল খাটতে হয়েছিল ছ'মাস। এরপর থেকে কেউ আমাকে কোনও চাকরি দেয় না। অথচ মায়ের চিকিৎসার জন্যে... বোনদের লেখাপড়া চালাবার জন্যে টাকা চাই। এখানে আসতেই ওরা মোটা মাইনে দিয়ে রেখে দিল আমাকে। তখন তো আর জানতাম না ভেতরে ভেতরে কী চলছে। যখন জানলাম, অনেক দেরি হয়ে গেছে। ওদের কথামত কাজ না করে উপায় নেই। পারলে চাকরি ছেড়ে চলে যেতাম, কিন্তু সেটা অসম্ভব। ওরা কাউকে যেতে দেয় না। বাড়াবাড়ি করলে চাকরির বদলে দুনিয়া ছাড়তে বাধ্য করে। আমি আটকা পড়ে গেছি!' চোখ ছলছল করছে ছেলেটার। 'বিশ্বাস করুন, আপনার অবস্থা দেখে খারাপ লেগেছে আমার... বমি পেয়েছে... কিন্তু কিচ্ছু করার ছিল না।'

হাত নামিয়ে নিল রানা। কিন্তু চেহারার ক্রুদ্ধ ভাব বদলাল না। 'তুমি এখানেই থাকো?'

মাথা ঝাঁকাল টমি। 'উইক-এণ্ড বাদে বাকি দিনগুলোয়। আমাকে একটা কামরা দেয়া হয়েছে।'

'মেয়েটা কোথায়?'

'কোন্ মেয়ে?'

'ভান কোরো না! তুমি নিশ্চয়ই জানো! আমার সঙ্গেই ধরা পড়েছিল ও।'

ধমক খেয়ে মিইয়ে গেল টমি। নিচু গলায় বলল, 'করিডোরের শেষ প্রান্তে গিয়ে বাঁয়ে মোড় নেবেন। বড় একটা দরজা পেরুলে স্টোরেজ এরিয়া। ওখানকার শেষ স্টোররুমটায় রাখা হয়েছে ওকে, হাতের ডানে। আমাদের ওখানে যাওয়া নিষেধ।'

'পাহারা আছে?'

মাথা নাড়ল টমি। 'মনে হয় না। তালাও বোধহয় লাগানো হয়নি। দরজাগুলোর বাইরে বড় ছিটকিনি আছে, সেগুলোই টেনে দেয়া হয়েছে। খুলতে অসুবিধে হবে না আপনার।'

'কাপড় দরকার আমার।'

রানাকে আপাদমস্তক দেখল টমি। দু'জনের সাইজ প্রায় কাছাকাছি। বলল, 'আমারগুলোতে চলবে বোধহয়। আমার লকারে বাড়তি এক সেট পোশাক আছে। এই নিন চাবি। আমার সিকিউরিটি পাসটাও নিয়ে যেতে পারেন। কাউকে কিছু বলব না। যদি ধরা পড়ে যাই, বলব আমি যখন শাওয়ারে ছিলাম, তখন ওগুলো চুরি হয়ে গেছে। প্লিজ, আমাকে ছেড়ে দিন। আমার মা খুব অসুস্থ। বোনদুটোর বয়স দশ আর বারো। আমি ছাড়া আর কেউ নেই ওদের...'

'তোমার লকার নাম্বার কত?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল রানা।

'চৌষট্টি। শার্ট আর প্যান্ট পাবেন ওখানে। কিছু টাকাও আছে। সব নিয়ে নিন। আমি কাউকে কিছু বলব না।'

রানা জানে, একে খুন করাই উচিত। মুখ বন্ধ করার জন্যে সেটাই সবচেয়ে নিশ্চিত কায়দা। প্রাণের মায়ায় এখন হয়তো নানা রকম প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে ছেলেটা, কিন্তু রানা চলে

যাওয়ামাত্র ভয়ডর কেটে যাবে তার। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার কোনও তাগিদ থাকবে না। অথচ অসুস্থ মা-বোনের কথা বলে রানাকে দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে সে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। পরিস্থিতির খাতিরে এই টমি ফিশারের মত শত্রুপক্ষের বহু অনুচর আর সহচরকে অতীতে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে রানা... তাদেরও কি পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান ছিল না? তাদেরও কি দায়িত্ব ছিল না পরিবারের প্রতি? নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সেসব কোনোদিন জানতে পারেনি ও, তাই ওদের জীবন নিতে দ্বিধা করেনি... কখনও অপরাধবোধেও ভোগেনি। কিন্তু টমি সব ওলটপালট করে দিয়েছে। বিবেকের দংশন অনুভব করবে ও একে হত্যা করলে।

মনকে শক্ত করার চেষ্টা করেও পারল না রানা। টমিকে ছেড়ে দেয়া মানে বাড়তি বিপদ মাথায় নেয়া। তা ছাড়া ওকে জ্যান্ত কবর দেয়ার পেছনে এই ছেলেরও যে ভূমিকা ছিল, তা তো মিথ্যে নয়। তবু ঝুঁকিটা নেয়ারই সিদ্ধান্ত নিল ও।

'দেখো, তুমি শত্রুপক্ষের লোক। এই মুহূর্তে তোমাকে খুন করা উচিত আমার। কিন্তু তোমার মায়ের অসুখের কথা শুনে ছেড়ে দিচ্ছি... বেইমানি কোরো না,' বলেই হালকা এক আঘাতে চিত করে মেঝেতে ফেলে দিল ছেলেটাকে। পরীক্ষা করে দেখল জ্ঞান হারিয়েছে।

ওকে টেনে বাথরুমে ঢুকিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল রানা লকারগুলোর দিকে, খুঁজে নিল চৌষট্টি নম্বর। লকার খুলে বের করল শার্ট-প্যান্ট, দ্রুত হাতে পরে ফেলল সেগুলো। বাতি নিভিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল চেঞ্জিং রুম থেকে।

টমির কথা অনুযায়ীই স্টোরেজ এরিয়াটা পাওয়া গেল। পরিচিত জায়গা। এখানে রানাকেও বন্দি করে রাখা হয়েছিল। মিশেলকে যে-কামরায় রাখা হয়েছে, সেটা রানার দরজার উল্টোপাশে। তালা দেয়া নেই। ছিটকিনি খুলে ভেতরে পা রাখল রানা, পরক্ষণে পাশ থেকে একটা চেয়ার

ছুটে এল।

ঝট বসে পড়ল রানা, ফাঁকি দিল আঘাতটাকে। দরজার গায়ে সশব্দে বাড়ি খেল চেয়ার, খসে পড়ল নিচে। শোনা গেল মিশেলের গলা।

'মাই গড, রানা! তুমি?'

উঠে দাঁড়াল রানা। ভালমত সিধে হবার আগেই ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল মিশেল। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুমি বেঁচে আছ!'

সাবধানে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা। দেখল মেয়েটাকে। আগের কালশিটের পাশে নতুন আরেকটা দাগ ফুটে উঠেছে মিশেলের গালে।

'তোমার কিছু হয়নি তো?' নরম গলায় জিজ্ঞেস করল ও।

গালে আঙুল বোলাল মিশেল। 'ও কিছু না। তোমাকে ডাইনিং রুম থেকে বের করে নিয়ে যেতেই পাগলামি শুরু করেছিলাম। টেবিল থেকে ছুঁড়ে ফেলেছিলাম গ্লাস, প্লেট আর কাটলারিজ। আমাকে থামাবার জন্যে গায়ে হাত তুলেছে গার্ডেরা।' হাসল ও। 'আমি তাতে কিছু মনে করিনি। গোলমাল তো ইচ্ছে করে পাকিয়েছি, ওরা যাতে ছুরি খোয়া যাবার ব্যাপারটা টের না পায়।'

'দারুণ দেখিয়েছ তো,' প্রশংসা করল রানা। 'আমার তরফ থেকে একটা পুরস্কার পাওনা হয়েছে তোমার। তুমি যদি ছুরিটা না দিতে, এখন আমাকে এখানে দেখতে পেতে না।'

'কেন? সত্যি সত্যি কবর দিয়েছিল নাকি? না, থাক, বোলো না। আমি শুনতে চাই না। তা ছাড়া হাতে সময়ও নেই। তাড়াতাড়ি পালাতে হবে এখান থেকে। লঞ্চের সময় ঘনিয়ে এসেছে।'

টমির চাবির গোছা আর সিকিউরিটি পাস দেখাল রানা। 'এগুলো কাজে লাগবে। চলো, বেরিয়ে পড়ি। ভাল কথা,

এখান থেকে কোনি আইল্যাণ্ডের রেল-ইয়ার্ডে যেতে কতক্ষণ লাগবে?'

'আধঘণ্টার বেশি নয়।'

'তোমার লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে?' মনে মনে একটা প্ল্যান খাড়া করে ফেলেছে রানা। লিমকে ঠেকানোর সবচেয়ে কার্যকর কায়দা হলো, কোনও একটা পাওয়ার স্টেশনে গিয়ে পুরো সাবওয়ে সিস্টেমের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া। ট্রেন যদি না নড়ে, লিমের পুরো পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে। কথা হলো, কাজটা করার মত সময় আছে কি না। বড় জোর এক ঘণ্টা বাকি রকেট লঞ্চের; এর মাঝে এফবিআই বা ট্রেজারি ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে যোগাযোগ করা, তাদেরকে লিমের পরিকল্পনা জানানো, পাল্টা ব্যবস্থা নেয়া... দেখা যাবে কিছু করার আগেই সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে। লিমের ট্রেন ইতিমধ্যেই রওনা হয়ে গেছে কি না কে জানে।

'আমার সঙ্গীসাথীরা সবাই ওয়াশিংটনে, রানা,' মিশেল বলল। 'খবর দিলেও সময়মত পৌঁছুতে পারবে না। রাতের বেলা কাউকে পাওয়াও মুশকিল।'

এফবিআইয়ের এরিক স্টার্নের বেলাতেও একই কথা খাটে। লোকাল অফিসের মাধ্যমে লোক পাঠাতে তারও সময় লাগবে।

'তারমানে যা করার আমাদেরকেই করতে হবে,' বলল রানা। 'চলো।'

ইঞ্জিনের ভারী গর্জনে সচকিত হলো কম্পাউণ্ডের রক্ষীরা। শব্দের উৎসের দিকে চোখ ফেরাতেই হেভি ইকুইপমেণ্টের শেড থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল কালচে একটা আকৃতিকে। গাড়ি নয়, একটা বিশাল মেকানিক্যাল ডিগার... আঙিনার মাঝ দিয়ে ছুটছে সীমানার দিকে। চেঁচিয়ে উঠল

গার্ডরা, ছুটল ডিগারটাকে লক্ষ্য করে। কেউ কেউ বন্দুক তুলল, গুলি ছুঁড়ল ওটাকে লক্ষ্য করে।

ডিগারের ড্রাইভিং ক্যাবে বসে আছে রানা, চালাচ্ছে ওটাকে। ঠক ঠক করে রিয়ার-এণ্ডে বুলেট বিঁধতেই কুঁজো হয়ে গেল। পাশে বসা মিশেলকে বলল, 'নিচু হও। ওরা গুলি করছে।'

'স্মল আর্মসের গুলি ঢুকবে না ক্যাবে,' বলল মিশেল। 'ডিগারের বডি যথেষ্ট পুরু।'

'তাও ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। কাঁচ ভেঙেও ঢুকতে পারে বুলেট। নিচু হও।'

কথামত কুঁজো হয়ে গেল মিশেল। বলল, 'একটা পিস্তল থাকলেও কাজ হতো। পাল্টা জবাব দেয়া যেত ওদের।'

'তার প্রয়োজন নেই। কয়েক মিনিট টিকে থাকতে পারলেই হয়।'

আশাবাদী হবার কারণ আছে। ডিগারের ভারী শরীর বর্মের মত রক্ষা করছে ওদের। অবিশ্রাম গুলি চালিয়েও অতিকায় যন্ত্রদানবের কোনও ক্ষতি করতে পারছে না গার্ডরা। এক বিন্দু গতি না কমিয়ে ওটা ছুটে চলেছে পেরিমিটার ফেন্সের দিকে।

লিভার টানল রানা, ডিগারের বাকেট নামিয়ে আনল নিচে, মাটি থেকে এক ফুট উঁচুতে। ফেন্স আর মাত্র ত্রিশ গজ দূরে। হঠাৎ কেশে উঠল ইঞ্জিন, অবশেষে হাউসিঙের ভেতর একটা বুলেট পাঠাতে পেরেছে একজন ভাগ্যবান গার্ড। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। বাকেটকে সামনে অস্ত্রের মত বাগিয়ে ফেন্সের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ডিগার। ইস্পাতের সঙ্গে লোহার তারের ঘষায় বিশ্রী শব্দ উঠল, ক্ষণিকের জন্যে একটু ঝাঁকি খেল যন্ত্রদানব, তারপরেই বেড়া ছিঁড়ে-খুঁড়ে বেরিয়ে গেল। টান খেয়ে মাটি থেকে উপড়ে এল বেশ কয়েকটা পিলার।

তবে বেশিদূর এগোনো গেল না ডিগার নিয়ে। ইঞ্জিনটা মরণ-আর্তনাদ ছাড়ছে। গুলিতে নাজুক কোনও অংশ গুঁড়িয়ে গেছে ওটার।

রানা চেঁচাল, 'গেট রেডি! দৌড়াতে হতে পারে আমাদের!'

আরেকটু সামনে বাড়ল ডিগার। ধোঁয়া বের হতে শুরু করেছে ইঞ্জিনের ভেতর থেকে।

'কাম অন্! ডোবাস্নে, ভাই!'

কথাটা শুনেই যেন গতি একটু বাড়াল ডিগার, পঞ্চাশ গজ দূরের গাছপালার সারি লক্ষ্য করে গা-ঝাড়া দিয়ে আগে বাড়ল। পিছন থেকে ছুটে আসছে অস্ত্রধারী গার্ডেরা। যতটা পারল ওটাকে নিয়ে এগিয়ে গেল, কিন্তু গাছপালার দশ গজের মধ্যে পৌঁছুতেই বুঝল, আর যাওয়া যাবে না। ব্রেক কষে বাহনটা থামাল ও, খুলে ফেলল ক্যাবের দরজা।

'লেট'স্ গো!' মিশেলের উদ্দেশে চেঁচাল ও।

দু'পাশের দরজা দিয়ে একসঙ্গে লাফিয়ে নামল ওরা। দৌড়াতে শুরু করল। পিছন থেকে ছুটে এল গুলি। তবে অন্ধকারে ওদেরকে ঠিকমত দেখতে পাচ্ছে না গার্ডেরা, নিশানা করতে পারছে না। বুলেটগুলো চলে গেল আশপাশ দিয়ে। নিরাপদেই গাছপালায় ভরা জঙ্গলে ঢুকে পড়ল রানা আর মিশেল।

ঠিক সেই সময় চেঞ্জিং রুমের শাওয়ার বুথে চোখ মেলল টমি ফিশার। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল সে, বুঝতে চাইছে বেঁচে আছে না মরে গেছে। ঘাড়ের টনটনে ব্যথাটা অনুভব করতেই আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। পর্দা সরিয়ে টলমল পায়ে বেরিয়ে এল বাইরে। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

গলার একপাশ ফুলে রয়েছে তার, কালশিরে পড়তে শুরু করেছে। কষ্ট হচ্ছে ঢোক গিলতে। কিন্তু বেঁচে আছে সে!

অবিশ্বাস্য ঠেকল ব্যাপারটা।

বিড় বিড় করে ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাল টমি। বেঁচে থাকার আনন্দে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল সে। ওই ভয়ঙ্কর লোকটা দয়া করেছে ওকে, ওর মায়ের অসুখের কথা শুনে।

গাছপালার মাঝ দিয়ে ছুটতে ছুটতে রানাও টমির কথা ভাবছে। এতক্ষণে জ্ঞান ফিরে আসার কথা তার। ঘুষিটা সর্বশক্তিতে মারেনি ও। পরিস্থিতির শিকার তরুণ ছেলেটিকে হত্যা করতে সায় পায়নি বিবেকের... চায়নি তার পরিবারকে পথে বসাতে।

ভুল করেছে ও? অপ্রয়োজনীয় করুণা দেখিয়েছে? কে জানে! এসপিয়োনাজের নির্মম জগতে দীর্ঘকাল কাটাবার পরেও মানবতা রয়ে গেছে ওর মধ্যে। কারও প্রাণ নিতে আজও ও সায় পায় না মনের। দয়া আর ক্ষমার গুণদুটো ত্যাগ করতে পারেনি পুরোপুরি।

কী লাভ হতো টমিকে খুন করে? হয়তো কিছুটা সময়ের জন্যে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত হতো; ওকে যারা জীবন্ত দাফন করেছিল, তাদের ওপর প্রতিশোধ নেবার আকাঙ্ক্ষার অংশবিশেষ মিটত... কিন্তু তা কি একজন অসুস্থ মা আর অসহায় দুটো বাচ্চা মেয়ের ভবিষ্যতের চেয়ে বড়?

এখানেই অ্যাণ্ডি লিমের সঙ্গে রানার তফাৎ। নো গান রি-র গণহত্যার অভিজ্ঞতা লিমের মনুষ্যত্ব কেড়ে নিয়েছে, তাকে পিশাচ বানিয়েছে। করেছে প্রতিশোধের নেশায় উন্মাদ। কিন্তু ঘণ্টাখানেক আগেকার জ্যান্ত কবর, কিংবা অতীতের অসংখ্য নিকটমৃত্যুর অভিজ্ঞতা রানাকে তেমনটা করতে পারেনি। এখনও ও মানুষের সুখে সুখী আর দুঃখে দুখি হতে জানে। এখানেই ওদের পার্থক্য... এ-কারণেই এটা শুভ আর অশুভের লড়াই। সে-লড়াইয়ে জিততে হবে রানাকে—নিজের জন্যে... সারা পৃথিবীর ভালমানুষদের জন্যে।

আঠারো

লিমের কনস্ট্রাকশন ডিপোর মত রেল-ইয়ার্ডের ফেন্সটাও চেইন-লিঙ্কের তৈরি, উপরে রয়েছে কাঁটাতারের কুণ্ডলী। যতদূর চোখ যায়, ডানে-বাঁয়ে চলে গেছে, তারপর মিশে গেছে অন্ধকারে। শহরের আগ্রাসী বিস্তারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন। বেড়ার একপাশে মানুষের আনাগোনায় মুখর বাড়িঘর, দোকানপাট আর রাস্তা; অন্যপাশে প্রাণহীন নুড়ি বিছানো জমি, উঁচু ধাতব পোল, নানা ধরনের তার, তেলের ব্যারেলের স্তূপ, আর টিনের ছাউনি দেয়া বড় বড় শেড ও ওয়্যারহাউস। আর আছে রেললাইন... অসংখ্য দীর্ঘ রেললাইন—এঁকে-বেঁকে অতিক্রম করেছে পরস্পরকে, যেন রেললাইনের জাল বিছিয়ে রাখা হয়েছে মাটির ওপর। ম্যানহাটনের ঠিক পাশে এমন খোলা একটা জায়গা দেখে অবাক হতে হয়। বেড়ার ওপাশে সুউচ্চ বিল্ডিংগুলোয় ছোট ছোট অ্যাপার্টমেন্টে গাদাগাদি করে বাস করে মানুষ, হাঁসফাঁস করে মুক্ত বাতাসের জন্যে। অথচ এপাশে কয়েক হাজার একর জুড়ে উন্মুক্ত বিশাল এক ইয়ার্ড। বাংলাদেশ হলে দখল হয়ে যেত এতদিনে, মনে মনে ভাবল রানা—ইয়ার্ড বন্ধ করে সেখানে গড়ে তোলা হতো বড় বড় মার্কেট, অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, বা নিদেনপক্ষে বস্তি। সরকারি জমি ভোগদখলে আমাদের সুবিধাবাদীরা সিদ্ধহস্ত।

ফেন্সের পাশে নির্জন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ও

আর মিশেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে মেয়েটা—ছোটবেলায় দেখা বেড়ার ফাঁকটা আজও আছে দেখে। ঝালাইয়ের দাগ থেকে বোঝা যাচ্ছে, মাঝের বছরগুলোয় কয়েক দফা মেরামত করা হয়েছিল বেড়াটা, কিন্তু দুষ্টু ছেলেরা আবার কেটে ফেলেছে। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ সম্ভবত তিতিবিরক্ত হয়ে ছেড়ে দিয়েছে মেরামতের কাজ। বাচ্চারা বেড়া গলে ভেতরে ঢুকে খেলাধুলা করে—ব্যাপারটাকে বোধহয় নিরাপত্তার জন্যে বড় কোনও হুমকি বলে ভাবা হয়নি।

ফাঁক গলে ইয়ার্ডে ঢুকে পড়ল ওরা। একটু কষ্ট হলো, কারণ ওটা বাচ্চাদের ঢোকার উপযোগী, বড়দের নয়। মিশেল মোটামুটি সহজে ঢুকতে পারলেও তারের খোঁচায় শার্টের পিঠ ফুটো হয়ে গেল রানার, আঁচড় পড়ল হাতের চামড়ায়। তবে সেগুলো বড় কিছু নয়। ভেতরে ঢুকে সোজা হয়ে দাঁড়াল ও। দেখে নিল আশপাশ। সবচেয়ে কাছের বিল্ডিংগুলো দু'শো গজ দূরে—ইঁট আর ঢেউটিনের সমন্বয়ে গড়া এক সারি ওয়ার্কশপ... উঁচু, চারকোনা; সবগুলোর ভেতরে ঢুকেছে রেললাইন। বাইরে জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই। হঠাৎ একটা হেডলাইটের আলো দেখা গেল। তাড়াতাড়ি ছায়াতে শরীর মিশিয়ে দিল রানা ও মিশেল।

কাছে আসতেই চেনা গেল বাহনটা। অত্যাধুনিক মডেলের একটা ট্রায়াম্ফ থাণ্ডারবার্ড মোটরসাইকেল... যে-কোনও মোটরসাইকেল-প্রেমীর স্বপ্ন। গায়ের রঙ কুচকুচে কালো, পনেরোশো সাতানব্বুই সি.সি.-র শক্তিশালী ইঞ্জিন চাপা হুঙ্কার ছাড়ছে। শক্তি, গতি আর সৌন্দর্যের এক অপূর্ব প্রদর্শনী। লম্বা-চওড়া গড়নের এক লোক চালাচ্ছে সেটা, ওয়ার্কশপগুলোর কাছে গিয়ে ব্রেক কষল। ইঞ্জিন বন্ধ করে নেমে পড়ল সে, মোটরসাইকেলটাকে সাইড স্ট্যাণ্ডে দাঁড় করিয়ে হাঁটতে শুরু করল। একটু পরেই একটা ওয়ার্কশপের সাইড ডোর খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। রেলকর্মী, নাকি

লিমের দলের লোক? বোঝা গেল না।

'ওদিকের শেডগুলো সব প্রাইভেট কণ্ট্রাকটরদের,' ফিসফিস করে বলল মিশেল। 'এত রাতে কারও থাকার কথা নয় ওখানে। যাকেই পাওয়া যাবে, ধরে নিতে হবে লিমের হয়ে কাজ করছে।'

'আমি দেখে আসছি,' বলল রানা। 'তুমি বাইরে থাকো। দেখো, কোথাও থেকে ফোন করা যায় কি না।'

'আমি তোমাকে একা ছাড়ছি না।'

'তর্ক করার সময় নেই, মিশেল। যথেষ্ট সাহায্য করেছ তুমি। তোমার সাহায্য না পেলে এতদূর আসতে পারতাম না। কিন্তু এবার আমার পালা। লিমের ট্রেনটাকে থামাব আমি।'

'কীভাবে? একটা পিস্তলও নেই তোমার কাছে।'

'উপায় একটা বেরিয়ে যাবে, চিন্তা কোরো না। তারপরেও যদি ব্যর্থ হই, তোমার দায়িত্ব হবে ট্রেজারি ডিপার্টমেণ্ট বা এফবিআইয়ের সঙ্গে কথা বলে পুরো সাবওয়ে সিস্টেম বন্ধ করে দেয়া। সাবস্টেশনগুলো কোথায়, বলতে পারো? ফিফটি-নাইন্থ স্ট্রিটে, নাকি লং আইল্যাণ্ডে?'

'রানা... অনেক দেরি হয়ে গেছে। এক ঘণ্টাও বাকি নেই রকেট লঞ্চের।'

মিশেলের কথা কানে তুলল না রানা। 'যাও, ফোন খুঁজে বের করো। কথা বলো তোমার অফিসে।'

সঙ্গিনীকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ছায়া থেকে বেরিয়ে এল ও। দৌড়াতে শুরু করল রেললাইনের পাশ ধরে। মোটরসাইকেলের চালক যে-ওয়ার্কশপে ঢুকেছে, সেটার দিকে এগোচ্ছে। ট্র্যাকগুলো ওয়ার্কশপের একদিক দিয়ে ঢুকে আরেকদিক দিয়ে বেরিয়েছে... ওদিক দিয়েই মিলেছে সাবওয়ের মূল লাইনের সঙ্গে। এপাশে কোনও পাহারা নেই। মোবাইলে এতক্ষণে রানা-মিশেলের পালাবার

খবর পেয়ে গেছে লিম নিঃসন্দেহে, কিন্তু ওরা যে রেল-ইয়ার্ডে এসে ওকে থামাবার চেষ্টা করতে পারে, সেটা বোধহয় ভাবেনি। তাড়াতাড়ি লোডিং সেরে রওনা হবার চেষ্টা করছে। সেজন্যেই পিছনদিকে লোক রাখা হয়নি, সবাইকে সামনে নিয়োজিত করেছে।

একটু পরেই ওয়ার্কশপের পাশে পৌঁছে গেল রানা। বড় বড় কয়েকটা জানালা আছে, তবে সেগুলো নাগালের বাইরে। ভেতরে উঁকি দেয়া গেল না। নিচের দরজা দিয়ে ঢোকার সাহস পেল না রানা, ওপাশে কেউ অস্ত্রহাতে বসে আছে কি না কে জানে। লোহার একটা সিঁড়ির দিকে নজর গেল ওর, বিল্ডিঙের বাইরের দিকের একটা ব্যালকনিতে উঠে গেছে ওটা। দেয়ালে শরীর মিশিয়ে ওটার দিকে এগিয়ে গেল রানা, খানিক পরে সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল ব্যালকনিতে।

একটা দরজা দেখা গেল ব্যালকনির পেছনের দেয়ালে। তালা দেয়া। তবে জং ধরে নষ্ট হয়ে গেছে ওটা। কাঁধের ধাক্কায় দরজা ভেঙে ঢোকা যাবে ভেতরে। ঝুঁকিটা নেবে বলে ঠিক করল ও। ওয়ার্কশপের ভেতর থেকে ভেসে আসছে নানা ধরনের আওয়াজ... দরজা ভাঙার শব্দ চাপা পড়ে যাবে তাতে। ভেতরে ঢোকার আগে পেছনে একবার তাকাল রানা। মিশেলকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। মনে মনে আশা করল, ওর নির্দেশ মেনে নিয়েছে মেয়েটা—ফোন করতে গেছে।

একটু পিছিয়ে গিয়ে দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। ওর ধারণাই ঠিক, কাঁধের চাপে মট করে ভেঙে গেল জং ধরা তালা, সটান খুলে গেল পাল্লা। সঙ্গে সঙ্গে কানে ভেসে এল বিচিত্র এক সঙ্গীত—ধাতুর সঙ্গে ধাতুর ঘর্ষণ, মানুষের হাঁকডাক, আর ইলেকট্রিক মোটরের গুঞ্জন... মিলেমিশে যেন এক সুর তৈরি করেছে। এই আওয়াজের মাঝে কারও পক্ষেই দরজা ভাঙার শব্দ শোনা সম্ভব নয়। নিঃশব্দে চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরের ব্যালকনিতে পা রাখল ও। নিচে তাকাতেই দেখতে

পেল অ্যাণ্ডি লিমকে।

ছোটখাট একটা জটলা ঘিরে রেখেছে কোরিয়ান টাইকুনকে। লোকগুলোর পরনে রেলওয়ের ইউনিফর্ম, সবাই কোরিয়ান। ভেতরটা বিশাল একটা হ্যাঙারের মত, সমান্তরালভাবে অনেকগুলো রেললাইন চলে গেছে এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত। দলের লোকজনের উদ্দেশে চূড়ান্ত আদেশ-নির্দেশ দিচ্ছে লিম, তাদের মাথার ওপর জ্বলছে অনেকগুলো নিয়ন বাতি। কেমন যেন অপার্থিব, অশুভ দেখাচ্ছে সবাইকে, প্রত্যেকের পায়ের নিচে পড়েছে অন্তত পাঁচটা করে ছায়া। লোকগুলো সশস্ত্র। লিমের কথা শুনতে পাচ্ছে না রানা, ওদের থেকে প্রায় একশো গজ দূরে রয়েছে ও। মাঝখানটায় ছাতের অসংখ্য আঁকা-বাঁকা স্টিলের বিম, সেখান থেকে ঝুলছে সরু-মোটা শেকল আর ইলেকট্রিকের ওয়ায়্যার। উপরে তাকালেও ভাঙা দরজাটা দেখতে পাবে না কেউ।

সঙ্গীদের উদ্দেশে কয়েক মিনিট ভাষণ দিল লিম, এরপর দল বেঁধে সবাই হাঁটতে শুরু করল ট্রেনের দিকে। বগিগুলো আর-৬৮ মডেলের। আশির দশকের শেষভাগে তৈরি। ধাতব রূপালি শরীর ঝলমল করছে স্বল্প আলোয়। প্রয়োজনীয় মডিফিকেশন করে নিয়েছে লিম, তার ফলে ওগুলোর দিকে তাকালে সম্ভ্রম জাগে না... জাগে আতঙ্ক। মৃত্যুর রেলগাড়ি বলা চলে অনায়াসে। নিউ ইয়র্কের সাবওয়েতে এমন ট্রেন আগে কোনোদিন চলেনি, কোনোদিন চলবেও না।

একদম সামনে রয়েছে ড্রাইভার'স্ ক্যাব। মাঝবয়েসী এক কোরিয়ান ড্রাইভার উঠল ওতে, তার পিছু পিছু লিম। খুনে টাইকুন নিজেও চলেছে অপারেশনে। অন্য কারও হাতে দায়িত্ব দিতে হয়তো ভরসা পাচ্ছে না। ড্রাইভার'স্ ক্যাবের পেছনে রয়েছে একটা ফ্ল্যাটবেড কার—দেখতে অনেকটা লো-বয় ট্রাকের ট্রেইলারের মত। চারদিক খোলা। ঝালাই

করে স্টিলের কিছু খুঁটি লাগানো হয়েছে দু'পাশে, মাঝখানে রয়েছে তারপুলিনে ঢাকা একটা বড়সড় আকৃতি—নকল রকেট। খুঁটি থেকে লাইটওয়েইট চেইন টেনে বেঁধে রাখা হয়েছে ওটাকে, বিস্ফোরণের তাপে চেইনগুলো গলে যাবে। ফ্ল্যাটবেডের পেছনে রয়েছে প্রথম আর-৬৮ বগি। ভেতর থেকে সমস্ত সিট সরিয়ে ফেলা হয়েছে, কেটে ফেলা হয়েছে ছাতের একটা বড় অংশ। সেখান দিয়ে ঢোকানো হয়েছে সি-ফোরের ব্লকটা। জানালা দিয়ে আবছাভাবে চোখে পড়ছে ওটার কাঠামো। দু'জন লোক উঠল বোমার বগিতে। এরপর আরেকটা আর-৬৮ জোড়া দেয়া হয়েছে, সেটা অক্ষত। বোমার বগিতে দু'জন ওঠার পর সাতজন রয়ে গেছে, তারা উঠল ওটায়। খালি রইল ট্রেনের শেষ ক্যারিজ—সেটা আরেকটা ড্রাইভার'স্ ক্যাব।

মনে মনে হিসেব কষে ফেলল রানা—সব মিলিয়ে এগারোজন শত্রু, লিম আর ড্রাইভারসহ। বিপক্ষে ও একা, নিরস্ত্র। পাল্লা ওদেরই ভারী। প্ল্যানটাও বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার। জায়গামত নেবার পর থামানো হবে ট্রেন, বোমাটা আর্ম করা হবে, এরপর বিচ্ছিন্ন করা হবে পেছনের ড্রাইভার'স্ ক্যাব। ওতে চড়ে ফিরে আসবে লিম ও তার সঙ্গীরা। সময়ের চুলচেরা হিসেব করা হয়েছে নিঃসন্দেহে। ওরা নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছুলে তবেই ফাটবে বোমা। ধ্বংস হয়ে যাবে নিউ ইয়র্কের বিশাল একটা অংশ।

তার আগেই ঠেকাতে হবে লিমকে। কীভাবে সেটা সম্ভব, বুঝতে পারছে না রানা। একাকী, নিরস্ত্র অবস্থায় কীভাবে মোকাবেলা করবে লিমের সশস্ত্র সহযোগীদের? মিশেলের ওপরও ভরসা করতে পারছে না। বড়জোর চল্লিশ মিনিট বাকি রকেট লঞ্চের... এখন ও যদি ফোনে ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট বা এফবিআইকে সতর্কও করে দিতে পারে, রিঅ্যাকশন নেবার জন্যে যথেষ্ট সময় পাবে না তারা। এর

অর্থ, যা করার করতে হবে ওকেই।

নিউ ইয়র্কে অতীতে বহুবার এসেছে রানা, সাবওয়েতেও চড়েছে অনেক বার। স্মৃতি হাতড়ে ট্রেনের গতিপথ স্মরণ করল। ইস্ট রিভারের নিচের টানেল দিয়ে ম্যানহাটনের তলায় পৌঁছুবার আগে সারফেস ধরে ব্রুকলিন পেরুতে হবে লিমের ট্রেনকে। আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যাবার আগে শেষ স্টেশন যেন কোন্‌টা? ফিফটিন্থ স্ট্রিট, নাকি সেভেন্থ অ্যাভিনিউ? নাকি আরও পরে? তার আগেই যদি বোমাটা ডিটোনেট করে দেয়া যায়... মানে সারফেসে থাকতে... তা হলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমে যাবে অনেক। কিন্তু ম্যানহাটনে পৌঁছুলেই সব শেষ।

নিচে হাঁকডাক শুনে প্রমাদ গুনল রানা, ভাবনা-চিন্তা করতে গিয়ে দেরি করে ফেলেছে। খুলে গেছে ওয়ার্কশপের উল্টোদিকে স্লাইডিং ডোর, ঝাঁকি খেয়ে ট্রেনটা এগোতে শুরু করেছে ওদিকে। বাকিটা পরে দেখা যাবে, আগে ট্রেনে চড়তে হবে ওকে। ওয়ার্কশপের ভেতরে নামার উপায় নেই, ওখানে লিমের আরও লোক রয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বাইরের ব্যালকনিতে চলে এল রানা, সিঁড়ি ধরে দুদ্দাড় করে নামতে থাকল নিচে।

চার ধাপ বাকি থাকতেই আঁতকে উঠল। পিস্তলহাতে কোত্থেকে যেন এক গার্ড উদয় হয়েছে সামনে! সিঁড়িতে ওর পায়ের আওয়াজ শুনেই ছুটে এসেছে কি না কে জানে। রানাকে দেখে সে-ও চমকে গেছে, তাড়াহুড়ো করে তুলতে গেল হাতের পিস্তল। সিঁড়ির ওপর থেকে ডাইভ দিল রানা, কাঁধ দিয়ে পড়ল লোকটার বুকে। দু'জনেই আছড়ে পড়ল মাটিতে। ব্যথায় ককিয়ে উঠল লোকটা, হাত থেকে উড়ে চলে গেল পিস্তল। তার বুকের ওপর চড়ে বসল রানা, চেপে ধরল গলা। কিন্তু প্রতিপক্ষের শরীরে মোষের জোর, ঝটকা দিয়ে ফেলে দিল ওকে। এরপর এক লাফে উঠে দাঁড়াল। কোমরের

খাপ থেকে খুলে আনল একটা ছুরি, সেটা বাগিয়ে লাফ দিতে গেল রানার ওপর। শোয়া অবস্থাতেই পা চালাল রানা, সজোরে লাথি মারল লোকটার স্ক্রোটাম-এ। গুঙিয়ে উঠল ব্যাটা, ছুরি ফেলে দিয়ে দু'হাতে চেপে ধরল ঊরুসন্ধি, বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। উঠে দাঁড়িয়ে তার ঘাড়ে গায়ের জোরে একটা রদ্দা মারল রানা, জ্ঞান হারিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল লোকটা।

কপালের ঘাম মুছল রানা। পরক্ষণে সচকিত হলো ট্রেনের আওয়াজ শুনে। ওয়ার্কশপ থেকে বেরিয়ে পড়েছে ওটা! লড়াই করতে গিয়ে পেরিয়ে গেছে মূল্যবান ত্রিশ সেকেণ্ড। গার্ডের পিস্তলটা অন্ধকারে কোথায় পড়েছে কে জানে, খোঁজার সময় নেই। নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিল ছুরিটা, কোমরে গুঁজল। এরপর ওয়ার্কশপের পাশ ঘুরে ছুট লাগাল প্রাণপণে।

ওয়ার্কশপ পেরোতেই দেখা গেল ট্রেনটাকে। গতি বাড়াতে শুরু করেছে, আঁধারে যেন রক্তলাল চোখ মেলে রয়েছে পেছনের লাল বাতিগুলো। ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল রানা। পেছনের ক্যাবটা ওর থেকে একশো গজ দূরে, কিন্তু দূরত্ব বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে। কপাল ভাল যে, ওটায় কেউ নেই। নইলে রানাকে ছুটে আসতে দেখে নির্ঘাত গুলি ছুঁড়ত। ওয়ার্কশপের স্লাইডিং ডোর বন্ধ হয়ে গেছে ট্রেন বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে, কাজেই পিছন থেকেও বিপদ আসার সম্ভাবনা নেই। লাইনের পাশ দিয়ে পাগলের মত ছুটতে পারছে ও।

লাইনের দিকে একটা চোখ রাখতে হচ্ছে রানাকে। দু'পাশে দুটো পাত ছাড়াও, মাঝখান বরাবর তৃতীয় একটা পাত রয়েছে ট্র্যাকে—ওটা ইলেকট্রিফায়েড... ট্রেনকে বৈদ্যুতিক শক্তি জোগায়। কোনোভাবে যদি হোঁচট খেয়ে ওটার ওপর পড়ে, চোখের পলকে মারা যাবে ও, কয়েক হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎপ্রবাহে ছাই হয়ে যাবে শরীর।

মনে হলো অনন্তকাল ধরে দৌড়াচ্ছে... রেল-ইয়ার্ডেরও যেন কোনও শেষ নেই। শরীরের সমস্ত শক্তি নিংড়েও ট্রেনের কাছে যেতে পারছে না রানা। ঘামছে কুল কুল করে, হৃৎপিণ্ড যেন উঠে এসেছে গলার কাছে। একবার হোঁচট খেতে খেতেও কোনোমতে সামলে নিল নিজেকে। মেইনটেন্যান্সের একটা শেড পেরিয়ে এল, এবার দূরে ভেসে উঠল ইয়ার্ডের সীমানার ফেন্স। বুঝল রানা, হার হতে চলেছে ওর। নাকে ধুলোমাটির পাশাপাশি পরাজয়ের গন্ধও পেতে শুরু করেছে।

গতি বাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত চলেই গেল ট্রেনটা। আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল ওটার পেছনের লাল বাতি। থেমে দাঁড়াল রানা, অ্যাজমা রোগীর মত বেদম হাঁপাচ্ছে, হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। ফুসফুস যেন পাঁজরের খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু শারীরিক যন্ত্রণা ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠল ব্যর্থতার জ্বালা। চলে গেছে লিম... তাকে থামাতে পারেনি ও। প্রচণ্ড রাগ হলো সিঁড়ির গোড়ার ওই গার্ডের ওপর। ওখানে ত্রিশ সেকেণ্ড নষ্ট হয়েছে রানার—সেটাই পার্থক্য গড়ে দিয়েছে সাফল্য আর ব্যর্থতার।

কিছুই করার নেই এখন। কিন্তু ব্যাপারটা মানতে পারছে না রানা। নিজেকে প্রবোধ দিতে চাইল, সব মিশনে সফল হওয়া সম্ভব নয়... ও-ও তো মানুষ! একের পর এক বাধা-বিপত্তি ঠেলে এতদূর পর্যন্ত যে আসতে পেরেছে, সে-ই ঢের। কবর থেকে পর্যন্ত উঠে এসেছে! এর বেশি আর কী-ই বা করতে পারত? অথচ শান্ত হলো না মন। ওর ব্যর্থতায় প্রাণ যেতে বসেছে অসংখ্য নিরীহ মানুষের, কী করে মেনে নেবে সেটা? মেজর জেনারেল রাহাত খানের চেহারা ভেসে উঠল মানসপটে—কী জবাব দেবে তাঁকে? এত বড় ব্যর্থতার পর... এত মানুষের মৃত্যুর দায়ভার নিয়ে ওর পক্ষে কি আর কাজ করা সম্ভব? রিজাইন করতে হবে ওকে। তারপরেও তো বিবেকের দংশন এড়াতে পারবে না। বাকি জীবন এক অব্যক্ত

যন্ত্রণা কুরে কুরে খাবে ওকে।

পরাজয়ের ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে ছিল রানা, সংবিৎ ফিরল টুইন ইঞ্জিনের গুরুগম্ভীর আওয়াজে। ব্রেক কষে একটা মোটরসাইকেল এসে দাঁড়াল ওর পাশে। ঘাড় ফিরিয়ে চমকে উঠল—ওয়ার্কশপের বাইরে দেখা সেই ট্রায়াম্ফ থাণ্ডারবার্ডের পিঠে বসে আছে মিশেল!

'ওঠো!' হুকুমের সুরে বলল মেয়েটা।

'চাবি পেলে কোথায়?' রানার বিস্ময় কাটছে না।

'যাকে অজ্ঞান করে রেখে এসেছ, তার পকেটে। ও-ই মোটরসাইকেলটা চালাচ্ছিল তখন, চিনতে পারোনি?'

মাথা নাড়ল রানা। চেহারা দেখার সময় ছিল না ওর। জিজ্ঞেস করল, 'তারমানে আমার কথা তুমি শোনোনি? লুকিয়ে ছিলে ওয়ার্কশপের পাশে?'

'না। কেন যেন মনে হচ্ছিল, সাহায্যের প্রয়োজন হবে তোমার। যাক গে, এখনও দাঁড়িয়ে আছ কেন? ওঠো আমার পেছনে। ট্রেনটাকে ধরতে হবে!'

লাফ দিয়ে মিশেলের পেছনে চড়ে বসল রানা। থাণ্ডারবার্ডের মুখ ঘোরাল মিশেল, থ্রটল দিয়ে আগে বাড়াল বাহনকে। রেললাইন ধরে না এগিয়ে উঠে এল ইয়ার্ডের পাকা রাস্তায়। চোখের পলকে পৌঁছে গেল একটা খোলা গেটে। ডিউটি পোস্টে ঝিমোচ্ছে একজন নাইট ওয়াচম্যান। বাইকের আওয়াজ শুনে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, নিষ্ফল চেঁচাল থামবার জন্যে। কিন্তু তার কথা কানে তুলল না মিশেল। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এল গেট দিয়ে।

সাইড রোড থেকে খানিক পরেই চার লেনের একটা প্রশস্ত রাস্তায় উঠে এল থাণ্ডারবার্ড। দু'পাশে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া। রাত বেড়ে যাওয়ায় রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা বেশ কম। থ্রটল পুরোপুরি খুলে দিল মিশেল। উল্কার বেগে ছোটাল মোটরসাইকেল। চাকার তলায় শাঁই শাঁই করে সরছে

পিচঢালা রাস্তা। যেন ভেসে চলেছে থাণ্ডারবার্ড। স্পিড এত বেশি যে পিছন থেকে মিশেলকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরতে বাধ্য হলো রানা। এমনভাবে মোটরসাইকেল চালাচ্ছে মেয়েটা, ওটা যেন তার শরীরেরই একটা অংশ, সামনের গাড়িগুলোকে ওভারটেক করার সময়, অথবা বাঁক ঘোরার সময় এত দ্রুত এঁকে-বেঁকে যাচ্ছে ওদের বাহন, দম প্রায় বন্ধ হয়ে এল রানার। রাতের বাতাস সুঁইয়ের মত বিঁধছে গায়ে। কিন্তু মিশেলের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই।

জাত-বাইকার, মনে মনে ভাবল রানা। ও নিজেও মোটরবাইক ভাল চালায়, কিন্তু এত ভাল নয়। কার্নিভালে কেন মিশেলকে লিটল মিস ডেয়ারডেভিল ডাকা হতো, তা টের পাচ্ছে এখন হাড়ে হাড়ে। শুধুমাত্র ওয়াল অভ ডেথের কোনও চালকের পক্ষেই এমন বিপজ্জনক কায়দায় মোটর-সাইকেল চালানো সম্ভব।

ডানে মোড় নিয়ে বে পার্কওয়েতে ঢুকে পড়ল থাণ্ডারবার্ড। এদিকটা আবাসিক এলাকা, রাস্তার দু'ধারে ছোট-বড় অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, রোডসাইডে পার্ক করে রাখা হয়েছে বিভিন্ন মডেলের গাড়ি। এতক্ষণ সবক'টা ইন্টারসেকশনে সবুজ বাতি পেয়েছে ওরা, কিন্তু লাল বাতি দেখলেও মিশেল থামত কি না সন্দেহ। একটু পরেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। সামনে দেখা গেল লাল সিগনাল। পাশ থেকে এগিয়ে আসছে একটা গার্বেজ ট্রাক। গতি বিন্দুমাত্র না কমিয়ে ইন্টারসেকশনে ঢুকে পড়ল সে। মাত্র এক ইঞ্চির ব্যবধানে পেরিয়ে এল ট্রাকটার নাক। পেছনে ব্রেক কষার শব্দটা শুরু হতে না হতেই মিলিয়ে গেল। ট্রাক ড্রাইভারের গালাগাল শোনারও *সৌভাগ্য* হলো না ওদের!

বাতাসের তোড়ে চোখ কুঁচকে আছে রানার, এবার একটু মাথা তুলে সামনেটা দেখা নেবার চেষ্টা করল। দূরে ভেসে উঠল একটা ওভারব্রিজের মত অবয়ব... তবে ওটা ওভারব্রিজ

নয়, সাবওয়ের এলিভেটেড লাইন। লিমের ট্রেনের খোঁজে দ্রুত ডানে-বামে চোখ বোলাল, কিন্তু দেখতে পেল না ওটাকে। চলে গেছে? নাকি এদিকে আসেইনি? দিক ঠাহর করতে চাইল। যতটুকু বুঝতে পারছে, ইয়ার্ড থেকে পূর্বদিকে চলে এসেছে মিশেল; ট্রেনটার এদিক দিয়েই যাওয়ার কথা। নিশ্চয়ই সামনে কোথাও গিয়ে ওটাকে ইন্টারসেপ্ট করতে চাইছে মিশেল। কিন্তু কোথায়? ট্রেনটাকে নাগালে পেলেই বা লাভ কী? থামাবে কীভাবে?

এলিভেটেড লাইনের তলা দিয়ে সবেগে বেরিয়ে এল মিশেল। পর পর আরও দুটো ইন্টারসেকশন পেরুল বিপজ্জনক গতিতে। শহরের মূল অংশে ঢুকতে শুরু করেছে এখন, দেখা যাচ্ছে প্রাণের সাড়া। রাতভর জেগে থাকে নিউ ইয়র্ক। তার নমুনা হিসেবে রাস্তার ধারের বেঞ্চিতে অনেককে বসে থাকতে দেখা গেল, আলো জ্বলতে দেখা গেল একের পর এক ডাইনার আর রেস্টুরেন্টে, হাঁটতেও বেরিয়েছে অনেকে। এদিককার রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা বেশি। ঘন ঘন ওভারটেক করতে বাধ্য হচ্ছে মিশেল। সিক্সটিয়েথ স্ট্রিটের ট্রাফিক সিগনালে যানজটের দেখা মিলল। পাত্তা দিল না মিশেল, গতি একটু কমিয়ে সাইডওয়াকে তুলে দিল মোটরসাইকেল, এগিয়ে চলল ক্রমাগত হর্ন বাজিয়ে। সামনের পথচারীরা আতঙ্কে ডানে-বাঁয়ে ঝাঁপ দিচ্ছে।

ট্রাফিক আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ছুটে চলেছে মিশেল। প্রাণঘাতী ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা করছে না। একটা গোরস্তান পেরিয়ে এল। সেদিকে তাকিয়ে রানার মনে হলো, খুব শীঘ্রি ওদেরকে না ঠাঁই নিতে হয় সেখানে! মিশেল আপনমনে মোটরসাইকেল চালাচ্ছে, অল্পক্ষণেই পৌঁছে গেল ওশান পার্কওয়েতে। ছ'লেনের মহাসড়ক—এই রাতের বেলাতেও দিনের মত গাড়ির ভিড়। সামনে এক জায়গায় রাস্তা মেরামতের কাজ চলছে, একজন ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়িয়ে

নিয়ন্ত্রণ করছে যান চলাচল। কাছাকাছি গিয়ে থামতে বাধ্য হলো মিশেল। এতক্ষণে কথা বলার সুযোগ পেল রানা।

'কোথায় যাচ্ছ?' মিশেলের কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করল ও।

'ফোর্থ অ্যাভিনিউ,' বলল মিশেল। 'ওখানকার সাবওয়ে স্টেশনে রেনোভেশন ওয়ার্ক চলছে। ট্রেনের আগেই আশা করি পৌঁছুতে পারব ওখানে।'

'তারপর?'

'আমি কী জানি! ট্রেন থামানোর দায়িত্ব তো তুমি নিয়েছ।'

ট্রাফিক পুলিশ হাতের ইশারা করছে। থ্রটল বাড়িয়ে আবার সামনে বাড়ল মিশেল। ওশান পার্কওয়ের পুরোটা পাড়ি দিয়ে পৌঁছুল প্রসপেক্ট এক্সপ্রেসওয়েতে। এই রাস্তাটা চলে গেছে একেবারে ম্যানহাটন পর্যন্ত। সন্দেহ নেই রানার, ট্রেনের চেয়ে অনেক দ্রুত এগোচ্ছে ওরা, কিন্তু লিমকে অনেক কম দূরত্ব পাড়ি দিতে হচ্ছে... পথে কোনও বাধা নেই তার। ব্যাপারটা এখন স্রেফ প্রতিযোগিতা—কে আগে পৌঁছুতে পারে ফোর্থ অ্যাভিনিউয়ের সাবওয়ে স্টেশনে।

মিশেলের হাতের ছোঁয়া পেয়ে থাণ্ডারবার্ড যেন পাখির মত উড়ছে। চলন্ত গাড়িগুলোর মাঝ দিয়ে ফাঁকফোকর খুঁজে নিয়ে, উল্টোদিক থেকে আসা গাড়ির হেডলাইটের ঝলকানি অগ্রাহ্য করে দুর্বার বেগে চলেছে। প্রসপেক্ট পার্কওয়েও পেরিয়ে এল, এরপর সেন্ট্রাল পার্কের কিনার ঘেঁষে বাঁয়ে মোড় নিল, ঢুকে পড়ল টেনথ স্ট্রিটে। এ-রাস্তা অনেকটাই সংকীর্ণ, চারদিকে নানা ধরনের ওয়্যারহাউস। বিল্ডিংগুলোর ওপর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে সাবওয়ের এলিভেটেড লাইন। ওদিকে তাকাতেই লাফিয়ে উঠল রানার হৃৎপিণ্ড। ওই তো লিমের ট্রেন... দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। ট্রেনটাকে ধরে ফেলেছে মিশেল, এখন প্রায় সমান্তরালভাবে এগোচ্ছে ওদের

থাণ্ডারবার্ড। স্টেশনটা কোথায়? তাড়া অনুভব করল রানা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছুতে চায় ওখানে। সামনে যদি একটা যানজটও পড়ে, দেরি হয়ে যাবে ওদের। স্টেশনে ঢোকার আগেই চলে যাবে ট্রেনটা।

আড়াআড়িভাবে ফিফথ অ্যাভিনিউ অতিক্রম করল থাণ্ডারবার্ড। দু'দিক থেকে ভেসে এল ব্রেক কষার কর্কশ আওয়াজ আর ড্রাইভারদের গালাগালের তুবড়ি।

ডানে তাকাল রানা। রেললাইনটা কতগুলো বিল্ডিঙের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। ট্রেনটাকে দেখতে না পেয়ে অস্থিরতা অনুভব করল। ধূসর রঙের একটা অ্যাপার্টমেণ্ট ব্লক পেরিয়ে এল ওরা। তারপরেই আবার উদয় হলো লাইন। সোজা চলে গেছে মাথার উপরের রেলস্টেশনে। ফোর্থ অ্যাভিনিউয়ে পৌঁছে গেছে ওরা। র‍্যাম্পের মত অস্থায়ী একটা ঢালু রাস্তা দেখতে পেল রানা, উঠে গেছে একেবারে প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত—রেনোভেশনের কাজে নিয়োজিত শ্রমিক আর নির্মাণ-সামগ্রী ওঠানো-নামানোর জন্যে তৈরি করা হয়েছে। রাস্তা ছেড়ে সেই র‍্যাম্পে উঠে এল থাণ্ডারবার্ড। কয়েক গজ দূরে ট্রেনটাও যেন ছুটছে ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। ছোট, নিচু একটা গেট দেখা গেল র‍্যাম্পের মাথায়, শেকল পেঁচিয়ে তালা লাগানো হয়েছে ওটায়। কিন্তু গতি কমাল না মিশেল, ছুটছে আগের মত। আঁতকে উঠল রানা, গেটের সঙ্গে সংঘর্ষ হলে নির্ঘাত ছিটকে পড়বে ওরা।

'হোল্ড অন!' শেষ মুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠল মিশেল। পরক্ষণে থ্রটল আর ব্রেকের সমন্বয়ে কী যেন একটা করল। র‍্যাম্প ছেড়ে শূন্যে ঝাঁপ দিল থাণ্ডারবার্ড, পেরিয়ে এল তালাবদ্ধ গেটটাকে। তারপর নেমে এল অন্যপাশে। প্রচণ্ড চাপে যেন ককিয়ে উঠল বাহনটার পুরো কাঠামো।

আশ্চর্যের ব্যাপার, ব্যালান্স হারাল না মিশেল। মোটরসাইকেলের চাকা মাটি স্পর্শ করতেই আবার থ্রটল

ঘোরাল, সবেগে এগিয়ে চলল সামনে। ঝট্ করে পেছনে তাকাল রানা, দৃষ্টি বিস্ফারিত। যেভাবে গেটটা পেরিয়ে এসেছে ওরা, তা অবিশ্বাস্য। যেন জাদু দেখিয়েছে লিটল মিস ডেয়ারডেভিল।

স্টেশনে ঢুকে পড়েছে ওরা। ছুটছে প্ল্যাটফর্ম ধরে। একপাশে ইঁটের দেয়াল, মাথার উপরে ক্যানোপি, অন্য পাশে লিমের ট্রেন—কৃষ্ণবরণ রাতের মাঝে যেন একটা রূপালি ঝলক। জানালার আলো দেখতে পাচ্ছে রানা, কানে গমগম করছে ইঞ্জিনের আওয়াজ। ট্রেনের চাকা একটা কণ্ট্যাক্ট পয়েন্টের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যেতেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ফুলঝুরি ছড়াল।

এবার গতি কমাতে বাধ্য হয়েছে মিশেল। প্ল্যাটফর্মটা সংকীর্ণ, পুরোটা জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে নানা ধরনের নির্মাণসামগ্রী। প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্যও ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। থাণ্ডারবার্ডকে পরাস্ত করে এগিয়ে যাচ্ছে ট্রেন। পেশি শক্ত হলো রানার, বুঝতে পারছে কী করতে হবে ওকে। মৃত্যুর সঙ্গে আরেকবার জুয়া খেলতে হবে। আর কোনও উপায় নেই। প্ল্যাটফর্ম শেষ হয়ে আসছে... পুরো ট্রেন ইতিমধ্যেই পেরিয়ে গেছে থাণ্ডারবার্ডকে, বাকি রয়েছে কেবল পেছনের ড্রাইভার'স্ ক্যাব, সেটাও ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে ওদেরকে ফেলে।

মিশেলের কোমর ছেড়ে দিল রানা, বাম পা-টা সিটের ওপর দিয়ে নিয়ে এল ডান পায়ের পাশে, দুটো পা-ই রইল ডানদিকের ফুট রেস্টের ওপর। একটু আড়াআড়ি ভঙ্গিতে বসল সিটে, ঝাঁপ দেবার জন্যে প্রস্তুত। ওর মতলব বুঝতে পেরেছে মিশেল, থাণ্ডারবার্ডকে যতটা পারে প্ল্যাটফর্মের কিনারে নিয়ে এল। ছুটন্ত ট্রেন এখন রানার মাত্র দেড় ফুট দূরে। পেছনের মাথাটা বেরিয়ে যেতেই লাফ দিল ও, হাত বাড়িয়ে দিয়েছে... আঁকড়ে ধরতে চাইছে রিয়ার ক্যাবের

পেছনে লাগানো সেফটি রেইল। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্যে বাতাসে ভাসল ওর শরীর, মনে হলো মিস করে যাবে... রেললাইনে আছড়ে পড়ে হয় ঘাড় ভাঙবে ওর, কিংবা বিদ্যুতের শক খেয়ে মারা পড়বে... কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘটল না কোনোটাই। হাতের তালুতে সেফটি রেইলের ধাতব স্পর্শ পেল ও, খামচে ধরল দু'হাতের মুঠোয়। সঙ্গে সঙ্গে লাগল প্রচণ্ড এক হ্যাঁচকা টান। হাতদুটো যেন বেরিয়ে আসবে কাঁধের জয়েন্ট থেকে... ব্যথায় চোখে আঁধার দেখল রানা। কোনোমতে সে-যন্ত্রণা সয়ে ক্যাবের তলার দিকে একটা খাঁজ খুঁজে নিল, পা ঠেকাল সেখানে। নিজেকে সামলে নেবার পর এক ঝলক পেছনে তাকাল—ব্রেক কষে প্ল্যাটফর্মের শেষ মাথায় থমকে দাঁড়াচ্ছে মিশেল। পরক্ষণে দৃষ্টিসীমা থেকে হারিয়ে গেল দুর্ধর্ষ মেয়েটা।

রানার দু'পাশ থেকে স্টেশনের কাঠামো সরে গেল। অল্প সময়ের জন্যে খোলা আকাশ দেখতে পেল ও, এরপরেই ঢালু লাইন ধরে ট্রেনটা ঢুকে গেল হাঁ করে থাকা একটা কালো টানেলের ভেতর।

উনিশ

টানেলের ভেতর দিয়ে বজ্রের গর্জন তুলে ছুটে চলেছে ট্রেন। সেফটি রেইল ধরে ঝুলে আছে রানা, কানে তালা লেগে যাচ্ছে ওর। ট্রেনের গতি বেড়েছে বলে মনে হলো, তবে সেটা তিনদিক থেকে চেপে বসে থাকা দেয়ালের কারণে সৃষ্ট

বিভ্রমও হতে পারে। একটা ব্যাপার পরিষ্কার, লিম একবিন্দু বাড়িয়ে বলেনি। কোথাও না থেমে ছুটে চলেছে তার ট্রেন। জায়গামত লোক বসিয়ে পুরো লাইন ক্লিয়ার রেখেছে সে; সামনে যত সিগনাল পড়ছে, সবই সবুজ। ব্রুকলিনের উত্তর প্রান্ত থেকে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং পর্যন্ত লাইনটা প্রায় সরলরেখায় এগিয়েছে। সে-পথে বুলেটের মত ছুটেছে ট্রেনটা, কারও সাধ্য নেই থামায়।

প্রথম কয়েক মিনিট যেমন ছিল তেমনই রইল রানা—শক্তি সঞ্চয় ও একই সঙ্গে পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করার জন্যে। কী কী দেখেছে স্মরণ করল। মোট পাঁচটা ক্যারিজ রয়েছে ট্রেনে। পেছনের ড্রাইভার'স্ ক্যাব ধরে ঝুলে আছে ও। পরেরটায় রয়েছে লিমের টাস্ক ফোর্স—আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত সাতজন লোক। রানার সঙ্গে রয়েছে কেবল একটা ছুরি, কোমরে গোঁজা। লোকবল আর অস্ত্রবল... দু'দিক থেকেই এগিয়ে আছে ওরা। ধরা যাক, কোনোভাবে ওদেরকে ফাঁকি দিতে পারল, তা হলে পৌঁছে যাবে বোমা-বহনকারী বগিতে। সেখানেও দু'জন রয়েছে। এরপর নকল রকেট-সহ ফ্ল্যাটবেড কার, আর সবশেষে সামনের ড্রাইভার'স্ ক্যাব, যেখানে রয়েছে লিম নিজে ও ট্রেনের চালক। পাল্লা কোনোভাবেই নিজের দিকে ঝোঁকানোর উপায় দেখতে পাচ্ছে না রানা। চেষ্টা করলে হয়তো বা চ্যালা-চামুণ্ডাদের ফাঁকি দিয়ে লিম পর্যন্ত পৌঁছুনো যায়, তাকে খতম করা যায়... কিন্তু তাতে লাভ হবে কী? নেতৃত্ব হারাবে টাইকুনের বাহিনী, হয়তো পিঠটান দেবে, কিন্তু রয়ে যাবে বোমাটা। টাইমার হয়তো চালু করে দেয়া হয়েছে ইতিমধ্যে। এর অর্থ, লিম মরলেও বোমাটা ঠিকই ফাটবে।

ভুলে যাও লিমের কথা, মনে মনে নিজেকে বলল রানা। বোমাটা নিয়ে ভাবো। সময় এখনও কিছুটা আছে তোমার হাতে। আধ ঘণ্টা... নিদেনপক্ষে বিশ মিনিট। এর মাঝে

বোমার বগিতে পৌঁছুতে হবে ওকে, ওটাকে ডি-অ্যাক্টিভেট করতে হবে। লিমকে পরে শাস্তি দিলেও চলবে। আগে নিউ ইয়র্ককে বাঁচানো দরকার। শত্রুর সংখ্যা নিয়ে ভয় পেল না। এর চেয়ে অনেক বেশি শত্রুকে একাকী মোকাবেলা করার অভিজ্ঞতা আছে ওর।

আঁধার থেকে আচমকা আলোকিত একটা স্টেশনে বেরিয়ে এল ট্রেন। চোখে ধাঁধা লাগল রানার। আবছাভাবে দেখল একটা নিয়ন সাইন—*ক্যারল স্ট্রিট।* আর দেখল স্টেশনের দেয়ালে সাদা টাইলস্, বেঞ্চির সারি, আর টিকেট বুথ। চোখের পলকে জায়গাটা পেরিয়ে এল ওরা।

কাজে নামার সময় হয়েছে। রেইল ধরে মাকড়সার মত নড়ল রানা, চলে এল বগির কোনায়। সেখান দিয়ে মাথা বের করতেই মুখে আঘাত হানল তীব্র বাতাস আর ধূলিকণা। পাত্তা দিল না। ড্রাইভার'স্ কেবিনের দরজা ওর নাগালের মধ্যে রয়েছে, একটা হাত বাড়িয়ে ধরল ওটার হাতল। মোচড় দিল। কিন্তু খুলল না দরজা। তালা দিয়ে রেখেছে।

ছাতের ওপর দিয়ে যেতে হবে রানাকে। কিন্তু সেটা বিপজ্জনক। আদৌ সম্ভব কি না বুঝতে পারছে না। ট্রেনের পেছনে এক হিসেবে নিরাপদে রয়েছে ও, কিন্তু ছাতে উঠলেই পড়তে হবে বাতাসের তোড়ে। ওকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। তারচেয়েও বড় বিপদ হলো টানেলের ছাত। বড্ড নিচু। সময়, পরিশ্রম ও খরচ কমানোর জন্যে ছোট করে বানানো হয়েছে টানেল... যতটুকু না হলেই নয়। ট্রেনের ছাতের সঙ্গে ওটার দূরত্ব বড়জোর দেড় ফুট, সেটাও পুরোপুরি উন্মুক্ত নয়। কিছুদূর পর পর ছাতের সঙ্গে লাগানো রয়েছে বিভিন্ন ধরনের পাইপ, তার, বাতি, ইত্যাদি। ওগুলো সঙ্গে যদি সংঘর্ষ হয়, ছাতু হয়ে যাবে ও, কিংবা কেটে আলগা হয়ে যাবে মাথা।

নিচ থেকে ছাতটা ভাল করে জরিপ করল রানা। একটু

আশা জাগল। ছাতটা সমতল নয়, দু'পাশে একটু ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। কিনার ঘেঁষে ওই ঢালু অংশ ধরে যদি এগোতে পারে, অনেকটাই ফাঁকা জায়গা পাবে। তা হলে টানেলের ছাতে লাগানো পাইপ-টাইপের সঙ্গে সংঘর্ষ হবে না ওর। ছাতটা পুরোপুরি মসৃণও নয়, খাঁজকাটা... এর ফলে পিছলে পড়ে যাবার ভয় থাকবে না। সমস্যা বলতে, শরীরের পুরো ভার হেলে থাকবে একদিকে, এগোতে হবে একটা হাতে ভর করে। ট্রেন যদি ঝাঁকি খায়, গড়িয়ে নিচে পড়ে যাবে ও। একই ঘটনা ঘটবে অন্যদিক থেকে দ্বিতীয় কোনও ট্রেন এলে। দুই ট্রেনের মধ্যবর্তী বাতাসের টার্বুলেন্সে আটকা পড়বে ও, উড়ে যাবে খড়কুটোর মত। নিচে পড়ার পর কী অবস্থা হবে, সেটা আর ভাবতে চাইল না। নির্ঘাত রক্তমাংসের একটা তালে পরিণত হবে ও।

আর কোনও পথ নেই। এই একটা উপায়ই দেখতে পাচ্ছে রানা। এরই মাঝে চিন্তাভাবনা করতে গিয়ে যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়েছে, এবার কাজ শুরু করা দরকার। সামনে আবারও আলো দেখা গেল... পরের স্টেশনটা পেরিয়ে এল ট্রেন—বার্জেন স্ট্রিট। চারদিক ফের অন্ধকার হয়ে গেলে নড়ল ও। একে একে দু'হাত রেইল থেকে ছাড়িয়ে ছাতের কিনার আঁকড়ে ধরে শরীরকে টেনে তুলল উপরে। মাঝ বরাবর উঠল ও, তারপরেই পিছলে নেমে গেল ঢালু অংশে। মাথার ওপর দিয়ে সাঁই করে চলে গেল একটা মোটা পাইপ, আরেকটু হলেই গুঁড়িয়ে যেত ওর মাথা। পতন ঠেকাবার জন্যে ডানহাতে ছাতের কিনার ধরে থাকল রানা, এরপর বাম হাত আর দু'পায়ের আঙুলের ঠেলায় ধীরে ধীরে সামনে নিতে শুরু করল নিজেকে। বাতাসের অত্যাচার এড়াবার জন্যে মাথা নিচু করে রেখেছে, শরীরকে লেপ্টে রেখেছে ছাতের সঙ্গে।

দু'মিনিট যেতে না যেতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল ও। যতটা ভেবেছে কাজটা তারচেয়ে অনেক কঠিন। বুকে ভর দিয়ে

সমতল সারফেসে হামাগুড়ি দেয়াই যথেষ্ট কষ্টকর, আর ও এ-মুহূর্তে কাত হয়ে আছে। শরীরের পুরো ওজন ডান হাতে, প্রাণান্ত চেষ্টা করছে যাতে পিছলে পড়ে না যায়। শক্তির সামান্য যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে, তা ব্যবহার করছে সামনে এগোবার জন্যে। শামুকও বোধহয় এরচেয়ে দ্রুত চলাচল করে। মাথার উপরে টানেলের ছাত ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছে না; ট্রেন এত জোরে ছুটছে, যেন পানির স্রোতের মত বয়ে চলেছে নিরেট কংক্রিট। হঠাৎ সামনে একটা ইলেকট্রিকের তারে স্পার্ক করে উঠল, চোখ ঝলসে গেল ওর। অন্ধের মত টের পেল, শরীরের তলায় ট্রেনের গতি আরও বেড়ে গেছে।

মনকে শক্ত করল রানা। সমস্ত কষ্ট অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলল একরোখার মত। মাথায় আলতো বাড়ি খেল শক্ত কিছু একটা—এক গোছা তার... ঢিলে হয়ে নেমে এসেছে নিচে। মাথা তুললে নির্ঘাত গলায় ফাঁস লেগে যেত ওর। তাড়াতাড়ি শরীর আরেকটু মিশিয়ে দিল ও ছাতের গায়ে। অভিসম্পাত দিচ্ছে ভাগ্যকে।

কতদূর এগোল ট্রেন? ভাবল রানা। ইস্ট রিভারের তলায় পৌঁছুবার আগে আর ক'টা স্টেশন পার হতে হবে? সময়ই বা কতক্ষণ আছে ওর হাতে? যেন প্রশ্নগুলোর জবাব দেবার জন্যেই আরেকটা স্টেশন উদয় হলো। নিয়ন সাইনে জ্বলজ্বল করছে নাম—জে স্ট্রিট। ওটা পড়া শেষ হতেই আবারও টানেলের অন্ধকার নেমে এল চারদিকে। তাড়া অনুভব করল রানা, যতটা পারল দ্রুত এগোল সামনে।

খানিক পরে ক্যারিজের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল ও। সাবধানে দুই ক্যারিজের মধ্যবর্তী ফাঁক পেরিয়ে উঠে গেল প্যাসেঞ্জার বগির ছাতে। এবার আগের চেয়ে সতর্কভাবে এগোতে হবে ওকে। ঠিক নিচে রয়েছে লিমের সশস্ত্র রক্ষীরা। ট্রেনের গর্জনে এমনিতে কোনও শব্দ শুনতে পাবার কথা নয়

তাদের, তারপরেও কিছু বলা যায় না। হয়তো ছাতের গায়ে পা ঠোকার আওয়াজ শুনে ফেলল।

এক হাতে পুরো শরীরের ওজন ধরে রাখার মাশুল দিতে হচ্ছে ডান হাতটাকে। টনটন করছে... পেশি ছাড়িয়ে ব্যথাটা ছড়িয়ে পড়ছে কাঁধে। তীব্র বাতাসে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর। ধুলোর কণা যেন ধারালো কাঁচের মত আঘাত হানছে উন্মুক্ত চামড়ায়। চোখ জ্বলছে। তাও ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে চলেছে রানা। প্যাসেঞ্জার বগির শেষ প্রান্তে পৌঁছুবার আগে ঝড়ের বেগে আরও দুটো স্টেশন পেরিয়ে এল ট্রেন।

ছাতের প্রান্তে পৌঁছে নিচে উঁকি দিল রানা। দুই বগির মাঝে দেড় ফুটের মত ফাঁক রয়েছে। শরীর বাঁকিয়ে-চুরিয়ে সেখান দিয়ে নামতে শুরু করল ও। একপাশ দিয়ে নামছে, যাতে দরজার পোর্টহোল দিয়ে ওকে দেখে না ফেলে লিমের শত্রুরা। ক্ষণিকের জন্যে নিচে চলে গেল চোখ, রেললাইনের যেন অস্তিত্ব নেই ট্রেনের তলায়, ধূসর কিছু রেখা দ্রুত সরে যাচ্ছে কেবল। সাবধানে কাপলিঙের ওপর পা রেখে নেমে এল এবার। গোঁজের মত লাগল নিজেকে—দুটো ধাতব দেয়ালের মাঝে আটকা পড়েছে। দেয়ালদুটো কাঁপছে, নড়ছে... চেষ্টা করছে ওকে থেঁতলে দিতে।

হাত বাড়াল রানা, আলতো করে ঘোরাল বোমার বগির দরজার হাতল। সহজেই ঘুরল ওটা, ভেতর থেকে তালা দেয়া হয়নি। সন্তুষ্ট হয়ে উঁকি দিল দরজার পোর্টহোল দিয়ে। বগির একেবারে সামনের প্রান্তে রয়েছে বোমাটা। দুই পাহারাদার বসে আছে বগির মাঝখান বরাবর, মুখোমুখি। পিস্তল আছে ওদের কাছে, কিন্তু অস্ত্রদুটো শোল্ডার হোলস্টারে গোঁজা। ঢিলেঢালা একটা ভাব লক্ষ করা গেল তাদের মাঝে। চলন্ত ট্রেনে কোনও বিপদ আশা করছে না। কোমরে হাত দিয়ে ছুরিটা আছে কি না দেখে নিল রানা, তারপর দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

টানেলের কানফাটানো আওয়াজের কারণে দরজা খোলার শব্দ পায়নি রক্ষীরা, সুযোগটা কাজে লাগাল ও। কোনোদিকে না তাকিয়ে সরাসরি ধেয়ে গেল ওদের দিকে। একেবারে শেষ মুহূর্তে ওকে দেখতে পেল দুই গার্ড। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, হাত চলে গেল হোলস্টারে। পিস্তল স্পর্শ করার আগেই বিদ্যুৎবেগে কোমর থেকে ছুরিটা বের করল রানা, আমূল গেঁথে দিল প্রথম গার্ডের বুকে... ঠিক হৃৎপিণ্ড বরাবর। আর্তনাদ বেরিয়ে এল লোকটার মুখ দিয়ে, চিৎ হয়ে পড়ে গেল সে, মুখ দিয়ে উঠে এল রক্ত। দ্বিতীয় গার্ড ততক্ষণে পিস্তল বের করে ফেলেছে, তাড়াহুড়ো করে ট্রিগার চাপল। ঝপ করে বসে পড়ে গুলিটাকে ফাঁকি দিল রানা, তারপর ঝাঁপ দিল লোকটাকে লক্ষ্য করে। কাঁধ দিয়ে পড়ল তার বুকে। কিন্তু বিশালদেহী গার্ডের গায়ে গণ্ডারের মত জোর, এক চুল নড়ল না সে, খপ করে চেপে ধরল রানার ঘাড়, ওকে সরিয়ে দিল গায়ের ওপর থেকে।

আবারও গুলি করতে চেষ্টা করল লোকটা। থাবা দিয়ে হাতটা সরিয়ে দিল রানা, বোলতার গুঞ্জন তুলে বুলেটটা চলে গেল ওর কানের পাশ দিয়ে। আর তখুনি একটা ঝাঁকি খেল ট্রেন। তাল হারাল দু'জনে, আছড়ে পড়ল ধাতব মেঝেতে, গড়াতে গড়াতে চলে গেল যে-দরজা দিয়ে রানা এইমাত্র ঢুকেছে, সেটার দিকে। শোয়া অবস্থাতেই তৃতীয়বারের মত গুলি করার চেষ্টা করল গার্ড, কিন্তু বেকায়দা পজিশনে রয়েছে সে, নিশানা স্থির করতে পারল না। মনের সাধ মিটিয়ে পায়ের গোড়ালি দিয়ে তার মুখে মারল রানা, থেঁতলে দিল নাক। গলগল করে বেরিয়ে এল রক্ত। নিজের অজান্তেই লোকটার একটা হাত চলে গেল মুখে। লাফ দিয়ে তার বুকের ওপর চড়ে বসল রানা। পিস্তল ধরা হাতটা হাঁটুর তলায় ফেলে আটকাল, ডান হাতটা আড়াআড়িভাবে রাখল লোকটার গলায়, শরীরের সমস্ত ভার চাপিয়ে দিল তাতে। শঙ্কিত বোধ

করছে, গুলির আওয়াজ পেছনের বগির গার্ডরা শুনে ফেলেছে কি না কে জানে, পোর্টহোল দিয়ে উঁকি দিলেই দেখে ফেলবে এখানে কী ঘটছে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসবে নিঃসন্দেহে।

রানার হাতের চাপে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছে গার্ডের। বিস্ফারিত হয়ে গেল চোখের দৃষ্টি। ছটফট করল রানার শরীরের তলায়, কিন্তু ছাড়ল না ও। বরং ঝট্ করে প্রচণ্ড এক চাপ দিল। ওই এক চাপেই ভেঙে গেল শ্বাসনালী। কয়েকবার তড়পে স্থির হয়ে গেল লোকটা। উঠে দাঁড়িয়ে কপালের ঘাম মুছল রানা।

আর তখুনি পিছন থেকে ভেসে এল খটাখট শব্দ। দরজার হাতল ঘোরাচ্ছে কেউ ব্যস্ত হাতে। পাঁই করে ঘুরল রানা। পোর্টহোলে ক্রুদ্ধ এক কোরিয়ানের মুখ দেখল। অবশেষে টের পেয়েছে ওরা, ছুটে আসছে ওকে ঠেকাতে। কিন্তু বড্ড দেরি করে ফেলেছে। মৃত গার্ডের লাশ পড়ে আছে দরজার সামনে। পাল্লাটা ঠেলতেই ঠেকে গেল দেহটার সঙ্গে। জোরাজুরি করেও এক ইঞ্চির বেশি ফাঁক করতে পারল না। মুচকি হাসল রানা। ও-পথে আর আসতে পারবে না ওরা।

হঠাৎ কোরিয়ান গার্ডকে পিস্তল তুলতে দেখল ও, তাড়াতাড়ি সরে গেল একপাশে। পরমুহূর্তে পোর্টহোল লক্ষ করে গুলি চালানো হলো। বাতাসের চাপে ভাঙা কাঁচের টুকরো ছিটকে পড়ল বগির ভেতরে। ফাঁকা পোর্টহোল দিয়ে পিস্তলসহ হাত ঢোকাল লোকটা, রানাকে গুলি করবে। ডাইভ দিল রানা, মেঝে থেকে তুলে নিল মৃত গার্ডের পিস্তল, সিধে হয়েই ট্রিগার চাপল। রক্তাক্ত একটা ক্ষত দেখা দিল পোর্টহোল গলে ঢোকা হাতটায়। আবছাভাবে শোনা গেল চিৎকার। দরজার ওপাশ থেকে সরে গেল লোকটা। আর কেউ আসার সাহস করবে বলে মনে হয় না। দূর থেকে বড়জোর গুলি ছুঁড়তে পারে, কিন্তু পোর্টহোলের কারণে ছোট হয়ে আসবে তাদের টার্গেট এরিয়া। ওটুকু এড়িয়ে চললেই ও

নিরাপদ।

তবে এখনও খুশি হবার মত কিছু ঘটেনি। দরজা দিয়ে আসতে না পারলে কোরিয়ানরা বিকল্প পথে আসবে। কিছুতেই হাল ছাড়বে না। খুব বেশি সময় নেই ওর হাতে, এর ভেতরেই যা করার করতে হবে রানাকে। বোমাটা নিষ্ক্রিয় করতে হবে, তারপর থামাতে হবে ট্রেনটাকে। যদি সম্ভব হয়, লিমকেও পাঠাতে হবে পরপারে।

জানালার কাছ ঘেঁষে এগোতে শুরু করল রানা। একটু থেমে ছুরি খাওয়া গার্ডের বুক থেকে খুলে নিল ছুরিটা। তারপর তাকাল বোমার দিকে। বিশাল এক প্রার্থনাবেদির মত বগির মাথায় বসে আছে ওটা, তারপুলিনে ঢাকা। কাউকে যেন কাছে ঘেঁষতে মানা করছে নীরবে।

বগির আওয়াজ বদলে যাওয়ায় চট করে চারপাশ দেখে নিল রানা। কোরিয়ানরা কি দরজা খুলে ফেলেছে? নাকি খবর পেয়ে লিম ছুটে এসেছে ঘটনার তদন্ত করতে? না, তেমন কোনও আলামত দেখা গেল না। সব আগের মত আছে—নিজের ছন্দে ছুটছে ট্রেন, কামরার ভেতরে নিশ্চল পড়ে আছে দুই গার্ডের লাশ। বোমার দিকে মনোযোগ দিল ও। সি-ফোর দিয়ে তৈরি হয়েছে ওটা—লিম নিজে বলেছে। আত্মম্ভরী টাইকুন অহংকার করতে গিয়ে বড় বেশি তথ্য দিয়ে ফেলেছে ওকে, এবার সেই তথ্যই তার বিপক্ষে কাজে লাগাতে হবে।

সি-ফোর বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান রয়েছে রানার। বিস্ফোরকটার রাসায়নিক নাম হচ্ছে: *সাইক্লোট্রাইমিথাইলিন-ট্রাইনাইট্রামিন।* আর.ডি.এক্স-ও বলে একে। আটার দলার মত দেখতে। খুবই স্টেবল... একেবারেই স্পর্শকাতর নয়। আগুন লাগিয়ে দিলেও কিচ্ছু ঘটবে না। চাইলে একের পর গুলিও করতে পারে, ফাটবে না।

ছুরি দিয়ে দড়ির বাঁধন কাটল রানা, তারপুলিন সরিয়ে

উন্মুক্ত করল সি-ফোরের ব্লকটাকে। নোংরা সাদাটে রঙ, গোটা ছয়েক ডিটোনেটর গুঁজে দেয়া হয়েছে, একটামাত্র তার দিয়ে সেগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে একটা ব্যাটারি প্যাকের সঙ্গে। জার্মানিতে তৈরি ব্লাস্ট ক্যাপ ব্যবহার করছে লিম। সহজ ভাষায় একটা দেশলাই কাঠির সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য নেই এর। ব্যাটারি থেকে স্পার্কের মাধ্যমে ইগনিশন চার্জে আগুন ধরানো হবে—চার্জটা রূপার এসিটাইলাইড বা সীসার স্টাইফনেটে তৈরি। এর ফলে প্রথমে একটা ছোট্ট বিস্ফোরণ ঘটবে, আর সেটাই চেইন রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে বিস্ফোরিত করবে পুরো ব্লকটাকে। এক দেখাতেই বুঝতে পারছে রানা, এ-কাজের জন্যে ছ'টা ব্লাস্ট ক্যাপের কোনও প্রয়োজন নেই, একটাই যথেষ্ট... কিন্তু লিম কোনও ঝুঁকি নিচ্ছে না।

এই প্রথমবারের মত ভাগ্য রানার পক্ষে রয়েছে, আর সেটা লিমের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে। সে আশা করেনি এই বোমার কাছে কেউ পৌঁছুতে পারবে। ভেবেছে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে পুরো অপারেশন। সেজন্যে জটিল কোনও ডিটোনেশন সিস্টেম ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি সে। নকল তারের সার্কিট, বা সি-ফোরের ভেতরে গোপন ক্যাপাসিটর বসিয়ে বুবি ট্র্যাপ তৈরি করেনি। খুবই সাদামাটা একটা সিস্টেম লাগানো হয়েছে বোমায়—ছ'টা ডিটোনেটর আর ব্যাটারি প্যাকের মাঝে একটামাত্র তার... টাইমার হিসেবে রয়েছে পুরনো আমলের একটা অ্যালার্ম ঘড়ি। দেখে মনে হচ্ছে কোনও আনাড়ি লোক বানিয়েছে ওটা। সহজেই এ-জিনিস ডিফিউজ করতে পারবে ও, যদি একটু মনোযোগ দেয়, আর হাতদুটো স্থির রাখতে পারে। একমাত্র সমস্যা হলো, ব্লাস্ট ক্যাপগুলো খুবই স্পর্শকাতর। হাত থেকে পড়ে গেলেও বিস্ফোরিত হতে পারে।

দরজার দিকে একবার তাকিয়ে নিল রানা। পাল্লাটা বাড়ি খাচ্ছে বিশালদেহী গার্ডের গায়ে। পোর্টহোলে একটা মুখ উঁকি

দিল। সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল তুলে গুলি করল ও। কপালে তৃতীয় নয়ন নিয়ে উল্টে পড়ল লোকটা। শোনা গেল তার সঙ্গীসাথীদের খিস্তি।

হাঁটু গেড়ে বসল রানা। দ্রুত হাতে প্রথমে ডিসকানেক্ট করল ব্যাটারিটা। এরপর খুলতে শুরু করল ডিটোনেটর। ট্রেনটা বড় বেশি জোরে ছুটছে। ক্রমাগত ঝাঁকি খাচ্ছে বগি। ভয় হলো ওর, মেঝেতে নামিয়ে রাখলে ঝাঁকির চোটেও বিস্ফোরণ ঘটতে পারে ডিটোনেটরে। আশপাশে চোখ বোলাল। দেখতে পেল দেয়াল ঘেঁষে লাগানো একটা সিট... প্রয়োজন নেই বলে খুলে ফেলা হয়নি ওটা। এগিয়ে গিয়ে সিটের বসার জায়গার রেক্সিনে একটা আঁচড় কাটল। কাটা জায়গাটা দিয়ে ফোমের ভেতরে গুঁজে দিল ডিটোনেটরগুলো। এবার নিশ্চিন্ত। অ্যালার্ম ঘড়িটাও আছাড় মেরে ভেঙে ফেলল ও।

এবার কী? উঠে দাঁড়াল রানা। দরজা দিয়ে আসার চেষ্টায় ক্ষান্ত দিয়েছে কোরিয়ানরা। তবে জানালা দিয়ে আসতে পারে। হয়তো সে-চেষ্টাই করছে। ইমার্জেন্সি হ্যাণ্ডল টেনে ট্রেন থামাবে না তো? নাহ্, সে-সম্ভাবনা কম। ট্রেনকে যথাসময়ে পৌঁছুতে হবে থার্টি-ফোর্থ স্ট্রিট আর সিক্সথ অ্যাভিনিউয়ের জংশনে, লিম তার ব্যত্যয় চাইবে না। হ্যাণ্ডলটা নিজেই টানবে কি না ভাবল রানা। দেরি করিয়ে দেয়া যাবে ট্রেনকে, কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ হবে না। বরং নিজেই বিপদে পড়বে। ওকে খুন করে আবারও ট্রেন নিয়ে রওনা হতে পারবে লিম।

একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা, লিমের পরিকল্পনা এখনও পুরোপুরি বানচাল করতে পারেনি ও। ব্লাস্ট ক্যাপ সরালেই বিপদ কাটছে না, বিকল্প কৌশলে বোমা ফাটাবার অনেক কায়দা আছে। এর অর্থ, সি-ফোরের ব্লকটাকে কিছুতেই পৌঁছুতে দেয়া যাবে না কাঙ্ক্ষিত

গন্তব্যে। কিন্তু কী করে তা সম্ভব?

কয়েক সেকেণ্ড ভাবল রানা। হঠাৎ হাসি ফুটল ওর মুখে। পেয়েছে বুদ্ধি! লিমকে ছোটখাট একটা হার্ট-অ্যাটাক করিয়ে দিতে পারবে, একই সঙ্গে ঝেঁটিয়ে দূর করতে পারবে পেছনের বগির খ্যাপা কোরিয়ানদের। সি-ফোরের ব্লকটাই হবে ওর অস্ত্র!

ছুরি দিয়ে ব্লক থেকে সি-ফোরের দুটো টুকরো কেটে নিল রানা। দু'হাতের তালুর সাহায্যে ঘষে ছোট দুটো বল বানাল ওগুলো দিয়ে—আকারে একেকটা হলো হ্যাণ্ড গ্রেনেডের সমান। গ্রেনেডের মত ওগুলোকে ব্যবহারও করবে ও। সিটের ফোম থেকে দুটো ডিটোনেটর বের করল এরপর, গুঁজে দিল বলদুটোয়। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল হাতবোমা। ইগনিশন নিয়ে ভাবনার কিছু নেই, কায়দামত ট্রেনের চাকার নিচে ফেললেই কেল্লা ফতে—একাশি হাজার পাউণ্ডের প্রচণ্ড চাপে নির্ঘাত বিস্ফোরিত হবে ওগুলো।

ইস্ট রিভারের তলায় পৌঁছে গেছে ট্রেন—কানে বাতাসের চাপ বেড়ে যাওয়ায় বুঝতে পারল রানা। ব্রুকলিন ছেড়ে এবার ম্যানহাটনের দিকে ছুটছে। তারপুলিন কেটে দ্রুত একটা স্লিং বানাল ও, সাবধানে হাতবোমাদুটো রাখল ওর ভেতরে; তারপর পুরো জিনিসটা ঝুলিয়ে ফেলল কাঁধ গলিয়ে। খুব নিরাপদ হলো না ব্যবস্থাটা, কিন্তু আর কোনও উপায়ও নেই। পকেটে ভরে নেয়া যাবে না বোমাদুটো।

সি-ফোরের ব্লককে পাশ কাটিয়ে বগির দ্বিতীয় দরজার দিকে এগোল রানা। আর তখুনি পেছনে গর্জে উঠল একটা পিস্তল। এক মুহূর্ত আগে ও যেখানে ছিল, সেখানে বিঁধল বুলেট। ঘুরে রিটার্ন ফায়ার করল রানা, কিন্তু গুলি ছুঁড়েই কেটে পড়েছে প্রতিপক্ষ, কাউকে দেখা গেল না। এক মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করল ও, হাতের পিস্তলে আর মাত্র দু'রাউণ্ড গুলি আছে, আত্মরক্ষার জন্যে যথেষ্ট নয়। বগিতে

পড়ে থাকা আরেক গার্ডের পিস্তলটাও আনবে কি না ভাবছে। লাশের শরীরতল্লাশি করলে বাড়তি অ্যামিউনিশনও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাতে সময় নষ্ট হবে। তাই আর উল্টো ঘুরল না। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

দরজার হাতল ঘুরিয়ে বগি থেকে বেরিয়ে এল রানা। এবার আর আবদ্ধ আর-৬৮ নয়, সামনে উন্মুক্ত ফ্ল্যাটবেড কার। টানেলের ঝোড়ো বাতাস সরাসরি হামলা করল শরীরে, ওকে ঠেলে ফেলে দিতে চাইল। রেললাইনের সঙ্গে চাকার ঘর্ষণের আওয়াজও অনেক বেশি তীব্র। নকল রকেটটা মাত্র কয়েক গজ দূরে—তারপুলিনে ঢাকা, শেকল দিয়ে বাঁধা। ফ্ল্যাটবেড কারের পর রয়েছে ড্রাইভার'স্ ক্যাব—ট্রেনের চালকের পাশে ওখানে বসে আছে লিম। রানার প্ল্যান যদি ঠিকঠাক এগোয়, ওই ড্রাইভার'স্ ক্যাব ছাড়া আর কিছুই পৌঁছুবে না টার্গেট এরিয়ায়। লিমের চেহারা তখন কেমন হবে, ভাবার চেষ্টা করল ও।

পিস্তলটা পকেটে ভরে ফেলল রানা, পরে কাজে লাগবে; এরপর বাতাস ঠেলে কষ্টেসৃষ্টে এগোল সামনে। খানিক পরেই পৌঁছে গেল নকল রকেটের কাছে। থামল না, রকেটকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলতে থাকল। ফ্ল্যাটবেডের একেবারে কিনার ঘেঁষে চলেছে, পা ফসকালেই পড়ে যাবে নিচে। ব্যালান্স রাখার জন্যে হাতে ধরে থাকল শেকল আর স্টিলের নিচু খুঁটিগুলো। রকেটের পুরো দৈর্ঘ্য পেরুনোর পর পৌঁছুল ড্রাইভার'স্ ক্যাবের পেছনে। আর তখুনি ইস্ট ব্রডওয়ে স্টেশনে ঢুকল ট্রেন—ম্যানহাটনের প্রথম স্টেশন; কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বেরিয়েও গেল। আর ছ'টা স্টেশন পেরোলেই থার্টি-ফোর্থ স্ট্রিটে পৌঁছুবে ট্রেন... লিমের টার্গেট এরিয়ায়।

ড্রাইভার'স্ ক্যাবের দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে দমন করল রানা। বোমার বগির খবর হয়তো

পেয়ে গেছে লিম, ওর জন্যে ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছে। তারচেয়ে নিজের প্ল্যান মোতাবেক এগোনো যাক। ক্যাবের দেয়াল হাতড়ে একপাশে চলে গেল ও, তৈরি হলো ছাতে উঠবার জন্যে। ওপর থেকে ফ্ল্যাটবেডের চাকার তলায় হাতবোমা ফেলবার ইচ্ছে, যাতে বিস্ফোরণ ঘটে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ফ্ল্যাটবেড থেকে শুরু করে ট্রেনের পেছনের অংশ। ড্রাইভার'স্ ক্যাবের সঙ্গে সংযোগ না থাকায় আর এগোবে না ওটা। লিম তখন দুটো কাজ করতে পারে। হয় ক্যাব থামিয়ে ট্রেনকে আবার জোড়া দিতে চাইবে, কিংবা প্ল্যান বরবাদ হয়ে যাওয়ায় যেভাবে চলছিল সেভাবেই ক্যাব না থামিয়ে পিঠটান দেবে। যেটাই করুক, ক্যাবের ছাতে চড়ে রানা তার সঙ্গে থাকছে... ওর হাত থেকে রেহাই নেই উন্মাদ টাইকুনের।

আগেরবারের কায়দায় দেয়াল বেয়ে ড্রাইভার'স্ ক্যাবের ছাতে উঠে এল রানা। সামনে থেকে একটা মেটাল গার্ডারকে ছুটে আসতে দেখে ঝট্ করে মাথা নামিয়ে নিল। চুলে ঘষা খেয়ে চলে গেল ওটা। আরেকটু হলেই বাড়ি খেত। বিড় বিড় করে নিজেকে গালমন্দ করল ও। এখন আর ভুলচুকের অবকাশ নেই। বাকি কাজগুলো করতে হবে নিখুঁতভাবে। বুকের ওপর ভর দিয়ে ছাতের ওপর পুরো শরীর ঘোরাল ও—পা থাকল ট্রেনের সামনের দিকে, মুখ ফ্ল্যাটবেড কারের ওপর। একই সঙ্গে পিছলে নেমে এল ছাতের কিনারে। একটু এগিয়ে মাথা আর কাঁধ বের করে দিল ছাতের বাইরে। এবার বোমা ছোঁড়ার পালা। ড্রাইভার'স্ ক্যাব আর ফ্ল্যাটবেডের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে রেইলের ওপর ফেলতে হবে, যাতে ট্রেনের চাকার তলায় পড়ে ওটা। তা হলে প্রচণ্ড চাপ আর তাপে বিস্ফোরিত হবে ডিটোনেটর ও সি-ফোর।

কাজটা সহজ। দুই বগির মাঝের ফাঁক দিয়ে রেইল

দেখতে পাচ্ছে রানা। স্লিং থেকে একটা হাতবোমা বের করল। আর তখুনি দূরে দেখা গেল আলোর ঝলকানি, একটা বুলেট এসে রিকোশে করে গেল ওর হাতের ছ'ইঞ্চি পাশ দিয়ে। গুলির উৎসের দিকে তাকাল রানা, আঁতকে উঠল। কোরিয়ান এক গার্ডকে দেখা যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার বগির ছাতে... ভেতর দিয়ে আসতে না পেরে ওপর দিয়ে আসছে ওরা। ওর চোখের সামনেই দ্বিতীয় গুলি ছোঁড়ার জন্যে নিশানা করল লোকটা।

সিদ্ধান্ত নিতে হবে ওকে—পাল্টা গুলি ছুঁড়বে, নাকি বোমাটা ফেলবে নিচে? দ্বিতীয়টা বেছে নিল।

বড় করে শ্বাস নিয়ে বোমাটা হাত থেকে ছেড়ে দিল ও।

বিশ

'টি মাইনাস ফোর,' লাউডস্পিকারে শোনা গেল গমগমে গলা। 'স্টেজ ওয়ান অ্যাণ্ড স্টেজ টু অটো সিকোয়েন্স ইনিশিয়েটেড।'

রকেট উৎক্ষেপণের জন্যে রাতটা আদর্শ। আকাশ মেঘমুক্ত, জ্বলজ্বল করছে লক্ষ-কোটি তারা, যেন মস্ত চাঁদোয়ায় লাগানো মরিচবাতি। সাগরের পানিতে তার প্রতিবিম্ব পড়ায় মনে হচ্ছে যেন সারা দুনিয়াটাই বুঝি মিটমিটে আলোয় ভরে গেছে। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে লঞ্চ দেখতে আসা দর্শকেরা—তাদের মাঝে রয়েছে সাংবাদিক, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মানুষ। সবাই অপেক্ষা করছে

আকাশের পানে রকেটের ছুটে যাবার জন্যে। পুরো ব্যাপারটাই তাদের চোখে ব্যয়বহুল আতশবাজির খেলার মত। তবে লঞ্চ ফ্যাসিলিটির কণ্ট্রোল রুমে ব্যস্ত বিজ্ঞানী ও টেকনিশিয়ানরা ভিন্নভাবে বর্ণনা করবে এই পরিবেশকে। তারা বলবে অপটিমাম ওয়েদারের কথা—ঊনচল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা, আঠারো নটের বায়ুপ্রবাহ, আর সাড়ে চার নট উইণ্ড শিয়ারের কথা। খানিক আগে ছোটখাট কয়েকটা বজ্রপাতের খবর পাওয়া গেছে, তবে সেটা দশ নটিক্যাল মাইলের সেফটি লিমিটের বাইরে। কাজেই অব্যাহত রাখা হয়েছে উৎক্ষেপণের কার্যক্রম।

পেটের ভেতর স্যাটেলাইট নিয়ে, কালো আকাশের পটভূমিতে, লঞ্চপ্যাডে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে রকেটটা। শরীর আলোকিত হয়ে আছে তিনদিক থেকে ফেলা শক্তিশালী স্পটলাইটের রশ্মিতে। নাকের ডগায় মিটমিট করছে একটা লাল বিকন। এক ঘণ্টা আগে গ্যান্ট্রি ক্রেইনগুলো সরিয়ে নেয়া হয়েছে, এখন ওটার সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে কেবল আমবিলিক্যাল কর্ডগুলো। সেগুলোর মাধ্যমে অক্সিডাইযার ট্যাঙ্কে ভরা হচ্ছে তরল অক্সিজেন আর হাই গ্রেড কেরোসিনের মিশ্রণ। রকেটের গোড়াটা ঢাকা পড়ে আছে সাদা বাষ্পে—অপার্থিব এক আবহ সৃষ্টি হয়েছে তাতে। কাউণ্টডাউন শেষ হলেই জ্বালানি পুড়িয়ে চালু হবে ইঞ্জিন, তৈরি করবে সাতাশ হাজার পাউণ্ডের থ্রাস্ট... ভূমি ছেড়ে আকাশে ওড়াবে পুরো কাঠামোকে। সেকেণ্ডে ৩৯০৩ ফুটের ভার্টিক্যাল ভেলোসিটির সাহায্যে মাধ্যকর্ষণকে ফাঁকি দেবে রকেট, চলে যাবে মহাশূন্যে।

‘টি মাইনাস থ্রি। টেলিমেট্রি অ্যাণ্ড কমাণ্ড রিসিভার্স সুইচড্ টু ইণ্টারনাল পাওয়ার্স।’

সেণ্ট্রাল কণ্ট্রোল রুমে বসে আছে ত্রিশজন নারী-পুরুষ। সবার সামনে এক বা একাধিক কম্পিউটার কনসোল, আঠার

মত দৃষ্টি সেঁটে রয়েছে তাতে। লঞ্চের খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করে চলেছে তারা ক্রমাগত। রুমের সামনের দেয়ালে রয়েছে অতিকায় একটা এল.ই.ডি. স্ক্রিন, ক্যামেরার সাহায্যে তাতে দেখানো হচ্ছে রকেটটাকে। লঞ্চের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত ডেটা রেকর্ড করা হচ্ছে সেণ্ট্রাল সার্ভারে, সেটা একই সঙ্গে ট্রান্সমিট করা হচ্ছে টেক্সাসের হিউস্টনে—ইন্টিগ্রেটেড মিশন কণ্ট্রোল সেন্টারে। আমেরিকার সমস্ত স্পেস মিশন তদারক করা তাদের দায়িত্ব।

ঘড়ির কাঁটার মত নিখুঁতভাবে চলছে সবকিছু, এখন পর্যন্ত কোনও গোলযোগের আভাস পাওয়া যায়নি। তবে তার জন্যেও প্রস্তুত রয়েছে কণ্ট্রোল সেন্টার। কামরার একপ্রান্তে নিজের বুথে বসে আছে সেফটি অফিসার পল ফ্রিম্যান—সিরিয়াস চেহারার পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক এক যুবক। সিস্টেমস্ ফেইলিওর হলে রকেট লঞ্চ বাতিল করে দেবে সে, ক্র্যাশ হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে অ্যাক্টিভেট করবে *ইগনিস মর্টেম।* ফ্রিম্যানের সামনেই রয়েছে সুইচটা—কাঁচের আবরণে ঢাকা লাল রঙের একটা নিরীহদর্শন বোতাম। দেখে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, ছোট্ট ওই বোতামের সামান্য চাপে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে ওই বিশাল রকেট।

'টি মাইনাস ওয়ান-টোয়েন্টি...'

মিনিট থেকে এবার সেকেণ্ডে পৌঁছেছে কাউন্টডাউন। তাল মিলিয়ে টেনশনও বাড়ল কণ্ট্রোল সেন্টারে। ভেতরটা অন্ধকার। জানালা নেই, ভারী স্লাইডিং ডোর টেনে দেয়া হয়েছে, ওভারহেড লাইটগুলো করে ফেলা হয়েছে নিভু নিভু। একমাত্র আলো আসছে কম্পিউটারের মনিটর আর এল.ই.ডি. স্ক্রিন থেকে। তার আভায় ভৌতিক দেখাচ্ছে সবার চেহারা।

কামরার পিছনদিকে একটা চেয়ারে বসে আছেন

কমোডর ডেভিস পি. ব্যালফোর—পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পরা অবস্থায়। হাতে একটা সিগারেট, কিন্তু কণ্ট্রোল সেন্টারে ধূমপান নিষিদ্ধ বলে জ্বালতে পারছেন না, দু'আঙুলের মাঝে ঘোরাচ্ছেন স্টিকটা। চেয়ে চেয়ে উৎক্ষেপণ দেখা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই তাঁর এ-মুহূর্তে, আর সে-কারণেই বুঝি আজেবাজে চিন্তা চেপে বসছে মাথায়। ছটফট করছেন অমঙ্গল আশঙ্কায়। কমোডরের একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন বেজ ম্যানেজার পিটার স্টরমেয়ার—আড়চোখে মাঝে মাঝে দেখছেন তাঁকে। রানাকে নিয়ে সেদিনের পর আর একবারও কথা হয়নি দু'জনের মাঝে, কিন্তু সতর্কবাণীর প্রভাব ঠিকই পড়েছে তাঁদের ওপর। দু'জনেই ভাল করে জানেন, মিথ্যে ভয় দেখাবার জন্যে কেউ কয়েক হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে ছুটে আসে না... বিশেষ করে মানুষটা যদি মাসুদ রানার মত নামকরা কেউ হয়। গোয়ার্তুমির বশে ওকে ব্যালফোর ফিরিয়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু মনের খুঁতখুঁতানি দূর করতে পারেননি। সবচেয়ে বড় কথা, এখন আর কিছু করার নেই। লঞ্চ যদি ব্যর্থ হয়... যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে... যদি মাসুদ রানার সতর্কবাণী সত্যি প্রমাণিত হয়... সব দোষ এসে পড়বে তাঁদের দু'জনের ঘাড়ে। অথচ ঝুঁকিটা না নিয়ে উপায় নেই। এখন আর উৎক্ষেপণ বাতিল করা সম্ভব নয়। দেরি হয়ে গেছে... বড্ড দেরি।

কাজ হলো না রানার কৌশলে।

চোখের সামনে সি-ফোরের বলটাকে রেইলে পড়তে দেখল ও, কিন্তু চাকার তলায় পিষ্ট হবার আগেই ড্রপ খেয়ে ওটা ছিটকে গেল একপাশে। কোরিয়ান খুনি যেন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আবার গুলি ছুঁড়ল, তবে এ-দফাও মিস করল শিকারকে। বিদ্যুৎবেগে নিজের পিস্তল বের করল রানা, দু'বার ট্রিগার চাপল লোকটাকে লক্ষ্য করে। কোথায় লাগল

বোঝা গেল না, তবে আর্তনাদ করে ছাত থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল সে। ফাঁকা জায়গায় উদয় হলো আরেকজন। আগেরজনের চেয়ে দক্ষ এ-লোক, পিস্তল ধরা দেখেই বোঝা গেল। একটু উঁচু হয়ে নিশানা স্থির করল সে রানার গায়ে, পিস্তলের মুখ নড়ছে না একচুল।

অসহায় বোধ করল রানা। কোনও আড়াল নেই ওর, এখুনি গুলি খেয়ে সাঙ্গ হবে ভবলীলা। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে আচমকা যেন থমকে গেল সময়—চোখের সামনে স্লো-মোশনে ঘটতে শুরু করল সবকিছু।

নিশানা তাক করে রেখেছে কোরিয়ান খুনি, ট্রিগার চাপতে চলেছে।

কাঁধে কী যেন আঘাত করল রানাকে। বুলেট নয়, অন্যকিছু। পিছন থেকে এসেছে।

ঠোঁটদুটো সামান্য ফাঁক হলো কোরিয়ান খুনির, দাঁত বেরিয়ে এসেছে... হাসছে। জানে, মিস হবার কোনও সম্ভাবনা নেই।

স্থির হয়ে রইল রানা। আচমকা বুঝতে পেরেছে, ভয়ের কিছু নেই। গুলি খেতে হবে না ওকে।

টানেলের ছাত থেকে ঝুলতে থাকা মোটা এক তারে আটকে গেল কোরিয়ান লোকটার গলা। হ্যাঁচকা টান খেয়ে চোখের পলকে মটকে গেল ঘাড়। পরক্ষণে ছিটকে গেল দেহটা, হারিয়ে গেল অন্ধকারে। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ আগে ওই তারটাই ঘষা দিয়ে গেছে রানার কাঁধে। ফায়ারিঙের সুবিধার জন্যে শরীর একটু জাগিয়েছিল ওর প্রতিপক্ষ, সেটাই হয়েছে তার কাল।

তাই বলে বিপদ কাটেনি। প্যাসেঞ্জার বগির ছাতে আরও মানুষের অবয়ব দেখতে পাচ্ছে রানা—হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে সামনে। দুই সঙ্গীর পরিণতি দেখে ক্ষণিকের জন্যে থমকাল তারা। রানা বুঝল, এই সুযোগেই কার্যোদ্ধার

করতে হবে ওকে।

স্লিং থেকে দ্বিতীয় বোমাটা বের করল ও। ঝড়ের বেগে পাশ দিয়ে চলে গেল আরেকটা স্টেশন। নাম পড়ার সময় পেল না। ব্রডওয়ে, নাকি ওয়েস্ট ফোর্থ স্ট্রিট? একটু একটু করে গতি কমাচ্ছে ট্রেন, তারমানে টার্গেট এরিয়ার কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। তাড়া অনুভব করল রানা, সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত।

ড্রাইভার'স্ ক্যাবের ছাতে শরীর লেপ্টে দিল ও, ঊর্ধ্বাঙ্গের যতটুকু সম্ভব বের করে দিল প্রান্ত থেকে। বোমাধরা হাতটা প্রসারিত করল শেষ সীমা পর্যন্ত, একই সঙ্গে সেটা লাগিয়ে রেখেছে বগির দেয়ালে, যাতে কেঁপে না যায়। এখন পুরোপুরি অরক্ষিত ও, কোরিয়ান খুনিরা চাইলেই গুলি করে ঝাঁঝরা করে দিতে পারবে। তবে দিল না। ভালই ভয় পেয়েছে। ছাতের ওপর থেকে গুলি না করে চেষ্টা করছে ফ্ল্যাটবেড কারে নেমে আসতে, ওখান থেকে আয়েশ করে গুলি ছুঁড়তে পারবে, কিছুর সঙ্গে ঘষা খেয়ে মরবারও ভয় থাকবে না।

আসন্ন বিপদের কথা ভুলে গিয়ে রেইলের দিকে মনোনিবেশ করল রানা। এটাই শেষ বোমা... তারমানে এটাই শেষ সুযোগ। ব্যর্থ হলে নতুন কিছু করবার সময় থাকবে না। ট্রেন পৌঁছে যাবে গন্তব্যে। রানাকে হয়তো তার আগেই গুলি খেয়ে ঝাঁঝরা হয়ে যেতে হবে।

মনে মনে হিসেব করে নিল ও, তারপর আলতো করে খুলল হাতের মুঠি। সি-ফোরের বোমাটা অনায়াসে নেমে গেল দুই বগির ফাঁক গলে, আছাড় খেল রেইলে, পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল ফ্ল্যাটবেডের তলায়। রানা ততক্ষণে পিছিয়ে গিয়ে পুরো শরীর তুলে ফেলেছে ক্যাবের ছাতে। কী ঘটেছে দেখতে পেল না, কিন্তু টের পেল সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মাঝে। সরাসরি ট্রেনের চাকার তলায় পড়ল ওর

বোমা, প্রচণ্ড চাপে জ্বলে উঠল ব্লাস্ট ক্যাপ। ভয়াবহ আওয়াজ তুলে ঘটল বিস্ফোরণ। ক্ষণিকের জন্যে চোখ ধাঁধানো আলোয় ভরে গেল টানেল, দূর থেকে ট্রেনটাকে দেখে মনে হলো সেটা একটা অগ্নিকুণ্ড ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে।

আলোর পিছু পিছু এল শকওয়েভ। ফ্ল্যাটবেড কারটা এমনভাবে লাফিয়ে উঠল, যেন ওটার তলায় স্প্রিং লাগানো আছে। বিশ্রী শব্দ তুলে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল কাপলিং। শকওয়েভের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল সামনে-পেছনে দু'দিকেই। ড্রাইভার'স্ ক্যাবের ছাতে শরীর মিশিয়ে রেখেছে রানা, হাতের মুঠোয় কিনারটা এমনভাবে আঁকড়ে ধরেছে, যাতে পড়ে না যায়। ওর গায়ের নিচে ভীষণভাবে কেঁপে উঠল ক্যাব। ওদিক থেকে শুনতে পেল কোরিয়ান খুনিদের আর্তচিৎকার, প্যাসেঞ্জার বগির ছাত থেকে ছিটকে পড়ে যাচ্ছে তারা।

হিসেবে একটু গোলমাল করে ফেলেছে রানা, প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশিই সি-ফোর ব্যবহার করে ফেলেছে। তাই বিস্ফোরণ অনেক জোরালো হয়েছে, প্রায় দু'টুকরো হয়ে গেছে ট্রেন। পেছনের অংশ তালগোল পাকিয়ে আছড়ে পড়ল টানেলের দেয়ালে, সামনের ড্রাইভার'স্ ক্যাবেরও অবস্থা তথৈবচ। মাতালের মত দুলছে ওটা, আচমকা কাত হয়ে গেল... ঘষা খেল টানেলের দেয়ালে। জ্বলন্ত ফুলঝুরি দেখতে পেল রানা, ছাত থেকে শরীর পিছলাতে শুরু করেছে ওর। বিস্ফোরণের ধাক্কায় লাইনচ্যুত হয়েছে ক্যাব। কাঠামোটা পুরোপুরি কাত হয়ে যেতেই ছিটকে গেল ও। বাতাস কেটে দেহটা উড়ে গেল শূন্যে। ভাসতে ভাসতেই কাঁচ ভাঙার শব্দ শুনল... শুনল ধাতব দেয়াল ছিঁড়ে-খুঁড়ে ভচকে যাওয়ার আওয়াজ। যেন ক্রুদ্ধ হুঙ্কার ছাড়ল ট্রেনের ইঞ্জিন।

এরপরেই ছাতের সঙ্গে লাগানো একটা লোহার ব্র্যাকেটের সঙ্গে বাড়ি খেল রানা। চোখের সামনে যেন দপ করে জ্বলে উঠল হাজার ওয়াটের বাতি। মাটিতে আছড়ে পড়ার আগেই জ্ঞান হারাল ও।

পুরো ওয়ালপ্স্ আইল্যাণ্ড জুড়ে সাইরেন বাজছে—লঞ্চের আগে চূড়ান্ত ওয়ার্নিং। নিচু লয়ে শুরু হলো শব্দটা, এরপর গ্রাস করল পুরো দ্বীপকে। উত্তেজনার পারদ শীর্ষে উঠল দর্শকদের, সাইরেনের অর্থ জানে তারা, এখুনি উড়াল দেবে রকেট।

'টি মাইনাস থার্টি। গ্রাউণ্ড ডিসএনগেজ...'

আমবিলিক্যাল কর্ডগুলো খুলে পড়ল। এখন বন্ধনহীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে রকেটটা। রাতের আকাশ যেন আরও কালো হয়ে গেছে, অপেক্ষা করছে বুক বিদীর্ণ হবার। হঠাৎ একটা স্ফুলিঙ্গ দেখা গেল। লিফট-অফের ঠিক ছ'সেকেণ্ড বাকি, তাই অ্যাক্টিভেট করা হয়েছে পাইরোটেকনিক ইগনাইটার। চরম মুহূর্ত উপস্থিত... কণ্ট্রোল সেণ্টারে সবাই স্থির হয়ে গেল। বিশাল এল.ই.ডি. স্ক্রিনের দৃশ্যটাও যেন থমকে গেছে।

'ফাইভ...

'ফোর...

'থ্রি...

'টু...

'ওয়ান...

'লিফট-অফ!'

অক্সিজেন ও হাই গ্রেড কেরোসিনের মিশ্রণকে স্পর্শ করল স্ফুলিঙ্গ। সঙ্গে সঙ্গে ঘটল বিস্ফোরণ। রকেটের তলা দিয়ে বেরিয়ে এল অতিকায় এক আগুনের গোলা, অন্ধকারকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করল, আলোকিত করে তুলল

চারপাশ। পুরো দ্বীপ ঢাকা পড়ে গেল রাশি রাশি ধুলো আর ধোঁয়ায়। এরপর শোনা গেল বিস্ফোরণের আওয়াজ—আকস্মিক নয়, প্রলম্বিত... বাতাসে ভর করে, মাটি আর সমস্ত ইমারতকে কাঁপিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

আস্তে আস্তে উঠতে শুরু করল রকেট—কষ্টেসৃষ্টে, দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে... যেন ঠিক করতে পারছে না, রওনা হবে কি হবে না। কন্ট্রোল সেন্টারের ভেতরে, উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে গেল ফায়ার কন্ট্রোল টেকনিশিয়ান—একটা হাত ওয়াটার ডেলিউজ লিভারে... রকেট যদি আছাড় খেয়ে পড়ে, কয়েক হাজার গ্যালন পানি ঢেলে দেবে অগ্নিকাণ্ড ঠেকাবার জন্যে। তবে তেমন কিছু ঘটল না। শূন্যে যেন কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল রকেট, তারপরেই লাফ দিয়ে উঠে গেল আকাশে। পেছনে সফেদ রেখা টেনে ছুটে চলেছে ওপরদিকে। ঝিকমিক করে উঠল সাগরের পানি।

'অল সিস্টেমস্ স্টেবল। ফ্লাইট প্রসিডিং নরমালি।'

লাউডস্পিকারের ঘোষণা শুনে আটকে রাখা দমটা ছাড়লেন কমোডর ব্যালফোর। ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল সূক্ষ্ম হাসি। চোখ ঝলমল করছে আনন্দে। ফাঁড়া কেটে গেছে... ভুল প্রমাণিত হয়েছে মাসুদ রানার হুমকি। গতি বাড়ছে রকেটের, অনায়াস ভঙ্গিতে উঠে যাচ্ছে ঊর্ধ্বাকাশে। পেছনে রেখে যাচ্ছে ধোঁয়া আর আলোর রেখা। গর্জন করছে ইঞ্জিন। পঞ্চাশ সেকেণ্ডের ভেতর সুপারসোনিক গতি অর্জন করবে, একই সঙ্গে নিজেকে ঘুরিয়ে নেবে একটা বক্রপথে, গোলাকার ভূপৃষ্ঠ থেকে ধীরে ধীরে দূরত্ব বাড়াবে নিজের। জ্বালানি শেষ করে একে একে খসে পড়বে নিচের দুটো অংশ, ডগাটা ছিয়াত্তর মাইল পেরিয়ে পৌঁছে যাবে মহাশূন্যে। কন্ট্রোল সেন্টার থেকে কক্ষপথ অ্যাডজাস্ট করার পর ডিপ্লয় করা হবে স্যাটেলাইট। সবকিছু ঠিকঠাক

এগোচ্ছে। এল.ই.ডি. স্ক্রিনের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকালেন তিনি। ইতিমধ্যে ছোট হয়ে এসেছে রকেটের আকৃতি—ঘন কালো আকাশের বুকে একটা তারার মত লাগছে ওটাকে। সুন্দর, নিস্তব্ধ একটি তারা।

হঠাৎ কম্পিউটার থেকে ভেসে এল একটা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর।

'সিস্টেম ম্যালফাংশান! স্ট্যাণ্ড বাই! রিপিট! সিস্টেম ম্যালফাংশান!'

আঁতকে উঠে ঘাড় ফেরালেন ব্যালফোর। ফ্রিম্যানকে দেখে মনে হলো, এইমাত্র কেউ তাকে একটা চড় মেরেছে। কামরার একপ্রান্তে ইলেকট্রনিক্স টেলিমেট্রিক ক্রু-রা হুমড়ি খেয়ে পড়ল তাদের কনসোলের ওপর, মনিটরে ভেসে ওঠা ডেটা বিশ্লেষণ করতে শুরু করেছে। ব্যালফোরও ছুটে গেলেন সেদিকে। এক মিনিটের মাথায় জানা গেল দুঃসংবাদ। গড়বড় দেখা দিয়েছে রকেটে। ফিউয়েল ট্যাঙ্কের নাইট্রোজেন সাপ্লাই লাইনে ব্লকেজ দেখা দিয়েছে, প্রয়োজনীয় ফিউয়েল পৌঁছুচ্ছে না কমবাশচন চেম্বারে। রিডিং মোতাবেক মাত্র একুশ হাজার পাউণ্ডের থ্রাস্ট অর্জন করেছে রকেট, অথচ মাধ্যকর্ষণের বাঁধন ছেঁড়ার জন্যে চাই সাতাশ হাজার পাউণ্ড। এর অর্থ, ব্যর্থ হতে চলেছে যাত্রা, মহাশূন্যে কিছুতেই পৌঁছুতে পারবে না ওটা। ভূপৃষ্ঠের টানে অল্পক্ষণেই আছড়ে পড়বে নিচে।

শিউরে উঠলেন ব্যালফোর। এখন আর মহাশূন্য জয়ের বাহন নয় তাঁর রকেট, বরং অস্ত্রবিশেষ। সতেরো হাজার পাউণ্ডের হার্ডওয়্যার ও কয়েক হাজার গ্যালন তরল অক্সিজেন আর অতি দাহ্য কেরোসিনে ভরা একটা বোমা! মাটিতে আছড়ে পড়লেই...

আর ভাবতে পারলেন না ব্যালফোর। চেঁচিয়ে উঠলেন, 'অ্যাবোর্ট মিশন! অ্যাবোর্ট মিশন!!'

মাথা ঝাঁকাল সেফটি অফিসার। কাঁচের কাভার সরিয়ে টিপে দিল ইগনিস মর্টেমের লাল বোতাম। বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে চলে গেল সিগনাল, দু'সেকেণ্ডের মাথায় স্ক্রিনে দেখা গেল আলোর ঝলকানি—রকেটের এগজস্টের চেয়ে বহুগুণ উজ্জ্বল। আলোটা আবার খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে—রকেটের টুকরোগুলো জ্বলছে বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষে। আস্তে আস্তে নিভে গেল সেই আগুন। আকাশ ফিরে পেল তার ঘন কালো রঙ। কণ্ট্রোল সেণ্টারে নেমে এল পিনপতন নীরবতা। স্টরমেয়ারের সঙ্গে চোখাচোখি হলো কমোডর ব্যালফোরের, নীরব ভর্ৎসনা দেখতে পেলেন চোখদুটোয়। কিছু বললেন না তিনি, অসুস্থ বোধ করছেন। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন কোনোমতে।

দ্বীপে আসা দর্শকরাও দেখতে পেয়েছে ঘটনাটা। শুধু তা-ই নয়, মোবাইলে পুরোটা রেকর্ড করেছে অনেকে, ছবি তুলে নিয়েছে। রকেটের খণ্ডগুলো উর্ধ্বাকাশে ভস্ম হয়ে যেতেই হুড়োহুড়ি পড়ে গেল সবার মাঝে। যত দ্রুত সম্ভব ফিরে যেতে চায়। সাংবাদিকরা এই চাঞ্চল্যকর দুর্ঘটনার রিপোর্ট লিখবে, অন্যেরা ফেসবুক-ইউটিউবে শেয়ার করবে নিজের অভিজ্ঞতা, ছবি আর ভিডিও। এমন ঘটনার সাক্ষী হতে পারাও ভাগ্যের ব্যাপার!

আগামী কিছুদিন ভার্চুয়াল জগৎ সরগরম থাকবে এ-নিয়ে। কিন্তু কেউই জানবে না, ঘটনা আরও কত ভয়ঙ্কর হতে পারত। সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা ঠেকাতে গিয়ে... তিনশো ত্রিশ মাইল উত্তরে, মহানগরী নিউ ইয়র্কের ভূগর্ভে এক নিঃসঙ্গ বাঙালি যুবকের এখন কী দশা, তা-ও জানবে না ওরা।

কাতরাচ্ছে রানা। ব্যথায় জ্ঞান হারিয়েছিল, আবার সেই ব্যথাই জ্ঞান ফিরিয়েছে ওর। ঘাড় মটকে যায়নি, তবে

বেকায়দাভাবে আছড়ে পড়েছে ও। একটা পা ভাঁজ হয়ে আটকা রয়েছে শরীরের তলায়, পাঁজর ঠেকে আছে রেললাইনের একটা পাতে। শার্টটা ছিঁড়েখুঁড়ে উড়ে গেছে। মুখে রক্তের স্বাদ পাচ্ছে ও। নাকে ভেসে আসছে পোড়া গন্ধ। কী যেন পুড়ছে। ঘাড় ফেরাবার আগেই পেটের একপাশে প্রচণ্ড এক আঘাত করা হলো। ব্যথায় কুঁচকে গেল ও, একই সঙ্গে সচল হলো মস্তিষ্ক। বুঝল, এবারই প্রথম নয়; এর আগেও অন্তত তিন-চারবার আঘাত করা হয়েছে ওকে... আর সে-কারণেই জ্ঞান ফিরে এসেছে ওর।

কিন্তু কীসে করছে আঘাত?

চোখ মেলে তাকাল রানা। দেখতে পেল অ্যাণ্ডি লিমের দীর্ঘ কাঠামো—ওর গায়ের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। ফিটফাট, সুশৃঙ্খল ভাবটা নেই তার মাঝে—মাথার চুল এলোমেলো হয়ে আছে, কেটে গেছে কপালের একপাশ... রক্ত ঝরছে। সারা গায়ে ময়লার আস্তর। ভদ্রতার মুখোশ খসে পড়েছে, নগ্ন ঘৃণায় বিকৃত হয়ে আছে চেহারা। রানাকে মুখ ঘোরাতে দেখেই আবার লাথি মারল, গত কয়েক মিনিট থেকে এভাবে লাথি মেরে চলেছে সে, মিটাতে চাইছে মনের আক্রোশ। হাতে একটা ব্রাউনিং পিস্তল রয়েছে তার, কিন্তু ব্যবহার করছে না সেটা। করবার ইচ্ছেও নেই। যে-মানুষটার কারণে তার এত বছরের স্বপ্ন বানচাল হয়ে গেছে, তাকে সহজ মৃত্যু দিয়ে শান্তি পাবে না সে। পায়ের তলায় পিষে মারবে সে মাসুদ রানাকে।

লাথি খেয়ে গড়িয়ে গেল রানা। এক পলকের জন্যে দেখতে পেল ট্রেনের ধ্বংসাবশেষ। কাত হয়ে পড়ে আছে ড্রাইভার'স্ ক্যাব—ক্ষত-বিক্ষত, আগুন জ্বলছে। ট্রেনের বাকি অংশের দেখা নেই, টানেলের অনেকটা পেছনে ক্র্যাশ করেছে ওটা। কোরিয়ান গার্ডদের কেউ বাঁচতে পেরেছে বলে মনে হয় না। ড্রাইভারও সম্ভবত গুরুতর আহত বা মৃত; লিম

একাই বেরিয়ে এসেছে ক্যাব থেকে। টানেলে এ-মুহূর্তে ওরা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই।

এগিয়ে এসে আবারও লাথি মারল লিম, গুঙিয়ে উঠল রানা। কানে ভেসে এসেছে মৃদু আওয়াজ। নির্ঘাত চিড় ধরেছে পাঁজরের হাড়ে।

'কেন এসেছ এখানে?' খ্যাপাটে গলায় জিজ্ঞেস করল লিম। কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ মনে হচ্ছে তাকে। 'এলেই বা কীভাবে? তোমার তো মরে ভূত হয়ে যাবার কথা! কে সাহায্য করেছে তোমাকে?'

'খেল খতম, লিম,' কেশে উঠে বলল রানা। কথা বলতে গেলেই খচ করে কী যেন বিঁধছে বুকে। 'আমেরিকান সিক্রেট সার্ভিস আর এফবিআই খুব শীঘ্রি পৌঁছে যাবে এখানে। তোমার পুরো প্ল্যান লাইনচ্যুত হয়েছে... ঠিক ট্রেনটার মত।'

'কে সাহায্য করেছে তোমাকে?' গর্জে উঠল লিম।

'তুমি করেছ!' বলল রানা। 'তোমার নির্বুদ্ধিতা আর অহঙ্কার আমাকে সাহায্য করেছে।' কথা বলার ফাঁকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল পেছনে, মাটি হাতড়াল কিছু পাবার আশায়। পিস্তলটা হারিয়েছে পড়ে যাবার সময়; থাকলেও লাভ হতো না, গুলি ছিল না ওটায়। এখন অন্য কিছু দরকার। ধাতব কী যেন হাতে ঠেকল... একটা শেকল! কোত্থেকে এল? মনে পড়ল, নকল রকেটটা বাঁধা ছিল শেকল দিয়ে। তারই একটা টুকরো ছিঁড়ে ছিটকে এসেছে এদিকে। সব মিলিয়ে তিন-চার ফুট। কীভাবে ব্যবহার করা যায়?

দৌড়ে এসে আবারও লাথি চালাল লিম। তবে এবার তৈরি ছিল রানা, শরীর ঘুরিয়ে পিঠে নিল আঘাত। একই সঙ্গে শেকলটা টেনে নিল নিজের কাছে।

'সময় থাকতে পালিয়ে যাও,' বলল রানা। কথা বলে ব্যস্ত রাখছে লোকটাকে। 'শুধু আমেরিকানরা না, এবার

উত্তর কোরিয়ানরাও খুঁজবে তোমাকে। ওদের থেকে টাকা নিয়েছ, কিন্তু কাজ করতে পারোনি। ধরা পড়লে তোমার মরণ নিশ্চিত।'

'না!' গর্জে উঠল লিম। 'আমি নই, তুমি মরতে চলেছ, রানা!' হাতের পিস্তলটা তুলে তাক করল ওর দিকে। 'এখনও তোমাকে চরম কষ্টের মৃত্যু উপহার দিতে পারি আমি। তলপেটে বা দু'পায়ের মাঝখানে একটা গুলি করব, তারপর ফেলে যাব এই অন্ধকার টানেলে। ধুঁকে ধুঁকে মরবে তুমি... গর্তের ইঁদুরের মত।'

'ভুল!' বলেই ঘুরল রানা, চাবুক মারার ভঙ্গিতে শেকলটা ছুঁড়ল লিমের দিকে। কিন্তু শরীরে জোর নেই এক বিন্দু, বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে আছে মাটিতে, তাই আঘাতটা জুৎসই হলো না। শেকলটা স্রেফ জড়িয়ে গেল লিমের পায়ে, একটুও ব্যথা পেল না সে।

তাচ্ছিল্যের চোখে শেকলের দিকে তাকাল লিম, এরপর দৃষ্টি ফেরাল রানার দিকে। হাসল। 'ব্যস, এ-ই? দুর্ধর্ষ মাসুদ রানা... এভাবেই বুঝি ঘায়েল করতে চাইছ আমাকে?'

'না,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'এভাবে!'

শেকলের অন্যপ্রান্তটা এবার ও ছুঁড়ে দিল লাইনে। বিদ্যুৎবাহী তৃতীয় রেইলের উপরে গিয়ে পড়ল ওটা। কাজ হবে কি না জানে না... দুর্ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তীক্ষ্ণ একটা খড়খড়ে আওয়াজ ওর আশঙ্কাকে ভুল প্রমাণ করল। স্ফুলিঙ্গ দেখা গেল শেকলের মাথায়, পরক্ষণে সেটার শরীর বেয়ে ছুটে এল বিদ্যুতের নীলচে আঁকাবাঁকা রেখা। সাড়ে সাতশো ভোল্টের স্পর্শে গগনবিদারী এক আর্তনাদ বেরিয়ে এল লিমের গলা চিরে। আঙুলের ডগা ফেটে গেল তার, ঢেউ খেলে গিয়ে কুঁচকে গেল চামড়া, ঘোলা হয়ে গেল চোখের মণি। চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল

সজারুর কাঁটার মত। সন্দেহ নেই, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেছে তার প্রাণ-ভোমরা; তারপরেও খাড়া হয়ে রইল তার দেহ—খিঁচুনি দিচ্ছে ক্রমাগত। হঠাৎ মরণ-মুঠি থেকে তাকে মুক্তি দিল বিদ্যুৎ, লাশটা কাত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়া। পোড়া মাংসের গন্ধে পেট উল্টে আসার জোগাড়।

কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল রানা। কাশছে, চোখ জ্বালাপোড়া করছে ধোঁয়ায়। যদিও প্রয়োজন নেই, তাও কুড়িয়ে নিল লিমের পিস্তলটা। এরপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাঁটতে শুরু করল। পরের স্টেশনটা কতদূর, কে জানে... ওখানে পৌঁছুতে হবে ওকে।

একুশ

বৃষ্টিতে ধুয়ে যাচ্ছে গোটা নিউ ইয়র্ক শহর। বাইরের কিছুই প্রায় দেখা যায় না। বৃষ্টির তোড়ে প্রায় থমকে গেছে গাড়ির মিছিল, দেখা দিয়েছে যানজট। সব ধরনের বাতি—হেডলাইট, টেইল লাইট, ট্রাফিক লাইট আর নিয়ন বাতি—ঢাকা পড়ে গেছে বৃষ্টির পর্দার আড়ালে। উন্মুক্ত জায়গা ছেড়ে মানুষ চলে গেছে নিরাপদ আশ্রয়ে, যেন ভিজে চুপসে যেতে না হয়। কয়েক ঘণ্টা আগেকার রৌদ্রোজ্জ্বল দিনটা যেন এখন স্মৃতি। হালকা খয়েরি রঙের পুরু, মোটাসোটা মেঘের কম্বল উড়ে চলেছে অনেক নিচ দিয়ে, যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। স্কাইলাইনের মাঝে

আবছাভাবে চোখে পড়ছে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিঙের ঋজু কাঠামো। চূড়ায় বসানো রেডিও অ্যান্টেনার মাথায় জ্বলছে লাল বাতি। আরেকটু হলেই টুইন টাওয়ারের মত ধ্বংস হয়ে যেত বিল্ডিংটা, মুছে যেত নিউ ইয়র্কের আরেকটা ল্যাণ্ডমার্ক, অথচ বিল্ডিঙের অধিবাসীরা তার কিছুই জানে না। কোনোদিন জানবে না।

এটাই একজন স্পাইয়ের নিয়তি। যাদের জন্যে বিপদের মুখে ঝাঁপ দিতে হয়, নিজের জীবন বিপন্ন করে বাঁচাতে হয় যাদেরকে... তারা কোনোদিনই জানতে পারে না তার কীর্তি। দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা, জানালার ভারী কার্টেন টেনে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর আয়নার সামনে গিয়ে ঠিকঠাক করল গলার টাই। গায়ে চড়াল কোট। বেরিয়ে এল কামরা থেকে। ডিনারে চলেছে।

সাতদিন কেটে গেছে ইতিমধ্যে। তার মাঝে তিনদিন হাসপাতালে কাটাতে হয়েছে ওকে—চিকিৎসার জন্যে। কপাল ভাল বলতে হবে, বড় ধরনের কোনও আঘাত পায়নি ও। পাঁজরের একটা হাড়ে চিড় ধরেছে, শরীরে অজস্র কাটাছেঁড়া আর কালশিরে... ব্যস, তার বেশি কিছু নয়। তবে সেজন্যে ভাগ্যের চেয়ে অ্যাণ্ডি লিমকে বেশি ধন্যবাদ দিতে হয়। শেষ মুহূর্তে সে যদি অমন পাগল হয়ে না উঠত, রানাকে লাথি মারার বদলে হাতের পিস্তলটা ব্যবহার করত... তা হলেই শেষ হয়ে যেত সব।

অথচ কোনও উপায়ও ছিল না। লিমের ডিপো থেকে রানা যদি কোনি আইল্যাণ্ডে যাবার সিদ্ধান্ত না নিত, ঠেকানো যেত না উন্মাদ টাইকুনকে। কারণ মিশেলের কাছ থেকে খবর পাবার পরেও অকুস্থলে পৌঁছুতে তিন ঘণ্টা লেগেছিল পুলিশ, এফবিআই ও সিক্রেট সার্ভিসের। রানা যদি তার আগেই ট্রেনে উঠে না পড়ত, ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিতে পারত। এমনিতেই একেবারে শেষ মুহূর্তে লিমকে

ঠেকিয়েছে ও, ট্রেনটা থেমেছিল টোয়েন্টি থার্ড স্ট্রিটের সামান্য পেছনে। ওখান থেকে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিঙের দূরত্ব বেশি নয়। এক্সপার্টরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানিয়েছে, ট্রেনে যে-পরিমাণ সি-ফোর ছিল, তা দিয়ে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং তো বটেই, পুরো ম্যানহাটনকে ধূলিসাৎ করে দেয়া যেত। প্রাণহানি বাদ দিলেও অন্তত কয়েক বিলিয়ন ডলারের সম্পদ ধ্বংস হতো। সে-তুলনায় ওয়ালপ্স্ আইল্যাণ্ডের রকেট ধ্বংস হওয়ায় আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ যৎসামান্য।

কমোডর ব্যালফোরকে ইতিমধ্যে বরখাস্ত করা হয়েছে দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে। তবে কেউই ঠিক জানে না, জোসেফ ফিনিঙ্গার কী করে এমন জাদু দেখাল... হাজারো পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরেও কেন ধরা পড়ল না তার স্যাবোটাজ। অবশ্য স্ট্যাটিক টেস্ট আর সত্যিকার লঞ্চে আকাশ-পাতাল ফারাক রয়েছে—সেটাই সম্ভবত রহস্যটার চাবিকাঠি। রকেটের টার্বো পাম্প যদি পরীক্ষা করা যেত, সব পরিষ্কার হয়ে যেত; কিন্তু সমস্যা হলো, সেটা সহস্র টুকরোয় ভেঙে আপার অ্যাটমোস্ফিয়ারে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—রকেটের বাকি অংশগুলোর সঙ্গে। আপাতত সব ধরনের প্রি-লঞ্চ টেস্টের রিভিউ করা হচ্ছে। সমস্ত দুর্বলতা দূর করে নিখুঁত করে তোলা হচ্ছে পুরো প্রক্রিয়া। যতদিন না সেটা সম্পন্ন হচ্ছে, সব ধরনের রকেট উৎক্ষেপণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

অ্যাণ্ডি লিমের মৃত্যু, আর সাবওয়ের ট্রেন ক্র্যাশ... দুটোকেই দুর্ঘটনা বলে প্রচার করেছে মার্কিন সরকার। সত্যটা জানানো হয়নি, কারণ সরকার নিজেদের ব্যর্থতা আর অযোগ্যতার খবর ছড়াতে দিতে চায় না। হাজার হোক, পরের ইলেকশনে তো জিততে হবে! একই ধরনের মনোভাব তারা দেখাচ্ছে বিতাড়িত প্রবাসীদের বেলাতেও।

লিমের ষড়যন্ত্রের খবর জানার পরেও স্বীকার করছে না, তার প্ররোচনাতেই বহিষ্কার করা হয়েছিল নিরপরাধ বিদেশি কর্মীদের। এদিক থেকে সামান্য সুবিধেজনক অবস্থায় আছে বাংলাদেশ সরকার—রানার সংশ্লিষ্টতার কারণে ভেতরের সব খবর জানা আছে বাংলাদেশের... ব্যাপারটায় ওর ভূমিকার কারণে একেবারে অকৃতজ্ঞও হতে পারছে না আমেরিকানরা... ফলে কূটনৈতিকভাবে চাপ দেয়া যাচ্ছে মার্কিন সরকারকে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কিছুটা মচকেছে ওরা; যাদের বৈধ কাগজপত্র আছে, তাদেরকে ধীরে ধীরে ফিরিয়ে নেবে বলে কথা দিয়েছে, তবে পুরো প্রক্রিয়াটা যে দীর্ঘমেয়াদী হতে চলেছে, তাতে সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের জন্যে এটুকু প্রাপ্তিও কম নয়।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে ফিফথ অ্যাভিনিউয়ের প্লাযা হোটেলে এসে উঠেছে রানা—মার্কিন সরকারের সৌজন্যে। লিমের কেসে তদন্তে সহায়তার জন্যে ওকে কিছুদিন থেকে যাবার জন্যে অনুরোধ করেছে ওরা। হোটেলটা পৃথিবীর সবচেয়ে দামি ও ব্যয়বহুল হোটেলগুলোর একটা, রানার স্বাভাবিক অস্থায়ী আবাসের কাতারে পড়ে না। ওর রুচির তুলনায় হোটেলটা একটু বেশিই জমকালো... একটু বেশিই লোক-দেখানো। তারপরেও বিল যেহেতু মার্কিন সরকার দিচ্ছে, আপত্তির কোনও কারণ দেখেনি। গরিব দেশগুলোকে চুষে সম্পদের পাহাড় গড়ছে আমেরিকা, একটু নাহয় ওদের পকেট হালকা করা যাক... ফিরে যাবার তাড়া যেহেতু নেই। ইমেইলের মাধ্যমে মিশনের সংক্ষিপ্ত একটা রিপোর্ট বিসিআই হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিয়েছে ও, ঢাকায় ফেরার পর বিস্তারিত ডিব্রিফ করলে চলবে। এখন সম্পূর্ণ বিশ্রামে রয়েছে, উপভোগ করছে প্লাযা হোটেলের দুর্লভ আতিথেয়তা।

গত ক'দিনে মিশেলের সঙ্গে দেখা হয়নি ওর, শুধু ফোনে

কথা হয়েছে। ওয়াশিংটনে চরকির মত ঘুরতে হয়েছে বেচারিকে, বিভিন্ন দপ্তরে পেশ করতে হয়েছে হরেক রকমের রিপোর্ট ও ডিব্রিফ। অবশেষে গতকাল ছাড়া পেয়েছে ওসব থেকে, ফোন করে দেখা করতে চেয়েছে রানার সঙ্গে। ওকে প্লাযা হোটেলের রন্দিভু রুমে ডিনারের দাওয়াত দিয়েছে রানা। বুক করেছে সেখানকার সেরা টেবিলটা।

নিজের স্যুইট থেকে বেরিয়ে লিফটে চাপল রানা। নেমে এল রন্দিভু রুমে। ধোপদুরস্ত পোশাক পরা মেইটর'ডি অভ্যর্থনা জানাল ওকে, নিয়ে গেল নির্ধারিত টেবিলে। অপেক্ষা করার ফাঁকে পরিবেশন করল হালকা পানীয়। একটু দেরিতে পৌঁছুল মিশেল, দরজা দিয়ে ওকে ঢুকতে দেখে একটা হার্টবিট যেন মিস হয়ে গেল রানার। বিশ্বসুন্দরীর মত লাগছে ওকে—মুখে হালকা প্রসাধনী, ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক, পরনে কালো সিল্ক ভেলভেটের ইভনিং ড্রেস। ধবধবে কাঁধদুটো উন্মুক্ত, কোমরকে নিষ্ঠুরভাবে জড়িয়ে ধরেছে একটা চওড়া লেদার বেল্ট, টানটান পোশাকের মাঝে প্রকট হয়ে উঠেছে দেহের চড়াই-উৎরাই। মুখের কালশিরেগুলো মিলিয়ে গেছে ইতিমধ্যে। গলায় শোভা পাচ্ছে একটা পান্নার নেকলেস, কানে মুক্তো-বসানো ইয়ার-রিং।

উঠে দাঁড়াল রানা। কাছে এসে ওকে সৌজন্যমূলক আলিঙ্গন করল মিশেল, গালে আলতো চুমো খেল। এরপর বসে পড়ল রানার টেনে ধরা চেয়ারে।

'কী যে ভাল লাগছে তোমাকে দেখে!' বলল মিশেল। 'গত ক'দিন ছটফট করেছি আসার জন্যে, কিন্তু উপায় ছিল না। কিছু মনে করোনি তো?'

'করেছি,' নিজের চেয়ারে বসতে বসতে ঠাট্টা করল রানা। 'ছটফট আমিও করছিলাম। যে-ধকল গেল, এরপর তোমার হাতের সেবাযত্ন তো পাওনা হয় আমার, নাকি?'

'অবশ্যই!' মিশেলও হাসল।

ওয়েইটার এসে শ্যাম্পেন পরিবেশন করল। তারপর ধরিয়ে দিল মেনু কার্ড। জাঁকজমকের খাতিরে প্রায় সব খাবারের নামই ফরাসি শব্দে লেখা। রানা বলল, 'ফ্রান্সের বাইরে ফরাসি ভাষায় আস্থা নেই আমার। অর্ডার দেবার পর দেখবে, অর্ধেক খাবারই মুখে তোলার জো নেই। তারচেয়ে সিম্পল কিছু নেয়া যাক। কী বলো?'

'তুমি যা ভাল বোঝো করো,' বলল মিশেল। 'ড্রিঙ্কটা শুধু একটু ভাল দেখে নিয়ো। এত দামি জায়গায় খাওয়ার অভিজ্ঞতা এমনিতেই নেই আমার। মেনুটা যে-জবড়জং ভাষায় লিখেছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। কাজেই তুমি অর্ডার দাও।'

অর্ডার দিল রানা: শুরুতে সিজার স্যালাড, এরপর গ্রিল করা ফিশ স্টেক। সেই সঙ্গে ড্রিঙ্কস।

'শরীর কেমন তোমার?' জানতে চাইল মিশেল।

'মন্দ নয়,' বলল রানা। 'ওদিককার খবর বলো।'

'এফবিআই ও সিক্রেট সার্ভিসের সমন্বয়ে একটা টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। ওরা অ্যাণ্ডি লিমের সঙ্গীসাথী আর সাহায্যকারীদের তালিকা তৈরি করছে। একই সঙ্গে চলছে গ্রেফতারি অভিযান। আমিও আছি ওই টাস্ক ফোর্সে।'

'বাহ্। তা হলে তো আগামী কিছুদিন খুব ব্যস্ত থাকতে হবে তোমাকে।'

'তা তো বটেই। আগামীকালই ফিরে যেতে হবে ওয়াশিংটনে।'

'আর কিছু?'

'নিউ জার্সির ব্লু ডায়মণ্ড কম্পাউণ্ডে তল্লাশি চালিয়েছে এফবিআই। সেখানে অবৈধ কিছু পাওয়া যায়নি, তবে যেখানে তোমাকে কবর দেয়া হয়েছিল, তার খুব কাছেই পাওয়া গেছে আরও দুটো কফিন... ভেতরে অর্ধগলিত দুটো লাশসহ। ডালার ভেতরদিকে আঁচড়ের দাগ ছিল, তারমানে

ওদেরকেও জ্যান্ত কবর দিয়েছিল লিম।’

‘ওর তাসের আরও দুই শিকার,’ গম্ভীর গলায় বলল রানা।

‘হ্যাঁ। ওরা তোমার মত ভাগ্যবান ছিল না।’

‘আমি ভাগ্যবান নই, মিশেল। কবর থেকে বের হতে পেরেছিলাম শুধু তুমি ছিলে বলে। তুমি যদি সেদিন ওভাবে অভিনয় না করতে... আমার পকেটে ছুরি গুঁজে না দিতে... তা হলে আমারও একই পরিণতি হতো।’

‘ধ্যাৎ, কী যে বলো না! অত সহজে তুমি মরার পাত্র নও, মাসুদ রানা। আমি তোমার ফাইল দেখে এসেছি। এর আগেও বহুবার মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়েছ তুমি। রহস্যটা কী, বলবে?’

কল্পনায় রাঙার মার চেহারা দেখতে পেল রানা—মিরপুরের মাজারে মানত দিচ্ছে সে। পুরনো খুঁতখুঁতানিটা ফিরে এল আবার। তবে কি...

‘কোনও রহস্য নেই,’ খানিক পর বলল ও। ‘তোমার মতই কারও না কারও সাহায্য পাই সবসময়।’

‘আমার মত?’ কপট রাগ দেখাল মিশেল। ‘তারমানে আমার সাহায্যটা বিশেষ কিছু ছিল না? গড়পড়তা ব্যাপার?’

‘কক্ষনো না,’ হেসে বলল রানা। ‘আর যা-ই হও, তুমি গড়পড়তা কোনও মেয়ে নও। আরিব্বাপরে, যেভাবে মোটরসাইকেল চালালে... জীবনে কোনও মেয়েকে... সরি, কাউকেই ওভাবে চালাতে দেখিনি। আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ছাড়লে!’

‘হুম। তা... এই উপকারের প্রতিদান কীভাবে দেবে বলে ঠিক করেছ?’

‘কী চাও?’

রহস্যময় হাসি ফুটল মিশেলের ঠোঁটে। ‘এখানে তোমার তো একটা কামরা আছে, তাই না?’

‘কামরা না, স্যুইট। তোমাদের সরকারের সৌজন্যে। লিমকে প্রতিহত করবার পুরস্কার।’

‘তা হলে তো আমারও একটু অধিকার আছে ওখানে থাকার, তাই না?’

‘নিশ্চয়ই আছে। থাকতে চাও? কিন্তু তোমাকে না ফিরে যেতে হবে ওয়াশিংটনে?’

‘সেটা তো আগামীকাল,’ বলল মিশেল। কণ্ঠে দুষ্টুমি। ‘তারমানে আজকের রাতটা...’ কথা শেষ করল না ও।

খাবার এসে গেছে। ‘তথাস্তু!’ খুশি মনে প্লেট টেনে নিল রানা। ওর ঠোঁটেও ফুটে উঠেছে দুষ্টু হাসি।

(শেষ)

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা দিয়ে বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

ই-মেইল যোগাযোগ: alochonabibhag@gmail.com

ওমর কাইয়ুম, রশিদা ভিলা (১৮ নং), শাহজালাল পাড়া, গ্রা: ফটিকা, উজিলা: হাটহাজারী, জি: চট্টগ্রাম। মো: ০১৮৭৬-৫৩৯৯৮৭।

কেমন আছেন, ভাল আছি এসব কথার কোনও প্রয়োজন দেখছি না। কেননা ভাল না থাকলে কাজীদার পক্ষে চিঠির জবাব দেয়া সম্ভব হত না। যাই হোক, অভিযোগ দিয়েই শুরু করি। মাসুদ রানার বইয়ের দাম মোটামুটি হলেও তিন গোয়েন্দার বইয়ের দাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কী কারণে? জবাব দিন।

আমার পাড়াতো এক চাচা আছেন, যাঁর কাছে শুনেছি: তাঁকে খালে মাছ ধরতে পাঠানো হলে করতেন কি, গোয়ালঘরে ঢুকে খড়ের গাদার আড়ালে বসে মাসুদ রানার বই পড়তেন। এখন যুগ পাল্টেছে। গোয়ালঘরে লুকিয়ে রানা পড়ার বদলে এখন পাঠ্যবইয়ের নিচে রানার বই লুকিয়ে পড়া হয়। যদিও জানা, ব্যাপারটা নিজের সাথেই প্রতারণা করার মত। তবুও কী করা! মনকে তো রশি দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না। ও, হ্যাঁ, আমি পত্রমিতালিতে আগ্রহী।

❋ ঠিক ধরেছেন। সদ্য-প্রকাশিত মাসুদ রানার চেয়ে সদ্য-প্রকাশিত তিন গোয়েন্দা ভলিউমের দাম বেশি—কারণ, প্রতিটি তিন গোয়েন্দা এখন ভলিউম আকারে বের হচ্ছে। ভলিউমের দাম বেশি।

ফরহাদ
রামপুরা, ঢাকা।

শ্রদ্ধেয় কাজীদা,

সালাম নেবেন। কেমন আছেন? অনেক ব্যস্ত থাকায় অনেকদিন

আপনার সঙ্গে যোগাযোগ নেই। আবার ফিরে এলাম। গত এক বছরে রানার অনেকগুলো চমৎকার বই পেয়েছি। কাজীদা, আপনার কাছ থেকে দূরে ছিলাম, রানার কাছ থেকে নয়। চমৎকার বইগুলোর জন্য আপনাকে এবং আপনার সহযোগীদের শুভেচ্ছা। আপনাদের বর্তমান পলিসিতে আমি বেশ সন্তুষ্ট। একখণ্ডের মধ্যেই গল্প শেষ করা—এর ফলে বেশ ঢাউস আকারের বই পাচ্ছি, যদিও দামটা একটু... যা হোক, কাজীদা, চালিয়ে যান। আর রানার ৪৫০তম বইটা আশা করি অনেক অ্যাকশনপূর্ণ হবে। এটাকে স্মরণীয় করে রাখুন। কাজীদা, সুস্থ ও সুন্দর থাকুন জীবনের বাকিটা সময়।

❋ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার অভাব বোধ করতে শুরু করেছিলাম বেশ কিছুদিন ধরে, চিঠি পেয়ে ভাল লাগছে।

আনিস-উজ-জামান, মোবা: ০১৭৭২-৬৮৬২০২

১৭০ মেরাদিয়া মেইন রোড, ঢাকা ১২১৯।

প্রিয় কাজীদা,

চিঠির শুরুতেই আপনাকে ও সেবার সঙ্গে যুক্ত সবাইকে প্রচণ্ড রোদে শীতল এক গ্লাস শরবতের, বৃষ্টি শেষে রংধনুর, অমরাবতীর নীল পদ্মের ও হলুদ রঙের সর্ষে ফুলের শুভেচ্ছা জানালাম।

কাজীদা, সেবার কিছু বই—নরকের কীট, জাপানি টাইকুন, টাইম বম, লাইম লাইট, পাতকিনী, সেই কুয়াশা, নরপিশাচ, তুষার যাত্রা, হাইজ্যাক, অন্ধকারে চিতা (মাসুদ রানা), নাডা দ্য লিলি, শেষ যাত্রা, দ্য লায়ন'স স্কিন, ট্রেজার অভ দ্য লেক, মেন এগেইনস্ট দ্য সি, দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সি (অনুবাদ) ও হরর কাহিনী ভ্যাম্পায়ার ভার্সাস ওয়ারউলফ, রিটার্ন অভ ড্রাকুলা পড়লাম। মাসুদ রানা সিরিজের বইগুলো অসাধারণ। উপরে উল্লিখিত মাসুদ রানা সিরিজের বইগুলো পড়ে আমরা শিখতে পারি কীভাবে সীমাহীন কষ্ট ও নানা প্রতিকূলতার মাঝে থেকেও দেশের, মানবতার, বন্ধুর জন্য কাজ করার জোরাল মানসিকতা অর্জন করা যায়। এ ছাড়া শত কঠিন পরিবেশ-পরিস্থিতিতেও মাথা ঠাণ্ডা করে, মনের শক্তি দিয়ে কীভাবে অসম্ভব কাজকে সম্ভব করা যায়।

মেন এগেইনস্ট দ্য সি, দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সি—এ বই দুটি থেকে আমরা শিখতে পারি—ম্যান ক্যান বি ডেসট্রয়েড বাট নট ডিফিটেড এবং জোরাল নেতৃত্ব যদি কোনও দলে, দেশে বা গোষ্ঠীতে থাকে, তা হলে তারা শত প্রতিকূল, কঠিন পরিবেশ-পরিস্থিতিতেও পরাজয় বরণ করবেন না।

❋ আমাদের বই ভাল লাগছে জেনে খুব খুশি হলাম।

শফিক

ধানমণ্ডি, ঢাকা।

কাজীদা,

আচ্ছা, আপনি লিখছেন, সহযোগিতায় আরেকজনের নাম থাকছে। এর মানে কী?

❋ মানে হচ্ছে বয়স হয়েছে তো, পরিশ্রমটা ভাগাভাগি করে নিচ্ছি। আর একটা উদ্দেশ্য: আমার পরেও যেন সিরিজটা থাকে, সেজন্য কয়েকজনকে রেডি করে রেখে যাওয়া।

সাকিব জয়

চরপাড়া, ময়মনসিংহ।

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপর
একটি শিশিরবিন্দু...

কী ভাবছেন? কবিতা কেন দিলাম?

ছোট থেকেই ঘরকুনো স্বভাবের মানুষ আমি। ঘরের বাইরে যাওয়া হয়নি তেমন একটা। কিন্তু তবুও বাণিজ্যিক এলাকা মতিঝিল, টেমস নদীর তীরের বাতাস, অ্যান্টার্কটিকার শীতল হাওয়া, সাহারা মরুভূমির বালুর ঝড়, এগুলোকে বড়ই আপন মনে হয়। আপন মনে হয় গিলটি মিয়াকে যে কিনা সব অসাধ্য সাধন করতে পারলেও কুঁকড়ে যায় পুলিশের সামনে এসে।

রানা আমার কাছে একটা চেতনা। আমি রানার কাছে ঋণী। জানেন কেন? ও আমার মানুষ চেনা, মানুষকে জানা, মানুষকে সম্মান দেয়ার দৃষ্টিই পালটে দিয়েছে। বন্ধুত্বের সংজ্ঞার সাথে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, নারীকে সম্মান দিতে শিখিয়েছে। রানাকে নিয়ে কি আর কথার শেষ আছে, স্যর, বলুন? আমার শেষ ইচ্ছে কী জানেন? মরার সময় যেন দংশন আর মুক্ত বিহঙ্গ বইদুটো আমার হাতের কাছে থাকে। ভাল থাকবেন, সহস্র পাঠকের স্বপ্নদ্রষ্টা। বেঁচে থাকুক রানা সহস্র বছর পাঠকের বুকে।

❋ আপনাকে ধন্যবাদ। এই রকম চিঠি পেলে মনে হয়: নাহ্, সারাটা জীবন পণ্ডশ্রম করিনি। অন্তত কয়েকজনের মনে স্থান পেয়েছি। এমন চিঠি আমাকে কৃতজ্ঞ করে ফেলে। আবারও ধন্যবাদ।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ২০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে বাকি টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজার বরাবর লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।** বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা'র বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ভি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ১০০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪-৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছুলেই পোস্ট যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

১১/২/১৮ মার্গারেট (অনুবাদ) হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড/সায়েম সোলায়মান

রাজা সপ্তম হেনরির শাসনামল চলছে ইংল্যাণ্ডে। আর ইউরোপ জুড়ে চলছে ধর্মান্ধতা। সুন্দরী মার্গারেটকে ভালোবেসে ফেলেছে ওদের বাড়িতে আশ্রিত পিটার। মেয়েটার উপর চোখ পড়েছে ধর্মবিচারসভার গুপ্তচর ডি'অ্যাগুইলারেরও। মার্গারেটকে দেয়া বিয়ের প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে নিশ্ছিদ্র এক ফাঁদে আটকাল লোকটা ওই মেয়েকে। উদ্ধার-অভিযানে নামল পিটার ওর হবু-শ্বশুর জন ক্যাস্টেলের সঙ্গে। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল ডি'অ্যাগুইলারের দাসী আইনেয। কিন্তু ওদের জানা ছিল না, নিজের ভণ্ড-ধর্মাচরণের জন্য স্পেনের রাজদরবারে ফেঁসে যাবেন ক্যাস্টেল। রায় ঘোষিত হলো: জীবন-মরণ লড়াইয়ে যেদিন ডি'অ্যাগুইলারের মুখোমুখি হবে পিটার, তার পরদিন জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হবে ক্যাস্টেলকে। কী হলো শেষপর্যন্ত?

১১/২/১৮ খোঁজ (ওয়েস্টার্ন) গোলাম মাওলা নঈম

আরও আসছে *Boighar.com*

১৫/২/১৮ শার্লক হোমস ভার্সাস এরকুল পোয়ারো (অনুবাদ)
তৌফির হাসান উর রাকিব সম্পাদিত

১৫/২/১৮ মধ্যরাতের আতঙ্ক+দানব (হরর ভলিউম) অনীশ দাস অপু